CUK-H01916-123-P

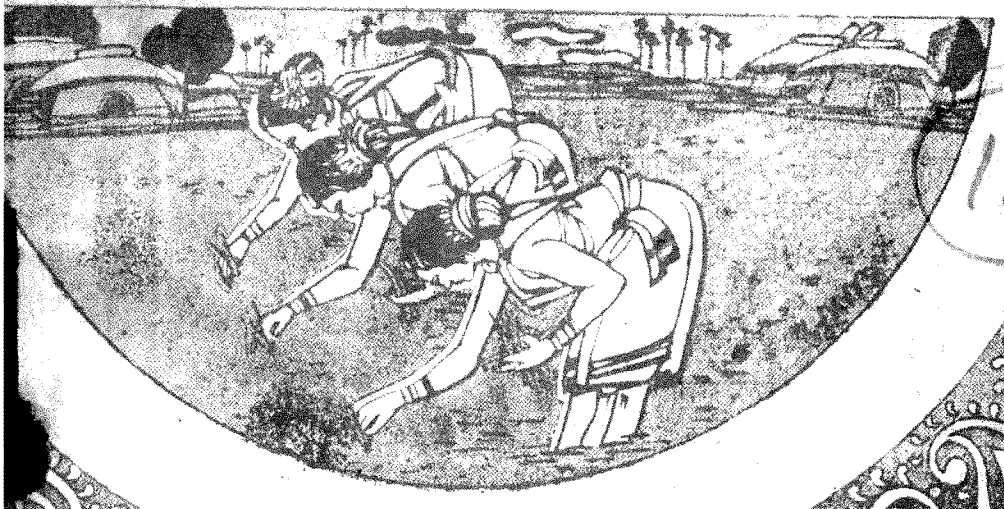

123

নন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত—

প্রবাসী

সম্পাদক—অশোক চট্টোপাধ্যায়

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়—১৩৮৬

প্রবাসী—১৩৮৬

সূচীপত্র

বৈশাখ, জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়

বিবিধ প্রসঙ্গ—
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ—ইন্দুভূষণ দে
সমাজ প্রগতিতে বিজ্ঞান—প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়
ভয়—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়
সেলাম—মনোজ গুপ্ত
টগর, দিব্যেন্দু, মিনতি ও আরো অনেকে—গৌরমোহন দাস দে
সাহিত্য-সাধক দীনেশচন্দ্র সেন—শ্রীবিভূতিভূষণ বসু
আমেরিকার টুকিটাকি—শৈলেশকুমার বন্দোপাধ্যায়
তানসেন—যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
আমরা বাঙ্গালী—শ্রীভোলানাথ মুখার্জী
অলস স্বপ্ন—শান্তনু দে সরকার
অমৃতস্য পুত্রা—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য
হারাধনের দশটি ছেলে—বাবলু ধাড়া
মেঘদূত—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত
শ্রীধাম বৃন্দাবন কথা—কানাইলাল দত্ত
পঞ্চশস্য—
সাময়িকী—
তুমিই-ই তুমি—কাজী শাহদাৎ আলী
পুস্তক পরিচয়—

75C.3
·618

পরিকল্পনা

"সত্যম শিবম সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেনলভ্য"

P.36,184

৮৩তম ভাগ | প্রথম ~~দ্বিতীয়~~ খণ্ড | বৈশাখ—১৩৮৬ | ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা

123

বিবিধ প্রসঙ্গ

দুই দশকেরও আগে যখন পরিকল্পিত অর্থনীতির
ম আমরা দেশের আর্থিক কাঠামোকে বদ্‌লে দেবার
নিয়েছি, তখন থেকেই সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে বেকার-
াধানের চেষ্টা চল্‌ছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই
করতে হয়, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাটা
য় হয়ে উঠছে। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার সঙ্গে
দিয়েই সমস্যাটা গভীরে নেমেছে এমনভাবে যে, এখন
পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাওয়া যচ্ছে না।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অবশ্য বেকার সমস্যাকে
গুরুত্ব দেয়নি। আর এই পরিকল্পনাতে প্রত্যক্ষভাবে
া সৃষ্টির কথা বলাও হয়নি। পরিকল্পনা কমিশন
ছিলেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি দেখা দিলে
বশ্য ভাবেই চাকুরী সৃষ্টি হবে। সেই হিসেবে
থম পরিকল্পনার সময়ে ৪৫ লক্ষ নতুন চাকুরীর সৃষ্টি
হবে। কমিশন আরো হিসেব করেছিলেন যে, প্রথম পরিকল্পনার শেষে দেশে বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ৫৩ লক্ষ।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রত্যক্ষ ভাবে চাকুরী সৃষ্টির দায়িত্ব দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় থেকেই গৃহিত হয়েছে। নতুন চাকুরী-সৃষ্টিকে দ্বিতীয় পরিকল্পনা অন্যতম লক্ষ্য হিসেবেই গ্রহণ করেছিল। কমিশন হিসেব করেছিলেন যে, পরিকল্পনার পাঁচ বছরে মোট ১ কোটি নতুন বেকার চাকুরী প্রার্থী হবে। আর প্রথম পরিকল্পনা কালের ৫৩ লক্ষ বেকারের হিসেব ধরলে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা সময়ে মোট ১ কোটি, ৩৩ লক্ষ নতুন পদ সৃষ্টি করা দরকার ছিল।

কিন্তু মনে রাখা দরকার, পরিকল্পনা কমিশনের হিসেবটা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্ত। প্রথমতঃ, কমিশন বেকারের হিসেব ধরেছেন, কিন্তু কৃষি-অঞ্চলের ছদ্ম-বেকারের

বিরাট সংখ্যাকে অস্বীকার করে গেছেন প্রথম থেকেই। অথচ পরিকল্পিত অর্থনীতিতে এই সব বেকারকে উৎপাদনের কাজে লাগানোটাই স্বাভাবিক ছিল। দ্বিতীয়তঃ কমিশন ১৬ লক্ষ লোককে কৃষিতে নিয়োগ করার কথা ভেবেছেন। এটা একেবারেই অবাস্তব, কারণ কৃষি ইতিমধ্যেই শ্রমিকবহুল হয়ে গিয়েছিল যার পরিণাম ছদ্ম-বেকারের আধিক্য। যেখানে কৃষির বাড়তি শ্রমিককে সরিয়ে আনাটাই ছিল অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা হিসেবে স্বীকৃত, সেখানে নতুন লোককে নিয়োগ কেমন করে করা যায়, এটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। তৃতীয়তঃ কমিশন বেকার-সংখ্যা হিসেবের জন্য এম্‌প্লয়মেণ্ট্ এক্সচেঞ্জ গুলোর ওপর নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু এটা সর্বজন-স্বীকৃত যে, মোট বেকারের একটা ক্ষুদ্র অংশই এম্‌প্লয়মেণ্ট্ এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়ে থাকেন।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, কমিশনের হিসেবটা বেকার-সংখ্যার একটা নির্ভরযোগ্য চিত্র দেয় না। তবু যদি তাঁদের হিসেবকেই প্রামাণিক হিসেবে ধরে নিই, তাহলে দেখা যাবে যে তাঁদের প্রতিশ্রুতি এবং সাফল্যের মধ্যে বিরাট ফারাক থেকে যাচ্ছে। কমিশন জানিয়েছিলেন যে, পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে ৬০ লক্ষ লোককে নিয়োগ করা হয়েছে। এক কোটি লোককে নিয়োগ করার লক্ষ্যকে সফল করতে হলে, পরিকল্পনার অবশিষ্ট সময়ে কর্মযজ্ঞ দ্রুততর করার দরকার। কিন্তু আমরা জানি যে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুন দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচীকে ছাঁটকাট করতে হয়েছিল। সেক্ষেত্রে, অবশিষ্ট বেকারদের নিয়োগ করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে।

তবু যদি আমরা কমিশনের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতির কথাটাই মেনে নিই, দেখা যাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে, তাঁদের হিসেবেই, ৫৩ লক্ষ বেকার থেকে যাচ্ছে। আর তাঁদের পরবর্তী হিসেব-পত্রগুলো পরীক্ষা করলে মনে হবে—ঐ সংখ্যা হওয়া উচিত ৯০ লক্ষ। এর কারণ দ্বিবিধ, প্রথমতঃ, জনসংখ্যাবৃদ্ধির, হার প্রাথমিক ধারণাকে ছাপিয়ে গিয়েছিল; আর দ্বিতীয়তঃ, কর্মসূ ছাঁটকাট করার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ ক গিয়েছিল অনিবার্য্য ভাবেই।

১৯৬১ সালের জন-গণনার পর তৃতীয় পরিকল্প নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ধরা হল ১ কোটি ৭০ ল আর দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ের ৯০ লক্ষ বেকা এই হিসেবের মধ্যে ধরলে, তৃতীয় পরিকল্পনার বছরে ২ কোটি ৬০ লক্ষ নতুন পদ সৃষ্টি ক দরকার। কিন্তু কমিশন ঐ পাঁচ বছরে মোট ১ কো ৪০ লক্ষ চাকুরী সৃষ্টি করার কথা বলেছেন—এর ম কৃষিতে হবে ৩৫ লক্ষ অন্য কৃষির বাইরে নতুন নিয়ে হবে ১ কোটি ৫ লক্ষ। এক্ষেত্রেও দেখা যা অসঙ্গতি অত্যন্ত প্রকট। আমরা আগেই বলেছি কৃষি ছদ্ম-বেকারের ভয়াবহ অবস্থার জন্য কৃষিক্ষেত্রে নত নিয়োগের কোন সুযোগই নেই। বরং বাড়তি শ্রমিক কৃষি থেকে সরিয়ে আনলেই আধুনিক পদ্ধতি কৃষিকার্য্য সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, কমিশন তাঁদের হি তৈরী করেছেন এম্‌প্লয়মেণ্ট্ এক্সচেঞ্জের রিপোর্ট উপর ভিত্তি করে। এই হিসেব কিছুতেই বা অবস্থার পরিচায়ক নয়। আর ন্যাশনাল সাম্পে সার্ভে-ও কমিশনকে কিছুটা নমুনা দিয়ে সাহ করেছেন—সেটাও আমাদের কাছে সমস্যাটার পূর্ণাঙ্গ তুলে ধরে না।

তবু আরো একবার ধরে নিলাম, কমিশ হিসেবটাই ঠিক। আর তাঁরা প্রতিশ্রুতি মতো কর্মসং করতে পেরেছেন। তাতে দেখা যাবে যে, তৃ পরিকল্পনার শেষে থেকে যাচ্ছে ১ কোটি ২০ বেকার। এই সংখ্যাটা নিশ্চয় অনেক বাড়া প্রতিরক্ষা-সমস্যার জন্য উক্ত পরিকল্পনার অনেক ছা হয়েছে। 'জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ চলে যু যুদ্ধ প্রচেষ্টায়।

কমিশন হিসেব করলেন, চতুর্থ পরিকল্পনার বছরে ২ কোটি ৩০ লক্ষ নতুন লোকের জন্য চাব সৃষ্টি করতে হবে। অবশ্যই বোঝা গেল না

টা কমিশন কোথা থেকে পেলেন, সে কথা ছেড়ে ও বলা চলে, এই পরিকল্পনাও অসার্থক। নের হিসেবে, পাঁচ বছরে নতুন পদ সৃষ্টি হবে টি ৯০ লক্ষ। তার অর্থ, নতুনদের মধ্যে লক্ষ লোক বেকার থেকে যাচ্ছে। এর সঙ্গে পরিকল্পনার সময়ের বেকারদের সংখ্যা যুক্ত সংখ্যাটা দাঁড়াচ্ছে—১ কোটি ৬৩ লক্ষ। অর্থাৎ নের হিসেবেই, পরিকল্পনা যত এগোচ্ছে, র-সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে ক্রমেই।

এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী চাকুরী সৃষ্টি করা কখনই সম্ভব হয়নি। তৃতীয় কল্পনার সময় থেকেই ভারতীয় অর্থনীতিতে ভাবিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিরক্ষা, খাদ্য সংকট, বন্যা, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, বৈদেশিক সাহায্য-হ্রাস তি কারণে পরিকল্পনাকে সাময়িক কালের জন্য স্থগিত তও হয়েছিল-যদিও কর্তৃপক্ষ একে 'প্ল্যান-হলিডে' পরিকল্পসার ছুটি বলে মেনে নিতে রাজী হননি, পরিকল্পনার গতি যে ব্যাহত হয়েছে, সেটা কার করার উপায় নেই, সেক্ষেত্রে চাকুরী সৃষ্টির গও কমে যেতে বাধ্য! সুতরাং কমিশন চাকুরী ির যে চিত্র রেখেছিলেন, সেটা যে বাস্তবে রূপায়িত সেটাও অবিসংবাদিত সত্য। অথচ, কমিশন বে দেখেছেন আসল সমস্যাটা তার চাইতে অনেক জটিল। কমিশনের হিসেবের চাইতে বেকারের অনেক বেশী।

অবশ্য বেকারত্ব ও ছদ্ম-বেকারত্বের মাপকাঠি বে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। সেই জন্যই ির পঞ্চম যোজনার সময়ে বেকারের সংখ্যা অথবা বেকারকে নিয়োগ করা যাবে—সেই সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন সমস্যার এদিকটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, বেকারত্বের বহু দিক আছে বলেই কোনো একটা মাত্রার বচারে সমস্যাটাকে পরিমাপ করা যায় না।

অবশ্য অধ্যাপক সেনও ভারতের মোট বেকারের একটা হিসেব দিয়েছেন। জাতীয় স্যাম্পেল সার্ভে'র হিসেবকে ভিত্তি করে তিনি দেখিয়েছেন যে, ভারতে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৯৯ লক্ষের ওপরে, প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষের মতো। অধ্যাপক রাজকৃষ্ণের হিসেবেও বেকারের সংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ। সুতরাং এটা বলা চলে যে, ভারতে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা অন্ততঃ ২ কোটি ১০ লক্ষ হবে।

অবশ্য ভগবতী কমিটির হিসেবে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ১ কোটি, ৮৭ লক্ষ। এঁদের মধ্যে ১ কোটি ৬১ লক্ষ বাস করেন গ্রামে, বাকীরা থাকেন শহরে। গ্রাম্য বেকারের মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৮৫ লক্ষ, তবে শহরের বেকারের মধ্যে অধিকাংশই পুরুষ—২৬ লক্ষের মধ্যে অন্ততঃ ১৬ লক্ষ। কমিটির হিসেবে, ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বেকার বেড়েছে ১০.১% হারে আর ১৯৭১ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যেই কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা (২০৫.৪ ৪২.৮%।

অবশ্য কমিটির দেওয়া এই হিসেব কতটা গ্রহনযোগ্য সে-সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ আছে। কারণ, ঠিক কতজন লোক পুরোপুরি বেকার আর কতজন অর্ধ-বেকার, তার সঠিক বিবরণ দেওয়া সত্যিই কঠিন কাজ।

সত্যিই অবস্থাটা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সমস্যা-সমাধানের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে যেখানে ক্রমেই পরিকল্পনার আকার বাড়ছে, সেখানে বেকারের সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে কেন, সেই প্রশ্ন কমিশনের সামনে তুলে ধরার দিন নিশ্চয় এসেছে॥

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

শান্তনু দে সরকার

জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। পঞ্চেশ্বরের এক ঈশ্বর। সিদ্ধেশ্বর, ভদ্রেশ্বর, যুক্তেশ্বর, মুক্তেশ্বর,—সর্ব কনিষ্ঠ জটিলেশ্বর। মিলিয়ে ছেলেদের নাম রাখবার সময় নামদাতা ভাবতে পারেন নি যে তাঁর নামকরণের গুরুত্ব ব্যক্তি চরিত্রের ওপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করবে। এই অনাধুনিক নামকরণের জন্যে জটিলেশ্বরের অভিভাবকদের ওপর যথেষ্ট ক্ষোভ থাকলেও উনি মান্ধাতার আমলের পুরোনো নাম বদলে নিজেকে কোনো নতুন নামে ভূষিত করেন নি। তার কারণ বাল্যকাল থেকে উনি গরিমাময়। বাড়ির মধ্যে উনি সবচেয়ে সেরা ছেলে, স্কুলে মেধাবী ছাত্র, তর্কে-বিতর্কে ওঁর জুড়ি ছিল না। ওঁকে ঘিরে বাপ-মার প্রচুর প্রত্যাশা। জটিলেশ্বর স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র, সহপাঠীদের প্রিয় বন্ধু। জটিলেশ্বরের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে সকলে স্থির নিশ্চিত। ওঁর সময়ে ঘরে ঘরে গ্র্যাজুয়েট ছিল না। উনি কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ পাশ করেই পদস্থ অফিসারের চাকরী পেলেন, এবং কোম্পানীর কল্যাণে প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্যে ভারত ও ভারতের বাইরে নানাস্থানে ঘুরে এলেন। কন্যাদায়গ্রস্থ বাঙলায় জটিলেশ্বরবাবুর বিয়ের বাজার দর মাত্রা ছাড়িয়ে ধাপে ধাপে চড়তে লাগলো। অভিভাবকেরা অপ্রত্যাশিত পাওনার সম্ভাবনায় আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলেন। কিন্তু একগুঁয়ে জটিলবাবুর ধনুকভাঙা পণ,—ছিঃ ছিঃ বিয়ে। এই পরাধীন দেশে? মানুষ কি এখনো জটিলবাবুকে চিনলো না। তাঁর মত অনন্যসাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তি বিয়ে করে কৃতদাসের জন্মদাতা হবেন!

– জটিলবাবুর বাপ-মা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। হতাশ হলেন মেয়ের বাপ-মায়েরা জটিলবাবু, কিন্তু চাকরীতে যোগ দেওয়ার পর, কোনো আলোচনা চক্র বা সাহিত্য বাসরে যোগ দেন নি। উনি জীবনে কখনো পড়াশোনা ছাড়া রাজনীতির রাজপথ মাড়ান নি কিন্তু বুড়ি বুড়ি নিন্দে করে দেশের নামকরা রাজনীতিবিদদের।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্রের পর ছিলেন জটিলবাবু; গান্ধীজীকে উনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। এহেন সর্বগুণ সম্পন্ন জটিলবাবু চিরকুমার ব্রত গ্রহণ করে বাপ-মার অনেক সাধে সাধলেন। ওঁদের একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে রইল জটিলবাবুর মাসিক অনুদান চারশো করে টাকা।

জটিলবাবু মাইনে পেতেন চার অঙ্কের। উনি বাড়ি থাকতেন না, বাইরে চাকরীস্থলে থাকতেন। মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতেন তখন দলে দলে আসতো ওঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থীর দল। উনি অনেক গরীব ছাত্রকে মাসিক পাঁচ টাকা করে অনুদান দিতেন, দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য দিতেন, কন্যাদায়গ্রস্থ বাপেদের মেয়ের বাপ হবার দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করার জন্য ভৎর্সনা করে মেয়ের বিয়ের জন্যে দুশে-একশো টাকা দান করতেন। এই সব কারণের জন্যে উনি বাড়ির লোকের কাছে অপ্রিয় এবং বাইরের লোকের কাছে প্রণম্য ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি নিজের নামে একটি বাড়ি কিনে বন্ধুদের কাছে বললেন,—আমি ন্যাংটা ফকির মানুষ, গেরস্তদের পোষাবে না। এটা আমার আশ্রম। ছুটির সময় এখানে এসে বিশ্রাম করবো, অবসর জীবনে এখানেই থাকবো। বাড়ির ওপরতলা নিজের জন্যে রেখে নীচের তলায় এক ভাড়াটে বসিয়ে দিলেন। দেশ-বিদেশের বই সংগ্রহ করে নিজের শোবার ঘরের সংলগ্ন একটি সুন্দর লাইব্রেরী করে ছিলেন। ভদ্রলোকের বহু গুণ, উনি নিজে কুকারে রান্না করে খেতেন, বলতেন পয়সার বিনিময়েও মানুষের সেবা কেনা মহাপাপ, মানবতার অপমান।

উনি ছুটিতে এলে মহাপুরুষ দর্শনের মত বন্ধু, স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী অনুগ্রহীর দল ভীড় জমাতেন, উনি কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের এক মিনিট বেশী কাউকে থাকতে দিতেন না। নিজের নিষ্ঠা আর দৃঢ় চরিত্রের সম্বন্ধে উনি এক সময় বন্ধুদের শুনিয়েছিলেন,—রাজা দশরথ সুন্দরী যুবতী-দের পাঠিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে ভুলিয়ে এনেছিলেন কিন্তু উনি যখন বিলেতে ও ফ্রান্সে ছিলেন অনেক ল্যাণ্ড লেডি মা তাঁদের শ্বেতাঙ্গিনী নীল নয়না তরুণী সুন্দরী তনয়াদের পাঠিয়েও তাঁকে টলাতে পারেন নি। মহাদেব ভস্ম করে-ছিলেন স্বয়ং কামদেবকে, উনি নয়ন জলে ভাসিয়েছেন কামিনীদের। জটিলেশ্বরবাবুকে লোকেরা দেবতুল্য নয়; শিবতুল্য মনে করে শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। জটিলেশ্বর-বাবুর মহানুভবতা আরো ছড়িয়ে পড়লো, যখন উনি ওঁর এক মৃত সহকর্মীর বিধবা স্ত্রী আর বারো বছরের ছেলের সমস্ত দায় মাথায় করে নিলেন। মা ছেলেকে উনি নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন এবং নিজে বাড়ি আসা বন্ধ করে দিলেন। ওঁর বাপ-মা, ভাইবোনেরা অসন্তুষ্ট হলেও কুৎসা রটাবার কোনো সুযোগই পেলেন না। জটিলবাবু এমনই হুঁসিয়ার লোক। জটিলেশ্বরবাবুর মহত্বের কাহিনী এ অঞ্চলে কিংবদন্তী হয়ে উঠলো।

জটিলেশ্বর বাবুর জটিল চরিত্রের প্রকাশ আরো জটিলতর হয়ে দেখা দিল পনেরো বছর পরে। জটিল-বাবুর বাড়ির নিচের তলায় ভাড়া থাকতো একটি মধ্যবৃত্ত কায়স্থ পরিবার। জটিলবাবুর মৃত সহকর্মী তারকনাথ চাটুয্যের ছেলে সোমনাথ ওঁর অনুগ্রহে বি, এ, পাশ করে কলকাতায় একটি আফিসে চাকরী পেয়ে গেল। ছেলেটি ছাত্র অবস্থাতেই নীচের অভয়বাবুর মেয়ে চন্দনাকে পড়াতো। কামজয়ী জটিলবাবুর মানসপুত্র দুর্ভাগ্যবসতঃ ছাত্রীর প্রেমে পড়ে গেল। পড়াতে গিয়ে মাস্টার ছাত্রীর প্রেমে পড়ায় নতুনত্ব কিছু নেই, এতো হামেশাই ব্যাপার। অতএব ছেলের মা ও মেয়ের অভিভাবকেরা প্রজাপতির নির্বন্ধন পাকাপাকি করতে একমত হলেন। ছেলের মা বললেন, ছেলের আসল অভিভাবক জটিলেশ্বরবাবু। উনি শিবতুল্য মানুষ, এক কথায় রাজী হয়ে যাবেন। ওর মত না নিলে চলবে না। মেয়ের বাবা চিঠি লিখে জটিলেশ্বর বাবুকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। উনি চিঠি পড়ে আগুনে বোমার মত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফেটে পড়লেন। এত বড় অন্যাচার! বামুনের ছেলে হয়ে কায়েতের মেয়েকে বিয়ে! উনি সারা জীবন চিরকুমার হয়ে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ালেন আর তাঁরই পয়সা খেয়ে-পরে মানুষ হয়ে প্রেম করা! তা আবার অন্য জাতের মেয়ের সঙ্গে। না না, প্রাণ থাকতে এত বড় অন্যায় উনি হতে দেবেন না। উনি চিঠি পেয়ে ছুটে এলেন বাড়িতে। সোমনাথকে ডেকে শুনিয়ে দিলেন ওঁর অমতের কথা।

রাত্রে ওঁর খাওয়া শেষ হলে, ধুতীপরা সোমনাথের মা কলা বৌয়ের মত একগলা ঘোমটা টেনে অপরাধিনীর মত জোড় হাত করে দাঁড়ালেন ঘরের চৌকাঠের কাছে। ওঁকে দেখেই জটিলেশ্বরবাবু গম্ভীর গলায় বললেন—চৌকাঠের এদিকে পা বাড়াবেন না, আমি স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়াই না। কি বলতে চান ওখানে দাঁড়িয়েই বলুন।

ভদ্রমহিলা ভয় পেয়ে করুণ কণ্ঠে বললেন—আপনি মহৎজন। আমাদের আপনি ছাড়া আপন বলতে এ সংসারে আর কেউ নেই। সেই অসময়ে আপনি দয়া না করলে আমরা মা ছেলে কোথায় ভেসে যেতাম তার ঠিক নেই।

উনি বিরক্ত হয়ে বললেন—দেখুন পরের মাথায় যারা কাঁঠাল ভেঙে খায় তাদের খোসামুদে কথা আমার শুনতে ভালো লাগে না। আসল উদ্দেশ্য কি বলুন। সোম-নাথের মায়ের মুখ দিয়ে আর কোনো কথা সরলো না। উনি ভয়ে শিটিয়ে গেলেন। জটিলেশ্বর বাবু বললেন—দেখুন যদি কিছু বলার থাকে বলে ফেলুন।

সোমনাথের মা আড়ষ্ট কণ্ঠে মিনতির সুরে বললেন—ছেলে বড় হয়েছে, বিয়ে দেবার বয়েসও হয়েছে।

উনি বললেন – বেশ কথা। মেয়ে দেখা হোক, পছন্দ হোক, তারপর বিয়ে। সোমনাথের মা জটিলবাবুর নরম সুর শুনে বলে ফেললেন – ছেলের চন্দনাকে পছন্দ, ওদের অমত নেই, শুধু আপনি রাজী হলেই ..।

জটিলেশ্বরবাবু ওঁর কথায় বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন —দেখুন জীবনে কখনো অন্যায় কাজ করিনি, আমার

—সংস্পর্শে যারা আছে তাদেরও অমন কাজ করতে দোবো না। নীচু জাতের মেয়ে ঘরে এনে তারকনাথের বংশে বিষ ঢোকাতে আমি দেবো না। অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে দেখে সোমনাথের বিয়ে দেবো। সুন্দর বৌও হবে, পাওনা থোওনাও ভালো হবে। এই নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। চলে যান, আমার ঘুম পাচ্ছে।

সোমনাথের মা বললেন পনেরো বছর এ বাড়ীতে আছি, দেখেছি ওঁরা খুবই ভদ্রলোক, ছেলে ওঁদের খুব পছন্দ, দেনা-পাওনাও মন্দ দেবে না, মেয়েও খুব ঠাণ্ডা, লক্ষ্মী ঠাকুরের মত দেখতে। তা ছাড়া ছেলের ইচ্ছে...।

ধমক দিয়ে উঠলেন জটিলেশ্বর বাবু—থামুন, আপনি। আমি গারজেন থাকতে ছেলের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো দাম নেই। দেখছি খাইয়ে-পরিয়ে কাল সাপ পুষলাম। আমার খেয়ে পরে আমার মুখে চুণ কালী দিতে চান আপনারা। আপনারা শুধু বেইমান নন, বোকার অধম। বুঝলেন না ধূর্ত্ত কায়েত জাতের ছল-চাতুরী। আমি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করলাম। ছেলের চাকরী করে দিলাম আর ওরা সুড়ুত করে এসে সুন্দরী মেয়েটা লেলিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে বেহাত করে নিলে। বিয়ে তো দেবোই না, আর আমারই বাড়ীতে বাস করে আমার ঘরে সিঁদ দেওয়া কায়েতকে চিট করে ছাড়বো। দূর করে তাড়িয়ে দেবো আমার বাড়ি থেকে। বাড়ি থাকলে অনেক ভাড়াটে জুটবে। সুন্দরী মেয়ের ফাঁদ পেতে ছেলে ধরার শাস্তি কেমন করে দিতে হয় আমার জানা আছে, অনেক ঘাটের জল খেয়েছি আমি। অনেক দেশের অনেক জাদু মন্ত্র, আমার কাছে ফুসমন্তর হয়ে উড়ে গেছে।

সোমনাথের মা বললেন—আপনি ওর বাপের চেয়ে বেশী, ছেলে মেয়েটাকে ভালোবাসে।

জটিলেশ্বর বাবু চিৎকার করে উঠলেন—কি বললেন? ভালোবাসে? ভালোবাসে না গুষ্টির পিণ্ডি। নিকুচি করেছে ভালোবাসার। কালকে আপনারা মা ছেলে আমার বাড়ি থেকে চলে যাবেন।

ভদ্রমহিলা সাহস সঞ্চার করে শেষ মিনতি জানালেন—সোমনাথ যদি আপনার নিজের ছেলে হতো, তখন কি করতেন আপনি?

জটিলেশ্বর বাবু কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন—তক্ষুনি অমন কুলাঙ্গার ছেলে আর তার গর্ভধারিনীকে গুলি করে মেরে ফেলতাম। আমার শরীরে ভরদ্বাজ মুণির রক্ত টগবগ করে ফুটছে। শীগগীর বেরিয়ে যান আমার সামনে থেকে, নৈলে একটা বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে যাবে হয়তো, আপনাকে খুন করে বসবো। বেইমান, বেইমান, সারা দুনিয়াটা বেইমানে ভর্ত্তি।

জটিলেশ্বর বাবু রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসে সজোরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তার আগেই সোমনাথের মা ভয়ে ওখান থেকে সরে গেলেন।

তারপরের দিনের ঘটনা আরো অদ্ভুত। অদ্ভুত-রহস্যময় চরিত্র ঐ জটিলেশ্বর বাবুর। কোনটা ওঁর আসল রূপ কারুর বোঝবার উপায় নেই। উনি সাত-সকালে সুড় সুড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে নিভৃতে অভয় বাবুর কানে বিষ ছড়িয়ে গেলেন। দেশে কি ছেলে নেই, না ভগবান আপনাকে নিঃস্ব করে রেখেছেন যে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সঙ্গতি নেই, যদি না থাকে, আমার কাছে সাহায্য চান, আপনাকে আমি পাঁচ হাজার টাকা দান করবো। আপনি আমার বিশ বছরের ভাড়াটে আমি চাই না একটা অসৎ চরিত্র মায়ের নিঃস্ব ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে হোক।

কথা শুনে অভয় বাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন। পরে একথা বাড়ির লোকদের কাছে ওঁকে বলতে হ'ল। ওঁর মা ও স্ত্রী ভেবেচিন্তে বললেন—ভদ্রলোকের সবটা বানানো মিথ্যে কথা। আমরা পনেরো বছর মা ছেলেকে দেখছি, তেমন স্বভাব হলে জানতে পারতাম না? আইবুড়ো বুড়োটা ছেলেটার বিয়েতে বাকড়া দেবার জন্যে ছেলের ভাল মানুষ মায়ের নামে মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছেন। নিজেকে দামড়া করে রেখেছেন, ছেলেটার জীবন নষ্ট করতে চাইছেন। মন্দ লোককে কেউ নিজের বাড়ি আশ্রয় দেয়? সবটা হিংসের ব্যাপার।

চিরকুমার জটিল বাবু সোমনাথের বিয়ে পণ্ড করবার জন্যে দুদিক থেকে সাঁড়াসী আক্রমণ চালালেন। কিন্তু যৌবন-গঙ্গায় প্রেমের বান ডাকলে সে কি বাধা মানে। ঠিক হ'ল সোমনাথ বন্ধুর বাড়ি থেকে বিয়ে করতে যাবে।

বিয়ে হবে কনের মাসীর বাড়ী থেকে। স্থির হলো বিয়ে করে সোমনাথ বৌ নিয়ে জটিলেশ্বর বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে আশীর্ব্বাদ চাইবে, তখন জটিলেশ্বর বাবু ওকে ক্ষমা না করে পারবেন না।

সিদ্ধান্ত মত কাজ হ'ল। বর-কনে নিয়ে বিয়ের পর দিন সোমনাথের বন্ধুরা বাড়ির সামনে হাজির হয়ে আনন্দে গলা ফাটা চিৎকার শুরু করে দিলে—জ্যাঠামশাই, অ জ্যাঠামশাই। শীগগীর দরজা খুলুন, দেখুন আমরা কাকে এনেছি।

জটিলেশ্বর বাবু তেজস্বী পুরুষ, সমরে পরাঙ্মুখ হবার পাত্র নন। ওপর থেকে নেমে এসে রাগে চোখ মুখ লাল করে দরজা খুলে চিৎকার করে উঠলেন—বলি তোমরা ভেবেছো কি? একজন ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অসভ্য ইতোরের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

ছেলেরা ওঁর ভৎর্সনায় কান না দিয়ে বলে উঠলো,—ওরে সোমনাথ, বৌ নিয়ে মোটর থেকে নেমে জ্যাঠামশাইকে প্রণাম কর, উনি তোদের আশীর্ব্বাদ করবেন।

সোমনাথ বৌয়ের হাত ধরে মোটর থেকে নেমে জটিলেশ্বর বাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল। এককালের জনহিতৈষী, মানব-দরদী জটিলেশ্বর রাগে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকু হারিয়ে ফেললেন। সজোরে জুতো শুদ্ধ লাথি মারলেন সোমনাথের মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে আশপাশে সমস্বরে আওয়াজ উঠলো—আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ। একি নোংরা কাজ করলেন জটিলেশ্বর বাবু। কোনো ভদ্রলোক এ অবস্থায় অমন কুৎসিৎ ব্যবহার করে।

ছেলেরা রাগে মারমুখী হয়ে জটিলেশ্বর বাবুকে ঘিরে ধরলো। সোমনাথ হাত জোড় করে সবাইকে মিনতি করলে—ভাই, উনি পনেরো বছর ধরে আমাদের মা-ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছেন, খাওয়া-পরা দিয়েছেন, লেখাপড়া শেখার খরচ দিয়েছেন, চাকরী করে দিয়েছেন। উনি আমার কাছে বাপের চেয়েও বেশী শ্রদ্ধার পাত্র। ওঁর এই আশীর্ব্বাদ নিয়েই আমি যাচ্ছি। তোমরা কেউ ওঁর গায়ে হাত দিয়ো না।

সোমনাথ বন্ধুদের ডেকে নিয়ে বৌয়ের হাত ধরে মোটরে গিয়ে বসলো। ওর দুগাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। ও আবেগে বলে ফেললে—ভাই পরের কাছে মানুষ হওয়ার মত মহাপাপ আর নেই, বোধহয় এর কোনো প্রায়শ্চিত্তও নেই। পাশে পড়সী বৃদ্ধ দীনবন্ধু বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। সোমনাথকে সান্ত্বনা দিলেন—বাবা সোমনাথ, মনে দুঃখ করো না। জটিলেশ্বর বাবু আজ পনেরো বছরের ঋণ সুদে আসলে উসুল করে নিলেন। উনি কলিযুগের ভৃগু মুণি।

কঠোর জটিলেশ্বর বাবু কারু কথায় কর্ণপাত না করে সকলের নাকের ওপর নির্লজ্জের মত দরজা বন্ধ করে দিয়ে গট্‌গট্‌ করে ওপরে উঠে গেলেন। পরের দিন ভাড়াটেকে বাড়ি ছাড়বার নোটিশ ধরিয়ে দিয়ে নিজের অংশে তালা লাগিয়ে কর্মস্থলে চলে গেলেন।

জটিলেশ্বর বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় বাল্যবন্ধু সুভাষের জন্যে। সুভাষ ওঁর অনুগ্রহপুষ্ট একটি দুঃস্থ ছাত্র। ওঁকে দেবতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করতো। ছোট বেলায় আমিও যেতাম জটিলেশ্বর বাবুর বাড়ি। শুনতাম আগামী দিনের 'ইয়ং বেঙ্গল' হবার প্রেরণাময় উপদেশ বাণী, শ্রদ্ধাও করতাম যথেষ্ঠ। জটিলেশ্বর বাবুর এই অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার কথা শুনেছিলাম সুভাষের মুখে অনেক দিন পরে। আমি জব্বলপুরে চাকরী করতাম।

এই ঘটনার দু বছর পরে জটিলেশ্বরবাবু রিটায়ার হয়ে স্থায়ীভাবে নিজের বাড়িতে বাস করতে লাগলেন। বাড়িতে কোনো নতুন ভাড়াটে রাখেন নি, সোমনাথদের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক ছিল না। আরো দু বছর পরে আমি বদলি হয়ে কলকাতায় এলাম। ফিরেই মহাপুরুষ দর্শনের ইচ্ছে হ'ল। পাঠ্যাবস্থায় বইপত্র কিনতে উনি আমাকেও অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন। সুভাষকে বললাম, চল্‌ জটিলেশ্বর বাবুকে প্রণাম করে আসি। 'আমার সময় নেই' বলে ও এড়িয়ে গেল, আমার কাছে কিছু ভাঙলে না। ওর অনিচ্ছা দেখে দু তিন দিন পরে আমি একাই গেলাম ওঁর বাড়িতে। উনি ছোট বড় সকলের সঙ্গে আপনি-আজ্ঞে করে কথা বলতেন।

উনি নীচের ঘরেই ছিলেন। আমায় দেখে জিগ্যেস করলেন—এই যে তনুবাবু, কবে এলেন? কেমন আছেন? কোথায় যাচ্ছেন?

তিন প্রশ্নের মধ্যে শেষটার জবাব দিলাম—আপনার কাছেই এলাম জ্যাঠামশাই।

উনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন—বেশ করেছেন। ভেতরে এসে বসুন। এবারে পাঁচ বছর পরে এলেন, না?

ভদ্রলোকের খুব স্মরণশক্তি, ঠিক মনে রেখেছেন। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললাম—হ্যাঁ।

উনি আমাকে সদর ঘরে বসিয়ে ভেতর দিকে উঁকি মেরে, বুড়ো গলায় আদুরে সুর মিশিয়ে হাঁক দিলেন—কালো ও কালো! আমার একজন পুরোনো বন্ধু এসেছেন, একটু চা করে দেবে?

ভেতর থেকে কর্কশ মেয়েলী গলার আওয়াজ হ'লো—আমার এখন সময় নেই।

আচমকা ভেতর থেকে কচি ছেলের কান্নার শব্দ শোনা

গেল। ছেলেটা এক নাগাড় কাঁদতে কাঁদতে কোঁকিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে উঠলো ঝঙ্কার—বলি কানের মাথা খেয়ে বসে আছো নাকি? ছেলেটা যে কোঁকিয়ে শেষ হয়ে গেল।

এককালের দুর্দান্ত রাশভারী জটিলেশ্বরবাবু ত্রস্ত চাকরের মত ভেতরে ছুটে গেলেন। বাইরে ছেলে ভোলানোর আওয়াজ এলো,—এইযে; না না, আর কেঁদো না। এই তো তোমায় কোলে নিয়েছি। সোনা আমার। গোপাল আমার!

কৌতূহল হ'লো। ভেতর দিকে উঁকি মেরে দেখলাম—জটিলেশ্বরবাবু কাঁথা জড়ানো একটি শিশুকে বুকে তুলে নিয়ে দোলা দিচ্ছেন। বাথরুমের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন রণচণ্ডী মূর্তিতে এক কিম্ভূত কিমাকার মহিলা। যেমনি মোটা আর তেমনি গেড়া। কুচ্‌কুচে কালো রঙে, টক্‌টকে লাল শাড়ী পরে যেন টিকেয় আগুন ধরিয়েছেন। আমায় দেখে জটিলেশ্বর বাবুকে জিগ্যেস করলেন - ইনি আবার কোন মহাজন?

জটিলেশ্বর বাবু আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দিলেন—আমার এক পুরোনো বন্ধু।

মহিলাটি মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন—মরণ আর কি। ষাট বছরের ঘাটের মড়ার ছোঁড়া বন্ধু। আমি যেন ন্যাকা খুকী। বুঝি না কিছু। বন্ধু না পিরিতের ছোঁড়া। সারাজীবন ছোঁড়া নিয়ে কাটলো। ছোঁড়া রোগ আর গেল না।

হা হতস্মি! শিউরে উঠলাম। কি সাংঘাতিক মেয়ে-ছেলেরে বাবা। এমন জঘন্য মন্তব্য এর আগে কোনো মহিলার মুখে শুনি নি। সঙ্গে সঙ্গে জটিলেশ্বর বাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটলাম সুভাষের কাছে। ও আমার কথা শুনে বললে - তুই যেমন বাঁদর। কেন গেছলি ঐ নোংরা রুচির লোকটার কাছে? আমি যখন তোকে নিয়ে যাই নি, তোর বোঝা উচিৎ ছিল।

বললাম—বার বার তোকে অনুরোধ করেছি, তুই'তো খুলে কিছু বলিস নি।

ও জবাব দিলেন যার উপকার নিয়ে ধন্য হলাম, যাকে দেবতার মত শ্রদ্ধাভক্তি করতাম, তাঁর মন্দ আচরণের কথা নিজের মুখে কাউকে বলবো না ভেবেছিলাম। তুই যে এমন কাণ্ড করবি বুঝবো কি ক'রে ব'ল।

সুভাষ সোমনাথের কাহিনী শোনালে। তারপর বললে বিদকুটে জটিল চরিত্রের মানুষ জটিলেশ্বর বাবু। অল্প দিন পরেই ওঁর ভ ডামীর মুখোস খুলে গেল। এমন অসম্ভব রকমের নির্লজ্জ মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। সারা জীবন বড় বড় কথা বলে লোককে ধোঁকা দিয়ে বেড়ালেন। ভদ্রলোক বড় ধার্মিক। রিটায়ার করে ফিরে এসে উনি আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেন নি। স্বকথিত "এ্যাবোড অফ টেংকুইলিটি" অর্থাৎ তথা-কথিত শান্তি আশ্রমের অধিবাসী হলেন। অত বড় বাড়িতে একা থাকতেন। ঘর বাড়ি ধোয়া মোছা করার জন্যে পাশের বস্তির কালিন্দী নামের উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে ঝি রেখেছিলেন। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় পাড়ায় হৈ-হৈ পড়ে গেল। সমস্ত জেলে বস্তির ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ ঘিরে ধরলো জটিলেশ্বর বাবুকে। ষাট বছরের ভীমরতি ধরা বুড়োর এই কাজ। লোকে এই তো এই মারে।

গোলমাল শুনে পাড়ার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা এসে জমা হলেন সেখানে। ঘটনা শুনে সকলেই স্তম্ভিত। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই জঘন্য অভিযোগের জটিলেশ্বর বাবু কোনো প্রতিবাদ করলেন না। ওঁর উপকার নেন নি, পাড়ায় এমন লোক কমই ছিলেন। ভদ্রলোকের মান বাঁচাতে সবাই মিলে একটা মীমাংসা করে দিলেন। ডাক্তার খরচ আর কালিন্দীর বিয়ের খরচ জটিলেশ্বর বাবু দেবেন। এ ছাড়াও ওর মা-বাবাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন আর যে ছেলে ওকে বিয়ে করবে তাকে মাছের ব্যবসা করতে দু হাজার টাকা দিতে হবে। জেলে পাড়ার লোকেরা এই সালিসতে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন। কিন্তু হতভাগা বুড়ো, গঙ্গাযাত্রীর মড়া দুদিন পরেই কালিন্দীর বিরহে বিকল হয়ে ওকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে এলো। চারদিকে ছিঃ ছিক্কার পড়ে গেল। আত্মীয়-স্বজন ভাই-ভাইপোদের মুখ পোড়ালেন ভদ্রলোক। সাধের চিরকুমারত্ব জলাঞ্জলী দিলেন বেহায়া ভণ্ড। শুনে অবাক হ'লাম। বললাম—বলিস কি সুভাষ! এমন লোকের এতখানি অধঃপতন।

ও বললে—পতন নয় তনু, পরিনাম। চিরকাল বুকের ভেতর ঘুমন্ত পিপাসা নিয়ে মুখে বড় বড় কথা বলে 'বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র' হওয়া যায় না। যে ইচ্ছে করে নদীর জল না খেয়ে নির্জলা ব্রতের মিথ্যে বাহাদুরী দেখাতে চায়, তাকে নর্দমার নোংরা জলই খেতে হয় শেষ কালে। বাঘ যেমন একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে অন্য পশুর মাংস পছন্দ করে না, তেমনি ইন্দ্রিয় সুখের সন্ধান পেলে আত্মবঞ্চক মরিয়া হয়ে ওঠে। তখন তার হিতাহিত জ্ঞান বা চক্ষুলজ্জার বালাই থাকে না। জটিলেশ্বর বাবুর জটিল চরিত্রের এই এই পরিনাম। উনি কালিন্দী জেলেনীর দেহজালে জড়িয়ে গেলেন ষাট বছর কৌমার্য ব্রত পালন করার পর। আমার মুখ থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে এলো—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।"

সমাজ প্রগতিতে বিজ্ঞান

প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

এক সময়ে অর্থাৎ মানুষের অতি প্রাচীন অবস্থায় সভ্যতার গোড়া-পত্তন মনে হয় পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতেই। ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত এ সবের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে দেব-দেবী বা ভূত-প্রেতের আরাধনার ভেতর দিয়ে পুরোহিত সম্প্রদায়ই মানুষের সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছিল। অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই সভ্যতার সৃষ্টি হলেও ক্রমশঃ জ্ঞানের চর্চার একটা প্রবনতা জগতে থাকে এই শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে। নিয়ম কানুন বিধি-বিধানের স্রষ্টা ছিলেন এই যাজক বা পুরোহিত সম্প্রদায়। সদ্য-বদ্ধ সমাজের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে তাদের নানা রকম বিধি-বিধান তৈরী করতে হত। প্রাকৃতিক জ্ঞানের অভাবে প্রথম দিকে কুসংস্কারের বসে চলতে চলতে ক্রমশঃ প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটতে থাকে আর তারপরই সুরু হয় সমাজের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রকাশ। বিশেষ করে যাদামাতৃক দেশগুলোয় সভ্যতার গতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। কৃষি-ভিত্তিক সমাজে জ্ঞানের প্রকাশ বেশী করে ঘটে। বন্যায় ক্ষেত ডুবে গেলে বিপর্যয়। আবার বন্যার জল নেমে গেলে নতুন করে জমি বণ্টন। এই সব ক্ষেত্রে বন্যা কখন আসবে সেই চিন্তায় জোয়ার ভাটার ধারণা আর জমির পুনর্বণ্টনের তাগিদে জ্যামিতিক মাপ-জোপের আবিষ্কার। নতুন নতুন বিজ্ঞান-ভিত্তিক আইনের প্রয়োজন হল সমাজ শৃঙ্খলার তাগিদে। এ সবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সম-সাময়িক যাজক পুরোহিত সম্প্রদায়। সভ্যতার প্রাথমিক গতি এঁদের দ্বারাই সমতারিত। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলা যায় 'ব্রাহ্মণ-যুগ।'

এই ব্রাহ্মণ বা যাজক সম্প্রদায়ের হাত থেকে ক্রমশঃ ক্ষমতা চলে যায় ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজাদের হাতে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র এই সব শ্রেণী ভেদ কিন্তু সমাজে অনিবার্য্য ভাবেই এসে গিয়েছিল। সামাজিক সম্পদ রক্ষার জন্যে বা সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষায় সেখানে বাহু বলের অবশ্যম্ভাবিতা সেখানকার জন্যে এই ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টন-বিতরণের জন্যে বলা যায় বৈশ্য বা বণিক সম্প্রদায় রূপে স্বীকৃতি পেল। আর যারা এই তিন সম্প্রদায়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে পেছিয়ে গেল, তার রইল এঁদের সেবায় নিযুক্ত বা এঁদের ব্যক্তিগত সেবাই হ'ল এদের উপজীবিকা। এরা হল শূদ্র।

পুরোহিত শাসনের যুগে ছিল মানুষের পরলোক ভীতি যাস্তব জ্ঞানের সীমিত পরিধি তার প্রসার ও প্রচার দুইই সীমিত। ফলে রাজা-শাসন প্রভৃতি কাজে এই সীমিত সংখ্যক তদানীন্তন জ্ঞানী-গুণীদের ওপর রাজারা নির্ভর করতেন আর সাধারণ মানুষেরও রাজাদের চেয়েও এঁদের প্রতি আস্থা ছিল বেশী। রাজারা যে শাস্ত্র সম্মত রাজা, ঈশ্বরের প্রতিনিধি এটা পুরোহিত সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রচারিত হয়েই সাধারণ প্রজার কাছে স্বীকৃতি পেত। এ সময়ে রাজশক্তি ছিল পুরোহিতের ওপর নির্ভরশীল। আসলে রাজত্ব করত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রাজশক্তি চালিত হইত তাঁদেরই নির্দ্দেশে। এর ফলে এই সম্প্রদায় ছিল গণ্ডি-বদ্ধ এবং সাধারণ মানুষ যদিও অন্তত অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তবুও এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানের চর্চা থাকায় তা উৎকর্ষ লাভ করেছিল প্রভূত পরিমানে। বিদ্যাচর্চার সঙ্গে ছিল এঁদের বক্তব্য আর নিষ্ঠা আর বিবাহ ইত্যাদিও নিতান্ত সাম্প্রদায়িক গণ্ডিবদ্ধ থাকার মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা' ও মেধার বিপুল প্রকাশ ঘটেছিল এ সময়ে। প্রচীন যুগে যে মেধার প্রকাশের কথা জানা যায়, তা মনে হয় এই সাম্প্রদায়িক তারই ফলশ্রুতি। ভারতে শ্রুতিধর মানুষের কথা শোনা যায়। সে সময়ে রাজশক্তি বা মন্ত্রশক্তি যত পরাক্রান্তই হ'ক এই মনীষীর স্বীকৃতি ছাড়া জন-মানুষ আপনি প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম ছিল না। কিন্তু জন-জীবন

ছিল অবহেলিত সাধারণ মানুষের মর্য্যাদার কোন প্রশ্নই ছিল না। আপনাপন সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরোহিত নির্দ্দিষ্ট পথে চলা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না, কারণ রাজ-শক্তি যেখানে নির্ভরশীল সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিধাতা নির্দ্দেশিত পথ, যার প্রচার যাজক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে ছিল সাধারণ মানুষের একমাত্র অবলম্বন। কৃষি ছিল প্রধান জীবিকা, আর জীবন সংগ্রামও দেখা দেয় নি আজকের মত হয়ে। চার শ্রেনীর উপার্জ্জন পদ্ধতিকে বংশানুক্রমিক করে দিয়ে ছিলেন আমাদের দেশের পন্ডিতরা। এতে সমাজের অগ্রগতি না অবনতি কোনটা হয়েছিল বলা কঠিন।

এই সময়ে পুরোহিত কুলের মন শীলতার অনুশীলনের সঙ্গে ছিল অজ্ঞানতা প্রসূত কুসংস্কার। দুয়ের সমন্বনে এগিয়ে চলে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি আর পরলোক ভীত আর দেব-দেবীর কল্পনা। শেষে দেখা যায় এই যাজক সম্প্রদায়ের ভেতরেই দু'টো পরস্পর বিরোধী দল। এক দল অন্ধ-বিশ্বাসে আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আর একদল বাস্তব বৈজ্ঞানীক চিন্তাভিমুখী। সমাজে এসে যায় চিন্তার পরিবর্ত্তন। মানুষের মনে জাগে জিজ্ঞাসা। বহু বৈজ্ঞানীক পন্ডিতকে অপর দলের হাতে নির্জ্জাতিত হতে হয়। অন্য তিনটি সম্প্রদায় তখন নিরপেক্ষ আকার জ্ঞানী পন্ডিতদের সঙ্গে অজ্ঞানী পন্ডিতদের তুলনা করার সুযোগ তারা পেয়েছিল আর বাস্তব বাদী সাধারণ মানুষের মন তখন একটু একটু করে জ্ঞানী পন্ডিতদের অমোঘ যুক্তি আর তার বাস্তব প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হয়েছিল। মনে হয় এই সময় থেকেই সমাজের শাসন ক্ষমতা ধীরে ধীরে রাজা বা ক্ষত্রিয় সমাজের হাতে চলে আসতে থাকে। ছাত্র সমাজ লড়াই করে রাজাদের হাত থেকে ক্ষমতা নেয় নি। বিজ্ঞানের অগ্রগতি তার হাতে ক্ষমতা এনে দিয়েছিল। প্রজাদের বাস্তব মুখী মন আর যাজকদের অন্ধ-নীতির ওপর আস্থা রাখতে পারে নি, আর কুসংস্কার মুক্ত যাজক-দেরও রাজার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এতেই রাজার ক্ষমতার বৃদ্ধি।

এই প্রসঙ্গে দেখা যায় বণিক বা বৈশ্য সম্প্রদায়ের হাতে ক্ষমতা আসে এই বিজ্ঞানের উন্নতিতেই। রাজাদের শাসন অটুট ছিল কৃষি-ভিত্তিক সমাজে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নীতে, কল-কারখানার উদ্ভবের সঙ্গে রাজার ক্ষমতা গৌণ হয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা চলে আসে বৈশ্যদের হাতে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি সেখানে স্তব্ধ সেখানে প্রচীন ধারনার বশবর্তী পুরাণ সমাজ ব্যবস্থা অনিবার্য্য অটুট।

মানুষ কৃষি কাজ আর পশু পালনের অভ্যাসের ফলেই সুস্থ জীবনের সন্ধান পায়। বনে জঙ্গলে পশু শিকার আর গাছের ফলমূলের ওপর বেঁচে থাকাকে ঠিক জীবন ধারণ বলা যায় না। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝের সময়টুকু সে নিজের মনের মত করে নিতে পেরেছিল এই সুস্থ জীবনের জন্যেই, আর সভ্যতার গতি বলতে যা বুঝি তা এ সময় থেকেই। প্রয়োজনের খাতিরে অনুসন্ধান আর অনুসন্ধানের ফলে আংশিক সমাধান ক্রমশঃ বাস্তবমুখী মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল। সংঘবদ্ধ সামাজে প্রগতি-শীল নিয়ম নীতির স্রষ্টা হিসেবে তদানীন্তন যাজক সম্প্রদায়ের অবদান অনস্বীকার্য্য। অন্ধ কু-সংস্কার আজ যাকে আমরা বলি তার বেশীর ভাগই সৃষ্টি হয়েছিল সে সময়ের বুদ্ধিমান পুরোহিত-কুলের দ্বারা। যদিও আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থ তাঁর সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করতেন, তবুও আজকের চোখে যা কুসংস্কার সেদিন হয়ত তাই ছিল অনিবার্য্য। স্বার্থন্বেসী লোক সব সমাজেও সব যুগেই কিছু থাকে, কিন্তু তারা গৌণ। প্রগতির সংকট-মুহূর্তেই দেখা যায় তাদের সাময়িক তান্ডব।

রাজার হাতে ক্ষমতা আসার অন্যতম কারণ হিসেবে যেমন বলা যায় বিজ্ঞান-ভিত্তিক চিন্তার প্রকাশ, তেমন বলা যায় এক নায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা। ব্যক্তিগত সম্পদ হিসেবে সমস্ত রাজ্যকে কুক্ষিগত করার প্রয়োজন রাজাকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হত শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষায়। প্রজারঞ্জনের কথা ভাবতে হ'ত। রাজস্ব আদায়ের তাগিদে উৎপন্ন শষ্যের হিসাবের প্রয়োজন ছিল। রাজ্যের আয় ছিল রাজার উপজীবিকা সেজন্য রাজ্যের সম্পদের উন্নতি অবনতি রাজাকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রভাবিত করত।

রাজতন্ত্রের যুগে পুরোহিত যুগের সংকীর্ণতা

অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। কারণ ব্রাহ্মণের শাসন ছিল ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের স্বার্থাভিমুখী। ক্ষত্র-শক্তিতার পরিবর্তন করে শাসনের সুবিধার জন্য। রাজ শক্তি সমাজের আরও অভ্যন্তরে যায়, শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে, আপন ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন রাজ্যে তা বিস্তৃত করতে। যেহেতু এ সব কাজে চাই বৃহত্তর জনগনের সাহায্য, তাই এ ক্ষেত্রে সম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে অনেকাংশেই খর্ব করতে হয়েছে. শিক্ষাকে প্রচারের মাধ্যম বিস্তৃত করতে হয়েছে আর করতে হয়েছে দেশবোধ বা জাতীয়তাবোধকে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে স্থাপন।

বিভিন্ন রাজশক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই যুগের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান দেশবোধ যা সাম্প্রদায়িকতাকে জয় করে সাধারণ মানুষকে পরস্পরের কাছে টেনে এনেছিল। রাজ-পূজা, দেশ ভক্তির মাধ্যমে সাধারণের ভেতর একটা সচেতনতা জাগিয়ে দিয়েছিল। এর সুযোগ যাজক-সম্প্রদায়ের শাসনে ছিল না বললেই হয়। ক্ষাত্র শাসনের প্রথম দিকে ছিল বাহুবলের প্রাধান্য, পরে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত হয় বিচার বুদ্ধি। ক্রমশঃ উদারতার প্রকাশ হতে থাকে। বাহুবলের অনুশীলন, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা মনে হয় রাজ শক্তিরই অবদান। দুর্বলকে সকলের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার নীতি বা বহিরাক্রমণ থেকে সংঘবদ্ধ ভাবে আত্মরক্ষা (অবশ্য রাজশক্তির পক্ষে এবং স্বার্থে) প্রভৃতির প্রকাশ ক্ষাত্র—সমাজের চেয়ে ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে ছিল অল্প পরিসরে আবদ্ধ। ক্ষাত্র-শাসনে রাজার স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ এবং রাজ্য রক্ষার প্রয়োজন রচিত নীতি, রাজনীতি পূর্বেকার নীতি অপেক্ষা উদার হওয়াই স্বাভাবিক। মন্ত্রী যদিও ব্রাহ্মণ কিন্তু রাজার নির্বাচিত। এইখানেই প্রগতির ধীর অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত। সমাজ অনেক বেশী গতিশীল। গুণী-রাজার আনুকুল্যে, গুণীজনের আবিস্কারে, সৃষ্টিতে জনসাধারণের যোগের সূত্রপাত এই ক্ষাত্র যুগেই, সেটার প্রবল বিস্তৃতি বৈশ্য যুগে। দেশের সম্পদ সবই রাজার, তাই প্রজাদের মধ্যে আর্থিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাম মাত্র। এ সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজায় রাজায় ক্ষমতার রাজা-বিস্তারের। সম্পদ যতদিন কৃষি নির্ভর, ততদিন প্রজাদের মধ্যে বণিক সম্প্রদায়ের সম্পদ ছিল পরিমিত। কিন্তু যান্ত্রিক প্রগতির সঙ্গে যখন যন্ত্র-শিল্পের উন্নতি ঘটল তখন বণিক শ্রেণীর সঙ্গে রাজার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজার ক্ষমতা হল সীমিত বা বিলুপ্ত। এইখানেই বৈশ্য যুগের সুরু।

বিজ্ঞানের প্রকাশ যেমন ধর্ম-যাজকদের হাত থেকে সমাজের শাসন ক্ষমতা এনে দিয়েছে রাজাদের হাতে তেমনি প্রযুক্তি বিজ্ঞান এনে দিয়েছে শাসন-ক্ষমতা রাজাদের হাত থেকে বণিকের হাতে। শিল্প-বিপ্লবকে বলা যায় বণিক তন্ত্রের হাতে রাজ-তন্ত্রের পরাজয়ের সূত্রপাত। এই প্রসঙ্গে বলা যায় ইংরাজের ভারতবর্ষ অধিকার ও তার ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব বৈশ্যদের হাতে রাজতন্ত্রের পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যুগের মূল মন্ত্র বলা যায় কি ভাবে বহুর উপার্জন একের মুষ্টিগত করা যায় তারই প্রতিযোগীতা কিন্তু তা সত্ত্বেও বৃহত্তর জন-সমষ্টির মধ্যে চেতনা বোধ মর্যাদাবোধ ক্রমশঃ জাগ্রত এ সময়ে। আর্থিক শ্রেণী বিভাগ অন্য সংস্কারচ্ছন্ন শ্রেণী বিভাগকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। বিরাট বিস্তৃতি পূর্বের সমস্ত গণ্ডিকে ভেঙে দিচ্ছে। দেশে দেশে আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের আপন প্রয়োজনে অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা এনে দিচ্ছে। আর এনে দিচ্ছে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের পরিবারের গভীরতা। এই হচ্ছে বৈশ্য যুগের অবদান, যদিও এ সমস্তই মুষ্টিমেয় বণিকের আর্থিক লালসায়। ক্রমশঃ দেখা যাচ্ছে রাজার বিরুদ্ধে বণিকের বিক্ষোভ আর বণিকের উচ্ছাভিলাসের বিরুদ্ধে রাজার প্রতিবিধান।

কিন্তু ইতিহাসের অঘোষ নিয়মে দেখা যায় প্রজাদের বিপুল অংশ বণিকের পক্ষে। এইখানেই রাজার পরাজয়। যদিও সাধারণ প্রজা মাত্রই বণিক নয় অথবা বণিক হলেও রাজার বিরুদ্ধাচরণ করার মত বিপুল সম্পদের অধিকারি নয়, কিন্তু তবুও স্বাধীন চিন্ততা এবং রাজার পূর্বেকার গণ্ডীবদ্ধ নীতির প্রতি বিতৃষ্ণা অথবা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বাধীন জীবনের আকাঙ্খা তাদের রাজার শাসনের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেছিল। যন্ত্র-সভ্যতা সুরু হওয়ার পর রাজা হয়ে গেলেন গৌণ। রাজার ক্ষমতা কৃষি-নির্ভর সমাজের পরই নষ্ট হতে সুরু হয়। দেখা যায় যন্ত্র-সভ্যতার সুরু মানেই বৈশ্য যুগের সুরু আর রাজ শক্তির

ক্রমাবসান পর্য্যায় ক্রমে ধীরে ধীরে।

বৈশ্যযুগের সূত্রপাতে যেমন বেকার সমস্যা, কৃষির প্রতি অমনোযোগের জন্যে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি, কিন্তু তবুও সে সময়ে জন-মন রাজ শক্তিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতেও অনিচ্ছুক। রাজা তখন সম্পূর্ণ ভাবেই বণিক-নির্ভর এবং হয়ত বা তাদেরই প্রতিনিধি। বণিকের স্বার্থেই রাজার রাজত্ব রক্ষা নয়ত বা রাজ্য-বিলোপ। ব্যক্তি-মানষের আত্ম-সচেতনা মনে হয় বৈশ্য যুগেই প্রকাশ পেতে সুরু করে। এ সময়ে আর্থিক সম্পদশালী মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় রাজার সঙ্গে বিরোধের ভাগিদে আত্ম-চেতনার পথে অনেকটা এগিয়েছে। কৃষি-নির্ভর রাজ শক্তির শাসনে বণিকের সম্পদ ছিল সীমিত এবং সেই অর্থোপার্জ্জনের পদ্ধতির ওপর রাজ-শক্তির ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ ছিল। সুতরাং রাজ-শক্তিকে হেয় করার ক্ষমতা তখন বণিক সম্প্রদায়ের ছিল না। কিন্তু কলকারখানা প্রভৃতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রচীন রাজকীয় শাসন ক্ষমতা বণিকের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। কারণ যন্ত্র-শিল্পের সৃষ্টি এবং প্রয়োগ বণিকের চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ে উৎকর্ষ লাভ করেছে। যন্ত্র-শিল্পের উন্নতিতে বণিকের উপার্জ্জন পদ্ধতির সঙ্গে রাজার উপার্জ্জন পদ্ধতির তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। আগে ছিল দেশের সমস্ত জমিরই মালিক রাজা নিয়মিত বিধানে, আর জমি ছাড়া যা শিল্পোৎপাদন তা নিতান্তই ব্যক্তিগত পরিশ্রমের ফল। এখানে রাজার ক্ষমতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা বণিকের নিতান্তই সীমিত এবং অপ্রয়োজনীয় ও বটে। কিন্তু যন্ত্র-শিল্পের বৈশিষ্ট হল বাহুর পরিশ্রমকে কুক্ষিগত করে একের উপার্জ্জনের পথ প্রসস্থ করা। ফলে কারখানার মালিকের হাতে আসে বিপুল সম্পদ। কিন্তু রাজা কোন কারখানার মালিকের নয়, কারখানার সৃষ্টি মালিকের আপন চেষ্টায়। এই খানেই রাজার সঙ্গে মালিকের বিরোধ এবং শেষে সংঘর্ষ। তারপরই আপোষে সমাধান, রাজার মন্ত্রি সভায় মালিকের প্রবেশ, অর্থাৎ বণিক রাজত্বের গোড়া-পত্তন। মহান দার্শনিক কার্লমার্কসের মতানুসারে এই যন্ত্র-শিল্পের সূত্রপাতেই অদূর ভবিষ্যতে শূদ্র-সমাজের সূত্রপাত যারা গঠন করবে পরবর্ত্তী শূদ্র-শাসিত সমাজ। কিন্তু এই আবির্ভাবের জন্যে প্রয়োজন ছিল যন্ত্র-শিল্পের, কারণ এর আগে এই শূদ্র সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ হবার সুযোগ এতটা প্রকট হয়ে উঠতে পারে নি।

বিজ্ঞানের সূত্রপাত এবং ক্রমোন্নতি সেই ব্রাহ্মণ-শাসিত আমল থেকেই আর সে ক্রমোন্নতিতেই যন্ত্র-শিল্পের দ্বারা সংগঠিত শূদ্র সমাজ। আসলে বিজ্ঞানের যত শীঘ্র উন্নতি ঘটেছে রাজশক্তি সে দেশে তত শীঘ্র খর্ব হওয়ার ফলে ব্যক্তি-চেতনার জাগরণ ক্রমশঃ বিভিন্ন সমাজেও জড়িয়ে পড়ে, তার ফলে বণিক না হয়েও ব্যক্তি স্বাধীনতার চিন্তা ক্রমশঃ জন মানস অধিকার করে। বৈশ্য যুগের 'বিস্তৃতিই এ যুগের প্রধান অবদান। রাজার আমলে যেমন 'জাতীয়তা' বোধ, তেমনি বৈশ্য যুগে আন্তর্জাতীয়তাবোধ। এই আন্তর্জাতীয়তা বোধ বৈশ্য যুগের আগে এত বিপুল আকার ধারণ করে নি। আবার যন্ত্র শিল্পের উন্নতি এবং প্রয়োগের ফলে ভোগের উপকরণ সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় দৈনন্দিন-জীবনের মানের উন্নতির সুরু এ যুগে।

কিন্তু বৈশ্যযুগের অভিলাষ হ'ল দারিদ্র। মানুষের দারিদ্র করাল রূপ নিয়ে বৈশ্যযুগে যে ভাবে দেখা দিল মনে হয় পূর্ব্বে তেমন হয় নি। এই সমাজের চরম কলঙ্ক হ'ল প্রাচুর্য্যের সঙ্গে দারিদ্রের পাশাপাশি অবস্থান। এই অভিশাপ যেন পূর্ব্বেকার দুর্ভিক্ষের অভিশাপকে ম্লান করে দেয়। বন্যা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপর্য্যয়ের কথা মনে করে তবু সান্ত্বনা আছে, কিন্তু বৈশ্যযুগ আইন অনুসারে সম্পদের পাসে অনটন। মুষ্টিমেয় এক দলের যত সম্পদবৃদ্ধি, বিরাট আর এক দলের তত অভাব দারিদ্র। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের শূদ্রে আর বৈশ্য শাসিত সমাজের শূদ্র এই খানেই এক বিরাট ভিন্নতা।

বিজ্ঞান ক্রমোন্নতির পথে বৈশ্যযুগে একে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বিরাট রূপ লাভ করেছে। ব্যবহারিক প্রয়োনের বিস্তৃতির ফলে মানুষের ভেতর একটা যন্ত্র নির্ভরতার অভ্যাস এবং বিষাদিতার ফলে তার মানষিকতার পরিবর্ত্তণও লক্ষ্যনীয়। এই যে সম্পদের পাসে অনটন এর জন্যে

অনেকটা দায়ী এই মানষিকতাও। এক দলের বিলাস-সামগ্রীর উৎপাদনে অপর দলের কঠোর পরিশ্রম। ক্ষাত্র যুগে যা কেবলমাত্র অত্যাচারী বিলাসী রাজার দ্বারা সংঘটিত হত, বৈশ্যযুগে যেন তা' সার্বজনীন ভাবে আইনানুসারে সমাজে সিস্কৃতি পেল।

বৈশ্যযুগের প্রথম দিকে যেমন ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতার চেতনা জাগাল, তেমনি যেন মানবাত্মার অবনতি ঘটল। সমাজের ভেতর আর্থিক শ্রেণীভেদ ক্রমশঃ মানুষের ক্ষমতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াবার ফলে, তাই ক্রমশঃ মর্য্যাদার মাপকাঠিতে পরিণত হল। প্রগতির মধ্যে কৃত্রিমতার অনুপ্রবেশ বৈশ্যযুগের প্রথম দিকে একটি বিশেষ ঘটনা। সূক্ষাতিসূক্ষ মানবিক আত্মানুভূতি ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে। সব কিছুরই মান বিচারে বনিকের আর্থিক তুলাদণ্ডই মানদণ্ডের রূপ লাভ করতে থাকায় সাধারণ মানুষ বিত্তশালীদের মুখাপেক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। এই গতি রোধ করার ক্ষমতা মানুষের ত ছিলই না উপরন্তু এই আকর্ষণে সে একেবারেই আত্ম বিস্মৃত। এখানে পথ-প্রদর্শন করার কেউ ছিল না। তবে শোষিত অবহেলিত যে শ্রমিক অর্থাৎ শূদ্র তাদের সঙ্গে শুরু হ'ল বনিকের বা সম্পদশালীর বিরোধ। প্রথমদিকে শ্রমিকের অজ্ঞতা নিরক্ষরতা আত্মঅচেতনতা শ্রমিকদের দুর্ব্বল করে রেখেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ বেকার সমস্যা-বৃদ্ধির ফলে এদের দলে একটু একটু করে অল্প শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত মানুষ জীবিকার উপায়ান্তর না পেয়ে প্রবেশ করতে থাকে, ফলে এই সমাজের উন্নতি ঘটতে থাকে। শেষে ধনী-দরিদ্রের ভেতর বিভেদ ক্রমশ সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে অর্থাৎ ক্রমশঃ সম্পদ-শালী বণিককে এই নিপীড়িতদের সম্বন্ধে সচেতন করতে থাকে। বণিকের এই সচেতনতা যতটা আপন স্বার্থের খাতিরে, ততটা মানবতার খাতিরে নয়। কারণ শ্রমিক-শ্রেণী দিন দিন অবনত হতে থাকলে বণিকের উৎপাদনের ক্ষতি। সেই বিচারে তাদের সম্বন্ধে এঁদের নতুন করে চিন্তা করতে হল। এই সময় থেকেই সমাজ তান্ত্রিক বিস্তার উদ্ভব। অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি মানুষের যে জীবনধারণের উপযোগী ন্যূনতম জিনিষের জন্মগত অধিকার তারই ধারণা। কিন্তু এই চিন্তার উদ্ভব শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থচিন্তা করতে গিয়েই। মালিকের সম্পদের অংশ কেন শ্রমিক পাবে না এই চিন্তার সঙ্গেই শ্রমিক ছাড়াও যারা সমাজে আছে তাদের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। শেষে দেশের সমস্ত সম্পদই জাতীয় সম্পদে পরিণত করার চিন্তার উদ্ভব ঘটল, যেটা আসে কৃষি নির্ভর সমাজে ছিল, অর্থাৎ দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন যেখানে রাজা। তাঁর ইচ্ছানুসারেই প্রজাদের বিলি বণ্টন হত এবং প্রয়োজনে তার পরিবর্ত্তণও রাজার ইচ্ছানুসারেই হতে পারত। এখন চিন্তা হল দেশের সমস্ত সম্পদ সমাজের অধিকারে আনা।

বৈশ্য যুগে দেখা যায় আত্মার অবনতি। এই সময়েই সংস্কৃতি পূর্ব্বের চেয়েও ভোগমুখি যা মানুষকে শান্তির পথে নিয়োজিত করতে পারেনি বলেই মনে হয়। অবশ্য বলা যায় এ যুগেই মানুষ আত্মিক চিন্তার বদলে ব্যক্তিগত বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে থাকে। অথবা বলা যায় আর্থিক পরিস্থিতি তাকে তাই করায়। তাই মনে হয় মানুষ তার আত্মিক বিশ্লেষণ কৃষি নির্ভর সমাজ যতটা করতে পেরেছে যন্ত্রযুগের বহির্মুখী মন নিয়ে ততটা করতে পারেনি। সে সময়ে ধর্ম্ম গুরু বা শিক্ষা গুরুদের জন্য অনাড়ম্বর জীবনকে উৎসাহিত করা হত তাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে। কিন্তু যন্ত্র যুগের আবহাওয়ায় নতুন মানষিকতা তাদের সে মূল্য দিল না। না দেওয়ারই কথা কারণ তখন মানুষের চিন্তা ধারাই বহির্মুখী হওয়ায় সে ধরনের চরিত্র বা প্রকৃতি গৌন হয়ে গেল। বিশেষ করে যখন আর্থিক বনিয়াদ ও পরিবর্ত্তিত হল। পূর্ব্বে তাঁদের বরাদ্দ ছিল রাজদণ্ড নিষ্কর জমি অথবা জন-সমাজের দক্ষিণা। এখন হল ধনীর সাহায্য, শ্রমিকের বিপক্ষের ধনীর পক্ষে ওকালতির জন্য। ফল যা হবার তাই হল ধনীর আনুকুল্য ছাড়া বিশেষ কৃতিত্বের তপস্যা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল।

এরপর শূদ্রযুগের কথা এ যুগের সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীর মাটিতে পূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয় নি। রুশ-বিপ্লবে এর সূত্রপাত মাত্র হয়েছে। তবে ভিন্নতা দেখাবার এক জায়গায়। ব্রাহ্মণদের হাত থেকে ক্ষত্রিয় বা ক্ষত্রিয়ের হাত থেকে বৈশ্যরা ক্ষমতা গ্রহণ করার বাহুবলের আবশ্যক হয়নি, কিন্তু

বণিকের হাত থেকে শূদ্রের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাহুবলের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। এ যুগের সমাজ বণিকের ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে সমস্ত উৎপাদন সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। আজ সারা পৃথিবীতেই এই ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার কথা প্রচারিত এবং ভাবনার একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। আজ সচেতন শিক্ষিত বিরাট জন-সমাজ এর পক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন দল, গোষ্ঠি গড়ে তুলেছে। এই ধরনের সমাজে ভাল আর মন্দ দু'দিকেরই বিচার বিশ্লেষণ পূর্ণ মাত্রায় হয়ে চলেছে। কে জানে কোথায় এর পরিসমাপ্তি। কিন্তু এ কথা প্রমাণিত যে দারিদ্র-নিপীড়িত সমাজে এই প্রথা মানুষকে অন্ততঃ দারিদ্র মুক্ত করেছে। নিত্য নৈমিত্তিক ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়েছে সাধারণ অবহেলিত অভুক্ত মানুষের, মানবিক মূল্য পেয়েছে মানুষ, পেয়েছে জীবনের মূল্য আর দীর্ঘসুস্থ জীবনের প্রতিশ্রুতি।

এ সমাজ এল বিজ্ঞানের স্বাভাবিক প্রগতিতে নয় এল প্রচণ্ড চেতনা বোধের ভেতর দিয়ে। শিক্ষা বিস্তারের কাছে এ যুগবাণী, মুদ্রন যন্ত্রাদির আবিষ্কারে।

কিন্তু যে দেশে বৈশ্যের দূর-দৃষ্টি প্রসূত সাবধানতার সাধারণের দারিদ্র প্রচণ্ডভাবে প্রকট হয়ে উঠতে পারে নি সেখানে স্বাধীনতা পেয়েছে এবং শূদ্র শাসিত শাসন ব্যবস্থা। সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার ঊর্দ্ধে বসাতে পারে নি সমাজবাদকে। তাদের দৃষ্টিতে সমাজবাদ সমাজের কাছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বলিদান। তাদের মতে সমাজ-বাদ মানে ব্যক্তির বিলুপ্তি সমাজের কাছে। প্রশ্ন জাগে দারিদ্র-নিপীড়িত ব্যক্তির সুস্থ সমাজের মধ্যে অবলুপ্তিতে ক্ষতি কি? পালটা প্রশ্ন যেখানে দারিদ্র অপ্রকট সেখানে এর প্রয়োজনই বা কি? তবে কি সমাজ বাদ সাধারণের কঠিন দারিদ্র মোচনের একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র? যদি সাময়িক হয় তবে এর পরবর্ত্তী অবস্থা কেমন হবে? আর যদি তা, না হয় তবে ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের পরিপূরক হবে। ব্যক্তি নিয়েই যেমন সমাজ, তেমনি সমাজ ভিন্ন ব্যক্তির সত্তা নেই। অন্ন-বস্ত্রের ভেতর একটা সাম্যের বোঝাপড়া ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্ভব হলেও চিন্তা-জগতে বা মনোজগতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সাম্য কষ্ট-কল্পিত ব্যাপার। চিন্তা-জগতে, বুদ্ধি বৃত্তির জগতে মানুষে মানুষে অসাম্যই প্রগতির শক্তি। সমাজের সব কটি মানুষের একই প্রকার চিন্তা ও প্রকৃতি যদি সম্ভবতে হয় তবে তা কি প্রগতির সহায়ক হবে, না প্রতিকূল হবে? মানুষের সঙ্গে মানুষের যেখানে বিভিন্নতা সেখানে সমাজের মধ্যে বিভিন্নতা থাকবেই, তবে আমার কথা এই সমাজ এক দল আর এক দলের প্রভু হয়ে তাকে নিপিড়ণ করবে না। কিন্তু এটাও বাস্তব সত্য যে এ সমাজের মানুষকে অন্নের জন্য দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে কঠোর জীবন সংগ্রামে ব্রতী হতে হবে না আজকের মত। ব্যক্তি মানুষ তার জীবন-ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন যে বিনা আয়াসেই পারে সমাজের কাছ থেকে, অবশ্য তার সাধ্যানুরূপ প্রকৃতিগত শ্রমের বিনিময়ে। তাই সে যুগের মানষিকতার পরিবর্ত্তণ অবশ্যম্ভাবী রূপে আসবে। আজকের জীবন-ধারনের ব্যাকুলতা-প্রসূত মানষিকতার পরিবর্ত্তে আসবে এক নতুন চিন্তার প্লাবণ। সেই সময়ে পাওয়া যাবে তার পরবর্ত্তী সমাজের এঙ্গিত। আজকের মানুষ জীবন-সংগ্রামের ক্লান্তিতে জর্জ্জরিত। জীবনের সার্থকতা অনির্দ্দিষ্ট বা অপরিথিতঃ কিন্তু সেদিনের সমাজ আশা করা যায় ব্যক্তি মানুষ খুঁজে পাবে তার জীবন-ধারনের সার্থকতা ভেদ করবে মনুষ্য-জীবনের গভীর রহস্য, জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে উঠবে মুখর।

ভয়

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

দীঘির পাড়ে সরু সরু অনেক গর্ত, সুড়ঙ্গের মত। তারই মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কাঁকড়া ধরে হরিপদ। এ তার দৈনন্দিন কাজ, বেশ বড় বড় কাঁকড়া। সেই কাঁকড়া বাজারে বেচে রোজগারও মন্দ হয় না।

সকাল হলেই দীঘির পাড়ে ছুটে যায় হরিপদ। অনেক কাঁকড়া ধরে। একটা চুপড়ি ভর্তি হয়ে যায়। তারপর বেলা হলে সে বাজারে গিয়ে বসে বিক্রীর উদ্দেশ্যে। যেদিন সে যেতে না পারে, সেদিন তার ছোট ভাই রঘুপদকে বাজারে পাঠায়।

আজও হরিপদ কাঁকড়া ধরছিল ভোরের আলো-আঁধারে। হঠাৎ একটা গর্তে হাত ঢোকাতেই কি যেন কামড়ে দিল আঙুলের ডগায়। তাড়াতাড়ি হাতটা টেনে নিল হরিপদ। আঙুল থেকে সামান্য একটু রক্ত বেরিয়েছে। বোধ হয় কাঁকড়ার কামড়। ভাল করে ধরতে পারেনি আঙুলটাকে, তাই কামড়টা তেমন জোরদার হয়নি।

কিন্তু হরিপদর মনে হলো, গর্তটার মধ্যে অনেকগুলো কাঁকড়া আছে। ব্যাটাদের টেনে বার করতে হবে গর্ত থেকে। কিন্তু আর সময় নেই তখন। একটা বিশেষ কাজের তাগিদেয় তাকে একবার সহরে যেতে হবে। তাই বাড়ীতে গিয়ে রঘুপদকে পাঠাল দীঘির ধারে। বলে দিলো, নারকেল গাছটার কাছে যে-গর্তটা, তার মধ্যেই রয়েছে কাঁকড়াগুলো।

হরিপদ রওনা হয়ে গেল সহরের দিকে।

রঘুপদ দীঘির ধারে গিয়ে সেই গর্তটার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলো, একটা সাপ রয়েছে দড়ির মতো পাকিয়ে। তাড়াতাড়ি একটা বাঁশের টুকরো নিয়ে এলো রঘুপদ, তারপর সেটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে সাপটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শেষ করে দিল। তার মনে পড়ল যে, দু-তিন দিন আগে সে একটা কেউটে সাপকে এই গর্তের মধ্যে ঢুকতে দেখেছিল। সব নাশ, সেই কেউটে সাপটাই তাহলে দাদাকে কামড়েছে।

দুশ্চিন্তায় মাথা ঘুরতে লাগলো রঘুর। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলো সে, তারপর ঊর্ধশ্বাসে ছুটলো রেল-স্টেশনের দিকে। দাদা সহরে যাবার জন্যে বেরিয়েছে। হয়তো স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছতেই পারেনি, পথের মধ্যে কোথাও মরে পড়ে আছে!

ছুটতে ছুটতে স্টেশন পর্যন্ত গেল রঘুপদ। কিন্তু কোথাও পেল না দাদাকে। খবর নিয়ে জানলো, সহরে যাবার গাড়ী একটু আগে স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। রঘু বুঝতে পারলো, দাদা আর ফিরবে না।

চোখ মুছতে মুছতে রঘু বাড়ীতে ঢুকলো। হরিপদর বউ রান্নাঘরে যাচ্ছিলো, জিজ্ঞেস করলো কী হয়েছে ঠাকুরপো? তোমার চোখে জল কেন?

রঘু এবার হু হু করে কেঁদে ফেললো। বললে, সর্বনাশ হয়েছে বৌদি দাদাকে সাপে কামড়েছে! কেউটে!

বউটার হাত থেকে বাসনগুলো ঝনঝন করে পড়ে গেল মাটিতে। বাড়ীতে কান্নার রোল উঠলো। গ্রামের লোক ছুটে এলো চারদিক থেকে।

— আহা, বড় ভালো লোক ছিল হরিপদ! হে ভিন মরলো সাপের কামড়ে! সবাই বলাবলি করতে লাগলো। নিয়তির কী নিষ্ঠুর খেলা!

সকাল থেকে দুপুর হলো, দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য। বৌদির হাহাকার, ছেলে-মেয়েদের কান্না, আর পাড়া প্রতিবেশীদের আলোচনায় দিনটা যে কী ভাবে কেটে যাচ্ছিলো তা বুঝতে পারেনি রঘু।

এই গোলমালের মধ্যে সে নিজেকে একেবারে হারিয়ে

ফেলেছিলো। হঠাৎ পড়ন্ত বেলায় দরজার মুখে দাদাকে দেখে সে চমকে উঠলো।

বাড়ীতে ভীড় দেখে হরিপদ থমকে দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছে না সে। রঘু ছুটে এসে বললে, একি, তুমি কি করে ফিরে এলে দাদা?

—কেন, আমার তো আজই ফেরার কথা ছিল সহর থেকে?

রঘু বিশ্বাস করতে পারলো না বললে এ—অসম্ভব। কি করে তুমি ফিরে আসবে? তুমি কি এখনও বেঁচে আছ?

—কেন, কি হয়েছে আমার?

—তোমাকে যে সাপে কেটেছে। রঘু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললে, সকালবেলা তোমার আঙুলে যেটা কামড়েছে, সেটা জাত কেউটে।

প্রতিবেশীরা দাঁড়িয়েছিল সেখানে। বললে, হাঁ, তোমাকে আজ সাপে কেটেছে। রঘু নিজের হাতে মে রছে সাপটাকে।

—সে কি। সাপে কামড়েছে আমাকে! বলতে বলতেই ধড়াম্ ড করে মাটিতে পড়ে গেল হরিপদ। শরীরটা ঘামে ভেজা, চোখের তারাদুটো নিশ্চল।

ডাক্তার এসে অনেকক্ষণ ধরে হরিপদকে পরীক্ষা করে শেষে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। —না, আর আশা নেই, সব শেষ হয়ে গেছে। বললেন, ভয়েতেই মারা গেছে লোকটা। সাপের কথা শোনানো উচিত হয়নি তাকে। কিসে কামড়েছে তা ভালভবে না জেনে কেউটের কথা শোনানো খুবই অন্যায় হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করলেন। আকস্মিক আতঙ্কে হার্ট ফেল্ করেছে হরিপদর।

ডাক্তার চলে গেলেন। প্রতিবেশীরা এবং বাড়ীর সবাই যখন হরিপদর মৃতদেহটা নিয়ে ব্যস্ত, তখন রঘু নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে সেই দীঘির ধারে গিয়ে হাজির হলো। মরা সাপটা তখনও রয়েছে গর্তের মধ্যে। গর্ত থেকে সেটাকে টেনে বার করলো রঘু। তারপর সাপটার ওপর ঝুঁকে পড়ে লক্ষ্য করতেই এক নজরে বুঝতে পারলো রঘু, এটা তো কেউটে নয়, এ যে একটা জলঢোঁড়া সাপ, যার বিষ হয় না বললেই চলে। এই সাপটার ভয়েই দাদাকে মরতে হলো!

কী জানি কেন, সাপটার ওপর ভীষণ রাগ চেপে গেল রঘুর মাথায়। গাছ থেকে একটা মোটা ডাল ভেঙে নিয়ে সে থেঁৎলে থেঁৎলে মারতে লাগলো মরা সাপটাকে।

সেলাম

মনোজ গুপ্ত

নিখিলবাবু বহুদিন পরে নবদ্বীপ এলেন। প্রথম এসেছিলেন অনেক দিন আগে, তা প্রায় তিরিশ বছর হবে। এসেছিলেন বৃন্দাবনে এক বৃদ্ধের কাছে অপদস্থ হয়ে।

একটা কাজে বর্ষার সময় দিল্লি যেতে হয়েছিল। কাজটা তাড়াতাড়ি মিটে গেল। হাতে কদিন সময় ছিল সেটার সদ্ব্যবহার করতে চান কিন্তু সময়টা কাশ্মীর-মুসৌরী যাবার উপযুক্ত নয়। ভাবছিলেন কোথায় যাওয়া যায়। যে হোটেলে ছিলেন সেখানকার একজন বললেন মথুরা-বৃন্দাবনের কথা; চলে গেলেন। বৃন্দাবনের পথে ঘুরতে ঘুরতে একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হল। তিনি নিজেই আলাপ করলেন, বললেন, "একা দেখছি, বৃন্দাবনে যে গাঁটছড়া বেঁধে আসতে হয়।" নিখিলবাবু বললেন, "নিরুপায়, ওটা এখনও হয়ে ওঠে নি।" ভদ্রলোক বললেন "এ বয়সে মথুরা-বৃন্দাবন আসতে দেখে মনে হয়েছিল বোধ-হয় সাহেব লোক নয়।" ভদ্রলোক ঘুরে ঘুরে বৃন্দাবনে যা যা দেখা উচিত দেখাচ্ছিলেন। নিখিলবাবু একটু বিব্রত বোধ করছিলেন। ভদ্রলোক বললেন, "আপনি কিন্তু কিন্তু করছেন কেন? এ তো আমার সৌভাগ্য।" দ্রষ্টব্যস্থান-গুলো দেখাতে দেখাতে ভদ্রলোক প্রায়ই নবদ্বীপের কথা বলছিলেন। হঠাৎ নিখিলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোকের কি রকম সন্দেহ হল; জিজ্ঞেস করলেন, "শ্রীধাম নবদ্বীপ নিশ্চয় দেখা হয়েছে?" লজ্জার কথা কিন্তু নিখিলবাবুকে স্বীকার করতে হয়, "দেখা হয় নি"। ভদ্র-লোক যেন মর্ম্মাহত হলেন, "বললেন. সে কি? বাঙ্গালীর ছেলে, মথুরা বৃন্দাবন দেখতে এসেছেন আর ঘরের কাছে শ্রীধাম নবদ্বীপ দেখেন নি।" বুড়োর অনুরোধ, কলকাতা ফিরে যত তাড়াতাড়ি পারেন শ্রীধাম ঘুরে আসবেন।

কলকাতা ফিরে অল্পদিনের মধ্যে নিখিলবাবুর সুযোগ হয়েছিল। তখনকার দিনে ভোরে সুর্মা মেল ছাড়তো শিয়ালদা থেকে। এক বন্ধুকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফির-ছিলেন। স্টেশনেই একদল বাবাজীর সঙ্গে দেখা হল, তাঁরা মায়াপুর যাচ্ছিলেন, তিনি দলে ভিড়ে গেলেন। ইচ্ছে ছিল তাঁদের সঙ্গে গিয়ে তাড়াতাড়ি মায়াপুর দেখে নব-দ্বীপ যাবেন। কিন্তু তা হল না। একজন বাবাজী পথ রোধ করে বললেন, জানেন তো বৈষ্ণবের বাড়ী থেকে অতিথি অভুক্ত অবস্থায় ফিরতে পারে না। আপনি এখান থেকে এই অবেলায় অভুক্ত ফিরে গেলে আমাদের মহা অপ-রাধ হবে। তাঁর আচরণে এমন কিছু ছিল যে নিখিলবাবু তাঁর কথা ঠেলতে পারলেন না। তাঁর সৌভাগ্য যে এই বাবাজীর অনুরোধ উপেক্ষা করেন নি, করলে জীবনের একটা অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতেন। একটা লম্বা দালানে খাবার জায়গা, সবাই একসঙ্গে বসলেন— বাবাজীরা, অতিথি-অভ্যাগতরা, এমন কি যে সমস্ত মজুর-মিস্ত্রিরা কাজ করছিল তারাও-মিস্ত্রিরা মুসলমান। জল গেলাসে করে আলাদা আলাদা দেওয়া হয় নি, ঘটিতে জল ছিল যে যার প্রয়োজন মত নিচ্ছিলেন। এ দৃশ্য আগে নিখিলবাবু কখনও দেখেন নি তাই অবাক হয়ে গিয়ে-ছিলেন।

নবদ্বীপ দেখে ফেরার পথে এই অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে ভাবতে আসছিলেন, আশে পাশে বিশেষ লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ একজন সামনে এসে দাঁড়াতে একটু চমকে উঠলেন। লোকটা বললে, "স্যার, আপনি?"

অন্য সময় হলে তিনি খুসী হতেন না কিন্তু সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার পরই তার সঙ্গে হঠাৎ এই পরিবেশে দেখা হতে কি জানি কেন বিরক্ত হতে পারলেন না। বললেন, "নবদ্বীপ ও মায়াপুর দেখতে এসেছিলাম।" তারপর স্বাভাবিক প্রশ্ন "এ সময় আপনি এখানে?" আমার বাড়ী যে এখানে স্যার।" কি জানি কেন কথাগুলো অবিশ্বাস্য বলে

মনে হল অথচ তিনি জানতেন ঐ অঞ্চলে অনেক মুসলমানের বাস। হ্যাঁ, লোকটী মুসলমান, নাম শেখ দুখু। লোকটী হাত জোড় করে বললে, "কখনও ভাবতে পারিনি আপনার সঙ্গে এখানে এই ভাবে দেখা হবে। দেখা যখন হয়েছে তখন একটা অনুরোধ রাখতে হবে স্যার, একবার আমাদের বাড়ী পায়ের ধুলো দিতে হবে। সামনেই আমার বাড়ী, আপনার দেরী করে দোব না।" অন্য সময় হলে এ রকম অনুরোধে নিখিলবাবু ক্ষেপে যেতেন, লোকটাকে যতটুকু জানেন এরকম অনুরোধ সে করতোও না। তাঁরা যেখানে থাকেন সেখানে এর সঙ্গে রোজ দেখা হয়; এর বাড়ীর সামনে দিয়ে প্রায়ই যেতে হয়; বহুবার দেখা হয়েছে কিন্তু কোনদিন সে নিখিলবাবুকে তার বাড়ীতে যেতে অনুরোধ করেনি। তবে আজ করল কেন? এ কি স্থান মাহাত্ম্য? তিনি কি তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন? তা যদি পারতেন তা হলে ফিরতে দেরী হবে জেনেও আর ত সঙ্গে পরিচয় অফিসের ব্যাপারে হওয়া সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করবেন কেন? তার সঙ্গে নিখিলবাবুর যা সম্পর্ক তাতে তার বাড়ী যাওয়ার একটা কদর্থ করা যেতে পারে কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সে কথা তাঁর মনে আসে নি।

বাড়ীতে তার বুড়ি মা ও ছেলে মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হল—সকলেই এমন ব্যবহার করছিল যেন তিনি কোন মহামান্য অতিথি; তাঁর বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। সাধারণতঃ একজন বাঙ্গালী আর একজন বাঙ্গালীর বাড়ীতে গেলে যা নিয়ম—সামনে মিষ্টি রেখে খেতে অনুরোধ করা—দুখু মিয়া কিন্তু তা করলে না। চলে আসবার সময় তার বুড়ি মা বললে, "তোমায় কাছে বসিয়ে খাওয়াবো সে সৌভাগ্য তো করি নি, তুমি বাবা এইটে নিয়ে যাও, এতে দোষ নেই।" বুড়ি তাঁর হাতে একটা পাকা আম দিল। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন কারণ সেটা শীতকাল। দুখু বললে, "আমাদের বাড়ীতে একটা বারমেসে গাছ আছে, তার ফল মা অতিথি-ফকির ছাড়া আর কাউকে দেয় না।"

নিখিলবাবু বুড়ীকে বললেন, আপনার বাড়ীতে খেতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, তবে আজ পারব না, কারণ অবেলায় বারাজীরা যা খাইয়েছেন তাতে এখনও বেশ কষ্ট হচ্ছে।" বুড়ী বললে, "বেশ তবে কথা দাও একদিন আবার যখন এখানে আসবে এখানে কিছু খাবে।" কথা দিয়েছিলেন।

* * * *

দুখুর সঙ্গে নিখিলবাবুর পরিচয় অফিসে ও অফিসের ব্যাপারে। পরিচয়ে খুসি হয়েছিলেন বলতে পারা যায় না বরং সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হবে বেশ বিরক্তই হয়েছিলেন।

পাণ্ডববর্জ্জিত না গ্রাম না শহরের একটা জায়গায় কারখানার ছোট অফিসে চাকরি। সহ কর্ম্মীরা তাঁকে সুনজরে দেখেনি কারণ তিনি কলকাতার লোক এবং য়ুনিভারসিটীর দরজা মাড়িয়েছিলেন; তাদের কাছে দুটোই অপরাধের সামিল। বড়বাবুই হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। সাহেব একজন ছিলেন কিন্তু নিখিলবাবুর তাঁর ধারে কাছে যাবারও সম্ভাবনা ছিল না। কি কাজ করতে হবে আর কিভাবে করতে হবে বড়বাবুই বলে দিতেন আর তা নির্বিচারে মেনে নিতে হত। কিছু বললেই বলতেন, "তোমাদের ওসব কলেজী বিদ্যে এখানে চলবে না।" কারখানায় ক'টা ছোটখাটো জিনিষ দরকার। তার লিষ্টটা দিয়ে বড়বাবু বললেন, "আগের অর্ডার দেখে অর্ডার দিয়ে দাও।" আগের অর্ডারটা অনেকদিন আগেকার। সেটা দেখিয়ে নিখিলবাবু বড়বাবুকে বললেন, "এখন তো এদামে নাও থাকতে পারে, একবার দামগুলো যাচাই করে দেখলে হত না?"

বড়বাবু বললেন, "এই জন্যেই কলেজে পড়া ছেলেদের আমি নিতে চাই না। তোমাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। তুমি বসে বসে দর যাচাই কর আর ওদিকে কারখানা বন্ধ হয়েযাক। যা বলছি তাই কর।" কারখানা সময়মত জানায় নি কেন একথা তুলে তাঁর আরও কিছু মিষ্টি কথা শোনবার লোভ ছিল না। মাছিমারা কেরাণী, যা বললেন তাই করতে হল।

এর ক'দিন বাদে দুখু মিয়া এসে সামনে দাঁড়াল। সে রোজই অফিসে আসে। কেন আসে নিখিলবাবু জানতেন

না। রোজ সকালে আর বাড়ী যাবার সময় সে একবার করে তাঁকে সেলাম করে যায়। সেদিন সেলাম করে দাঁড়িয়ে রইল। কি চাই জিজ্ঞেস করতে একখানা দশটাকার নোট তাঁর টেবিলে রাখল। "এটা কি জন্যে?" জিজ্ঞেস করতে মাথা চুলকে বললে, "এটা আপনার কমিশন স্যার"। এভাবে খোলাখুলি ঘুষ দেওয়া যায় তা তাঁর জানা ছিল না। খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, এটা তুলে নিন, আর কখন দিতে আসবেন না।"

* * * *

এর পরই তাঁর সঙ্গে নবদ্বীপে দেখা।

অফিসের আবহাওয়ায় নিখিলবাবু হাঁফিয়ে উঠেছিলেন; তার ওপর থাকবার জায়গাটা ছাড়বার নোটিশ পেলেন। কোম্পানী চাকরী দিয়েছিল কিন্তু কোথায় থাকবেন সে ভাবনা তাদের নয়। সে যাত্রায় বড়বাবু উদ্ধার করেছিলেন একজনকে ডেকে তার সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে। অন্যলোকের ভাড়া নেওয়া বাড়ীতে এই ভদ্রলোক একখানা ঘর পেয়েছিলেন আর বড়বাবুর অনুগ্রহে তার আধখানায় নিখিলবাবু থাকতে পান। একদিন সন্ধ্যেবেলা আস্থানায় ফিরে শুনলেন ঘর ছাড়তে হবে কারণ বাড়ী যিনি ভাড়া নিয়েছেন দেশ থেকে তার স্ত্রী আসছেন কাজেই সেখানে বাইরের লোকের থাকা চলবে না। যাঁর ঘরে তিনি জায়গা পেয়েছিলেন সে লোকটি অনেকদিন ওখানে কাজ করছে, অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের একজনের সঙ্গে ব্যবস্থা করে নিতে তার অসুবিধে হল না, কিন্তু সেখানে নিখিলবাবুর জায়গা হল না। অচেনা জায়গায় অনেকক্ষণ ঘুরলেন কিন্তু মাথা গোঁজবার একটা জায়গা যোগাড় করতে পারলেন না। বাধ্য হয়ে পরদিন আবার বড়বাবুর স্মরণাপন্ন হলেন। তিনি হেসে বললেন, "খবরটা আগেই পেয়েছি আর তুমি বলবার আগে চেষ্টাও করেছি। একটা ঘর পাওয়া যায় কিন্তু তুমি সারা জীবন সহরে কাটিয়েছ, তুমি কি সেখানে থাকতে পারবে? একটা পুরোণ বাড়ীর একতলা ঘর।" নিখিলবাবু বললেন, "খুব পারব, আর না পারলে চলবেই বা কেন? এর চেয়ে ভাল পাচ্ছি কোথায়?" বড়বাবু বললেন "তাহলে ছুটী হলে দুখুমিয়ার সঙ্গে গিয়ে ঘরটা দেখে এস।"

ছুটীর একটু আগে দুখু তাঁর সীটের কাছে এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গে পথে বেরুতে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বললে, "আপনার এখানে থাকা সম্ভব হবে না স্যার, আমি সে কথা বড়বাবুকে বলেছি কিন্তু উনি বললেন, "এখন এখানেই উঠুক পরে যা হয় হবে।" একটা আশার কথা হচ্ছে এই যে, যে লোকটী ওপর তলায় আছে সে অন্য জায়গায় বদলি হয়ে যাচ্ছে আর সে চলে গেলেই আপনি ওটা পাবেন।"

ঘরটা দেখে নিখিলবাবুর চোখে জল এসে গিয়েছিল। বড়লোকের ঘরে জন্মান নি কিন্তু কোনদিন এরকম জায়গায় থাকতে হবে তা ভাবতে পারেননি। অনেকটা জঙ্গল পেরিয়ে ঘরটায় পৌঁছতে হয়, এককালে বাগান ছিল এখন আর বাগান নয়, জঙ্গল। ঘরটা বড় কিন্তু বেজায় স্যাঁতসেঁতে একটা মাত্র জানালা, তাও খুব ছোট আর কড়ি কাঠের কাছাকাছি, দেওয়ালে অনেক জায়গায় বালি খসে গেছে, যেখানে আছে তা নোনা ধরা। তাঁর মনের অবস্থা বুঝে দুখু বললে, "আমি তো আগেই বলেছিলাম এখানে থাকতে পারবেন না।" সমস্ত দ্বিধা, অস্বস্তি কাটিয়ে উঠে নিখিলবাবু বললেন, "ঠিক আছে, এখানেই থাকব, আপনি ব্যবস্থা করুন।"

"ব্যবস্থা আর কি, আপনি কালই এসে উঠতে পারেন। বাড়ীর মালিককে বলে রাখব যাতে ঘরটা পরিষ্কার কারয়ে রাখে"। ফেরবার সময় দুখু টর্চ জেলে বললে, "একটু দেখে চলবেন, প্রায়তো জঙ্গল হয়ে উঠেছে কিনা, সাপখোপ তো আছেই।" জীবনে চিড়িয়াখানা ছাড়া যে সাপ দেখেনি আজ না হয় সে দেখে-শুনে পা ফেললে, কাল থেকে? প্রতি মুহূর্তে কি দেখে শুনে চলার কথা মনে থাকবে? তাছাড়া জঙ্গল ছেড়ে যে ঘরে ঢুকবে না এমনই বা কি কথা আছে? তবু তাঁকে ঐ ঘরেই উঠতে হল।

যেদিন এ ঘর দখল করলেন সেই দিনই সন্ধ্যেবেলা দুখু এল কোন কিছু দরকার আছে কিনা জানবার জন্যে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, এত কষ্ট করে থাকতে হচ্ছে বলে দুঃখ করলে। হঠাৎ কি মনে হতে বললে, "আমি আসছি।"

একটু পরে সে ফিরল কজন লোকের সঙ্গে একটা তক্তপোষ বয়ে নিয়ে। নিখিলবাবু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার?" তক্তপোষটা ঠিক করে রাখতে রাখতে দুখু বললে, "আমার অন্যায় হয়ে গিয়েছিল স্যার। মুখ্যু হওয়ার অনেক দোষ; মেঝেতে আপনি শোবেন কি করে তা একবারও মনে হল না।" লোকটার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি বদলাতে সুরু করেছে? বললেন, "জোগাড় করলেন কোথা থেকে? বাড়ী থেকে আনলেন নাকি?" জিব কেটে দুখু বললে, "তা কি পারি? এটা বাড়ীওলার; ওদের অনেক জিনিষ পত্র পড়ে আছে, উইপোকায় কাটছে, এ তো তবু আপনার ব্যবহারে লাগবে।"

পরদিন সকালে বাড়ীওয়ালার বাড়ী থেকে একটা বহু পুরোণ টেবিল ও ছখানা চেয়ার এল আর ওদের লোকই ঘরটা ঝাঁট দিয়ে গেল। এ সব ব্যবস্থাও দুখুই করেছে বুঝতে অসুবিধে হল না।

দুখু রোজই সন্ধ্যের পরে আসে কিছু দরকার আছে কিনা জানবার জন্য অথচ রোজই অফিসে তার সঙ্গে দেখা হয়। নিখিলবাবু একদিন বলেছিলেন "রোজ রোজ কষ্ট করে আসেন কেন? সত্যি কিছু দরকার হলে আপনাকে তো অফিসে বলতে পারি।" দুখু বলেছিল, "কষ্ট? কি যে বলেন স্যার। সন্ধ্যের সময় নমাজ পড়া হয়ে গেলে বাড়ীতে তো থাকতে পারি না, রোজই একটু ঘুরে বেড়াই; পথেই পড়ে তাই একবার ঘুরে যাই। আপনাদের মত লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ যে থাকতে পারি সে কি কম ভাগ্যের কথা।" এর পর তার রোজ আসায় আর আপত্তি করা নিখিলবাবুর সম্ভব হয় নি।

নিখিলবাবু প্রতি শনিবার বিকেলে কলকতায় চলে আসতেন আর সোমবার কাক ভোরে বেরিয়ে পড়তেন যাতে ঠিক সময় কারখানায় হাজির হতে পারেন। বাড়ী বদলানোর কথা তাঁর বাবাকে বলতে হয়েছিল কিন্তু বর্ত্তমান আশ্রয়স্থলের স্বরূপটা যতটা সম্ভব চেপে গিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর বাবা কি বুঝেছিলেন বলা যায় না, সোমবার বেরুবার সময় দেখা গেল তাঁর বাবা সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী। এ কথা নিখিলবাবু ভাবতেই পারেন নি; বললেন, "তা কি করে হয়? আমি সকালে কারখানায় ক্যান্টিনে খাই, রাতে একটা পাইস হোটেলে। আপনার ভয়ানক অসুবিধে হবে।" তাঁর বাবা বললেন, "যদি ভয়ানক অসুবিধে বলে মনে করি তা হলে ফিরে আসব। অবশ্য তোমার যদি অসুবিধে হয় ....." এর পর আর কিছু বলবার ছিল না।

তাঁর বাবাকে কোন রকমে ঘরে পৌঁছে দিয়ে নিখিলবাবু কারখানায় ছুটলেন তা নাহলে কার্ড পাঞ্চ করতে দেরী হয়ে যাবে। খুব খারাপ লাগছিল বাবাকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যেতে কিন্তু না গেলে চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে কারণ তখনও কনফারমেশন্ হয় নি। তাছাড়া অফিস কামাই করা তাঁর বাবা মোটেই পছন্দ করতেন না।

অন্য দিনের মত আজও দুখু এসে সেলাম করল। প্রতি-নমস্কার করতে জিজ্ঞেস করল, "সাইকেল রিক্সায় আপনার সঙ্গে একজন বুড়ো ভদ্রলোককে দেখলাম, উনি ..."

"আমার বাবা।"

"ওঁকে একা রেখে আপনি চলে এলেন, ভদ্রলোকের যে বড় কষ্ট হবে। আপনার ওখানে রান্না-বান্নারও ব্যবস্থা নেই ....."

কি করব বলুন? চাকরী তো বজায় রাখতে হবে।"

দুখু মিয়া আর কিছু না বলে চলে গেল। বাবাকে এ অবস্থায় ফেলে চলে আসার জন্যে তাঁর মনটা সারাদিন খুব খারাপ হয়েছিল। দুপুরে ক্যান্টিনের অখাদ্য খেতে খেতে মনে হচ্ছিল "আমার তো তবু একমুঠো ভাত জুটলো, বাবাকে নিশ্চয় চিঁড়ে ভিজিয়ে খেয়ে থাকতে হয়েছে।"

সন্ধ্যের সময় বাড়ীর কাছে এসে দেখলেন সামনের খোলা জায়গাটায় কে নমাজ পড়েছে, আলো, আঁধারিতে চিনতে পারলেন না। ঘরে ঢুকে দেখলেন তাঁর বাবা একটা চেয়ারে বসে বই পড়ছেন। নিজের অপরাধ বোধটা যেন নতুন করে সজাগ হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলেন, "চিঁড়ে কি সঙ্গে এনেছিলেন"?

"এনেছিলাম কিন্তু চিঁড়ে খাই নি।"

"তার মানে সারাদিন খাওয়া হল না। হবেই বা কি করে? এখানে কোন ব্যবস্থাই নেই, সেইজন্যে আপনাকে আসতে বারণ করেছিলাম।"

"তোমার ধারণাটা আগাগোড়াই ভুল। ভাত খেয়েছি।" নিখিলবাবু ভাল করেই জানতেন তাঁর বাবা হোটেলের ভাত তো খাবেন না বটেই এমন কি বাইরের রান্নাও না।

"অবাক হচ্ছ তো? একটা উনুন পর্যন্ত ছিল না অথচ ভাত খেলাম কি করে? তোমাদের এখানে বাজার তো কাছেই আর সবই পাওয়া যায়। প্রথমে অবশ্য সকালটা চিঁড়ের ব্যবস্থা করব ভেবেছিলাম কিন্তু তোমাদের দুখু মিয়া তা করতে দিলেন না।"

দুখু মিয়া? নিখিলবাবু আর একবার অবাক হলেন। দুখু মিয়া এল কোথা থেকে? তাঁর বাবা প্রাচীনপন্থী কিন্তু কারো মনে কষ্ট দিতে পারেন না। দুখু কোন আয়োজন করলে তিনি বাধা দেবেন না, ওকে জানতেও দেবেন না, ওর ছোঁয়া কোন কিছু খেতে আপত্তি আছে অথচ খাবেনও না।

তাঁর বাবা বললেন, "তুমি চলে যাবার কিছু পরে উনি এলেন।"

নিজের পরিচয় দিয়ে উনি বললেন, "বাপের জন্যে ছেলে বনে যাওয়ার কথা রামায়ণে আছে কিন্তু ছেলের জন্যে বাপের বনবাসের কথা তো কোথাও নেই। আপনার ভয়ানক কষ্ট হবে?" আপনার ছেলে তো বাইরে খান। আপনার ব্যবস্থা কি হবে?" বললাম, "ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। বাজার নিশ্চয় একটা আছে, জিনিষ পত্র কিনে নিলেই হবে।" উনি বললেন, "তাহলে আর বেলা বাড়াবেন না, চলুন, বাজারে যাওয়া যাক। আমি আনলে তো চলবে না তা না হলে আর আপনাকে কষ্ট দিয়ে বাজারে টেনে নিয়ে যেতাম না।' ভদ্রলোক সারাদিনই প্রায় এখানে রয়েছেন, শুধু একবার খেতে গিয়েছিলেন।"

তাহলে সামনের খোলা জায়গায় যে লোকটীকে নমাজ পড়তে দেখা গিয়েছিল যে দুখু মিয়া। কিন্তু লোকটী কেন এত করছে? নিখিলবাবুকে খুসী করতে? তার তো কোন দরকার নেই, সে নিশ্চয় জানে তাঁকে আগের নিয়মই চালু রাখতে হবে। তবে কেন সে তাঁকে খুসী করতে চাইবে?

একটু পরেই নমাজ শেষ করে দুখু এল। ঘরের বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কখন ফিরলেন?"

তাঁদের জন্য এত কষ্ট করার কথা তুলতে দুখু বললে, "ঠিক এই অবস্থায় আমি পড়লে আপনারা যেটুকু করতেন তার চেয়ে বেশী করেছি কি?" এর পর আর কি বলা যায়। তাঁর বাবা একটা চেয়ার বাইরে নিয়ে আসছেন দেখে নিখিলবাবু সেটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে বারান্দায় রাখলেন। তাঁর বাবা দুখুকে বসতে বললেন। দুখু অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললে, "না না, এই তো বেশ আছি।"

নিখিলবাবুর বাবা বললেন, "আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে আমায়ও দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।" নিখিলবাবুর পিঠে যেন চাবুক পড়ল, এ পর্যন্ত তিনি কোনদিন দুখুকে বসতে বলেন নি। এরপর থেকে রোজই নমাজের পর দুখু মিয়া এসে তাঁর বাবার সঙ্গে গল্প করে। একদিন নিখিলবাবু তাঁর বাবার হাতে কিছু নথিপত্র দেখতে পেলেন। তাঁদের সম্পত্তির বালাই ছিল না কাজেই তাঁর বাবার হাতে ঐ শ্রেণীর কাগজ দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন। তাঁর বাবা বললেন, "ভদ্রলোক কিছুতেই ছাড়লেন না। ওঁর একটা মামলায় হার হয়েছে তারই কাগজ পত্র। ওঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম তুমি এ সবের মধ্যে আর থাকতে চাও না কিন্তু ভদ্রলোক বার বার অনুরোধ করলেন যাতে তুমি একবার দেখ। ওঁর হারবার মামলা নয় কিন্তু কেন হার হল?"

₹ 36,154

নিখিলবাবু ওকালতি ছাড়ায় তাঁর বাবার একটা বড় রকম দুঃখের কারণ। নিশ্চয় সে সম্বন্ধে দুখুর সঙ্গে কোন দিন কোন কথা হয়েছে আর দুখু ধরে নিয়েছে ও বিষয়ে ওঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে। যাঁরা ওকালতি করছেন তাঁরা যখন ওর মামলায় কিছু করতে পারেন নি তখন ওকালতি ছেড়ে পালিয়ে আসা একজন লোক কি করবে? তবু ঐ জগতটার প্রতি একটা দুর্ব্বলতা তখনও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কাগজ-পত্র পড়ে তাঁর মনে হল দুখুর উকিল তাঁর সাধ্য মত করেন নি কিংবা সমস্ত বিষয়টা ভাল করে ভেবে দেখেন নি। যতটুকু মনে পড়ে যে পয়েন্টে হার হয়েছে সে পয়েন্টে দুখুর সপক্ষে নজীর আছে কিন্তু হাতের কাছে বই-পত্র নেই যে সে নজীর খুঁজে বার করেন।

পরদিন অফিসে দুখু অন্যদিনের মত সেলাম করতে নিখিলবাবু তাকে বসতে বলে বললেন, "দেখুন আমার আইন-জ্ঞান খুবই কম। বই-পত্রও কিছু নেই যা দেখে-শুনে কোন মতামত দিতে পারি।" দুখু বললে, "স্যার, বড্ড জেদের মামলা। আইন জানি না, তবে কাগজ-পত্র সব পরিষ্কার তাই ভেবেছিলাম এ মামলায় আমার হার হবে না।"

"আপনি আপিল করুন। যতদূর মনে পড়ছে, যে পয়েণ্টে আপনার হার হয়েছে সে পয়েণ্টে আপনার সপক্ষে নজীর আছে। একজন ভাল উকিল দিন, তিনি সে নজীর দাখিল করে আপিল জিততে পারবেন বলে মনে হয়।"

সেদিন সন্ধ্যের পর দুখু মিয়া এল না। নিখিলবাবুর বাবা জিজ্ঞেস করলেন ওর অসুখ-বিসুখ করেছে কি না। নিখিলবাবু বললেন, "বোধহয় মামলার ব্যাপারে উকিল-বাড়ী আটকে পড়েছে।"

পরদিন সকালে দুখু অফিসে এসে যথারীতি সেলাম করল কিন্তু অন্যদিনের মত চলে গেল না। কাজেই নিখিলবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হল "কিছু বলবেন?" "যদি কিছু মনে না করেন স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

"কি কথা?"

"আপনি ওকালতি ছাড়লেন কেন?"

এ প্রশ্নের জন্যে তিনি তৈরী ছিলেন না। কিছুদিন আগে দুখু এ প্রশ্ন করলে খুব বিরক্ত হতেন কিন্তু ওর যেটুকু পরিচয় পেয়েছেন তাতে আজ আর ওর ওপর বিরক্ত হতে পারলেন না; বললেন "কেন জানতে চাইছেন?"

"কাল আমার কেসটার কাগজ-পত্র নিয়ে রায় বাহাদুরের কাছে গিয়েছিলাম মানে এখানকার গভর্ণমেণ্ট প্লিডার। আপিল করার অনুরোধ করে ওঁকে কাগজপত্র দিয়ে বললাম আমার সপক্ষে কি নাকি নজীর আছে। উনি সমস্ত কাগজ-পত্র পড়ে অনেকগুলো বই দেখলেন তারপর বললেন, তোমার যে উকিল এই নজীরের কথা বলেছে তাকে আপিলে আমার সঙ্গে থাকতে বোলো। আমি বললাম তা হয় না কারণ তিনি চাকরি করেন। রায় বাহাদুর বললেন চাকরি করে কি রাজ্য পাট হবে তার।" রায় বাহাদুরের মত লোক একথা বললেন তাই জানতে চাইছি।"

"দেখুন আমাদের দেশে ওকালতিতে পসার করতে হলে দরকার একজন নামজাদা উকিল আত্মীয়। যার তা নেই তার যদি এলেম থাকে তাহলে অনেক দুঃখ কষ্টের সঙ্গে লড়াই করে অনেকদিন লেগে থাকতে পারলে হয়তো দাঁড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু তার জন্য রসদ চাই, সংসার তো অতদিন অপেক্ষা করে থাকবে না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দুখু জিজ্ঞেস করলে, "কতদিন লেগে থাকতে হয় আর কত টাকা লাগে?"

নিখিলবাবু এবার একটু বিরক্ত হলেন কারণ তাঁর মনে হল দুখু মিয়া অব্যাপারেষু ব্যাপারং করছে। বিরক্তিটা যথা সম্ভব চেপে রাখবার চেষ্টা করে বললেন "ঠিক কিছু বলা যায় না; পয়সা হওয়াটা বরাতের ব্যাপার, তবে এলেম থাকলে পাঁচ সাত বছরের নিষ্ঠায় দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত আর তার জন্যে অন্ততঃ হাজার দশেক টাকাও দরকার।" একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দুখু চলে গেল।

* * * *

এর কিছুদিন পরে যুদ্ধের হিড়িকে চাকরির বাজারে কিছুটা সুরাহা হল অর্থাৎ চেষ্টা করলে যুদ্ধ মেয়াদি বেশী মাইনের চাকরি জুটতে লাগল। যুদ্ধের বাজারের অগ্নি-মূল্য তাঁর ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল লোক কটীকে কোন রকমে টিকিয়ে রাখতে যে টাকার দরকার নিখিলবাবুর চাকরির মাইনেতে তা অসম্ভব হয়ে উঠল। তাই তাঁকে সে চাকরি ছেড়ে অস্থায়ী জেনেও অন্য চাকরি নিতে হল। সেই সঙ্গে দুখুর সঙ্গে সম্পর্কের যবনিকা পড়ল।

প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে তার কথা মনে হত না তা নয়। তার মার কাছে নবদ্বীপে একদিন যে কথা দিয়ে এসেছিলেন তাও হঠাৎ এক এক সময় মনে পড়ত কিন্তু এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে ভেসে বেড়ানো জীবনযুদ্ধের এক হেরে যাওয়া সৈনিকের মন থেকে সব একদিন নিঃশেষে মুছে গেল।

* * * * *

চাকরি জীবন শেষ হতে সংসারের কাছে নিখিলবাবুর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। অখণ্ড অবসর, করবার কিছু নেই

তাই মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েন। বেশী দূর যাওয়া হয়ে উঠে না; কাছাকাছি জায়গায় যান সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসেন। এই রকম একদিন বেরিয়েছিলেন। বাসে একদল ছিলেন। বাসটা স্টেশনে এসে থামতে তাঁরা নামলেন, তিনিও নামলেন। অনেকদিন আগে এমন আর এক দলের সঙ্গে মায়াপুর-নবদ্বীপ যাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। তারপর আর যাওয়া হয়নি। আজ ওঁদের সঙ্গে গেলেই বা ক্ষতি কি? তাঁর তো দিনটা কাটান নিয়ে কথা।

প্রথমবার বাবাজীরা যেমন কাছে টেনেছিলেন এঁরা তা করলেন না, তিনিও এগিয়ে গিয়ে এঁদের সঙ্গে মিশে যেতে পারলেন না কাজেই দলে থেকেও দলের বাইরে রয়ে গেলেন। মায়াপুরে যে বাবাজী তাঁকে না খাইয়ে ছাড়েন নি তাঁর দেখা পেলেন না, তার নাম জানতেন না তাই খোঁজ করতেও পারলেন না। আগের বারে এখানে আসার কথা কেবল মনে পড়ছিল আর মনে হচ্ছিল সেবার কত পেয়েছিলেন। এবারের শূন্যতা কি নিজের অন্তরের রিক্ততারই প্রতিচ্ছবি? মায়াপুর থেকে নবদ্বীপ গেলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে আগের বার যেখানে দুখুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেখানে পৌঁছতে সেদিনের কথা মনে হল—তার মাকে কথা দিয়েছিলেন একদিন এসে খেয়ে যাবেন কিন্তু সে কথা তিনি রাখেন নি। তারা এখন কোথায় কে জানে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, দেশ ভাগ হয়েছে, দাঙ্গ হয়েছে, দুর্ভিক্ষ হয়েছে, যুদ্ধ হয়েছে। নিজের অজ্ঞাতেই তিনি সেই বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রায় পোড়ো বাড়ীর অবস্থা হয়েছে। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন খেয়াল ছিল না। একজন জোয়ান বয়সী লোক সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই কর্ত্তা?"

অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "না, মানে অনেকদিন আগে আমার একজন চেনা লোক এখানে থাকতেন; তখন আমি একবার এ বাড়ীতে এসেছিলম। আচ্ছা এ বাড়ীটা এখন কাদের?"

"বাড়ী যেনাদের ছেল বাবু তেনাদেরই আছে কিন্তু তেনারা তো নেই! দেশ ছেড়ে পাইলেছে। থাকার মধ্যে এক বুড়ি আছে এই শ্মশানপুরী পাহারা দিতি।" নিখিলবাবু বললেন "যিনি আছেন তিনি কি দুখু মিয়ার কেউ হন?"

"আপনি মিয়ারে চিনতেন কর্ত্তা? বুড়ি তো তেনার আম্মাগো।"

দুখুর মা তাহলে এখনও বেঁচে আছেন? কত বয়স হবে? তা অনেক নিশ্চয়, দুখু বোধহয় তার চেয়ে বড় ছিল, তার মা চোখে দেখতে পান কি? আর পেলেই বা এতদিন পরে তাঁকে চিনবেন কি করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন একবার দেখা করবেন কি-না। সেই সময় কানে এল, "বাইরে কি করছিস র‍্যা ইদ্রিস? তোকে না বাতি দিতি কইলাম।" সেখান থেকেই ইদ্রিস বললে, "দিতেছি গো দিতেছি। একজন ভদ্দরলোক মিয়ার খোঁজ করতেছিল।"

"কার খোঁজ করতিছিল? আমার দুখুর?" বলতে বলতে এক বৃদ্ধা খুট খুট করে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এলেন। দুখুর মাকে নিখিলবাবু প্রায় তিরিশ বছর আগে অল্পক্ষণের জন্যে দেখেছিলেন। এতদিন পরে চেনা সম্ভব নয়; তবু চেনার উপায় নেই বলে যেন আফশোষ হচ্ছিল। বৃদ্ধা কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন "কে বাবা তুমি, য়্যাদ্দিন পরে আমার দুখুর খোঁজ করতিছ? সে তো কতদিন চলে গেছে।" "চলে গেছে" কথাটার অর্থ নিখিলবাবু বুঝতে পারলেন না, ভাবলেন আরও অনেক মুসলমানের মত দেশ ভাগ হবার পর পাকিস্তানে চলে গিয়েছে, তাই বললেন, "আপনাকে এই বয়সে একলা ফেলে।....."

"যখন দেশ ছেড়ে যায় অনেকে বলেছিল বাবা, আমি যাই নি। এ আমার শ্বশুরের ভিটে। আমার স্বামী-শ্বশুর সবাই এখানে মাটী নিয়েছে। এ জায়গা ছেড়ে পরদেশে গিয়ে মাটী নিতে মন চাইল না। আমি তাকে যেতে অনেক করে মানা করেছিলাম কিন্তু তার কপালের নেখন বাবা সে শুনল না। বিদেশ-বিভুঁই, কোথায় গিয়ে পরানটা দিলে চোখের দেখাটাও দেখতে পেলাম না কিন্তু তুমি কে বাবা তা তো বললে না?"

"এখন আর কি পরিচয় দোব? এক সময় আপনার ছেলের সঙ্গে জানাশোনা ছিল, বহুদিন আগে একবার এ

বাড়ীতে এসেছিলাম।"

"ওরে ইদ্রিস, একবার বাতিটা শিগগির নিয়ে আয়। আমার যেন কেমন সন্দ হচ্ছে....."

সন্দেহ হচ্ছে? নিখিলবাবুর পক্ষে একটু ভয় পাবারই কথা। এই সন্ধ্যেবেলা, একজন হিন্দু, একজন মুসলমানের বাড়ীতে, তাও কি না এমন একজনের খোঁজ করছে যে বহুদিন আগে মাটীর নিচে আশ্রয় নিয়েছে, সন্দেহের অবকাশ আছে বৈকি। ইচ্ছে করলেই এরা একটা গোলমাল পাকাতে পারে অথচ করবেই বা কি? এই বয়সে তো আর দৌড়োতে পারবে না আর তা পারলেই কি রক্ষে পাবে ততক্ষণে আলো এসে গেছে; বৃদ্ধা হ্যারিকেনটা তাঁর মুখের কাছে তুলে ধরে দেখতে লাগলেন। কৈফিয়ৎ দেবার উদ্দেশ্যে নিখিলবাবু বললেন, "প্রায় তিরিশ বছর হতে চলল, একদিন এই রকম সময় দুখু মিয়ার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতে ধরে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা শীতকাল, তাহলেও আপনি আমায় একটা পাকা আম দিয়েছিলেন।"

"বললাম না আমার সন্দ হচ্ছে। তা বাবা এতদিন পরে কি কথা রাখতে এলে? আমি বলতাম কথার কথা বলেছে, একদিন আমার কাছে খেয়ে যাবে, সে আর এসেছে। আমার দুখু বলত ও কথা বোল না আম্মা, কথা দিয়ে কথা না রাখবার লোক তিনি নয়। তার কথায় আমার আশা হত। তারপর দিন গেল, মাস গেল, বছরের পর বছর গেল। আশা আর কি করে করি? কিন্তু না করেই বা কি করি, সে আমায় যে ভার দিয়ে গেছে তা নামাতে পারিনি বলেই বোধহয় এতদিন তার কাছে যেতে পারিনি। আ আমার মরণ। তোমাকে পথে দাঁড় করিয়ে বকর বকর করতিছি। এস বাবা ভেতরে এস।" নিখিলবাবু অকূল পাথারে পড়লেন। দুখু তার মাকে এমন কি ভার দিয়ে যেতে পারে যার সঙ্গে তিনি জড়িত? বৃদ্ধার সঙ্গে তাঁর ঘরে যেতে হল। তিনি তাঁকে বসিয়ে ট্রাঙ্ক খুলে একটা কাপড় জড়ানো বাণ্ডিল বার করলেন। অনেক ফেরতা কাপড় খুলে ফেলার পর বেরুল একটা প্যাকেট আর একটা খাম। সেই দুটো তাঁর হাতে দিয়ে বৃদ্ধা বললেন "দেখতো বাবা চিঠিখানা তোমার নামেই না?" হ্যাঁ চিঠিটা তাঁরই নামে খুলতে হাত কাঁপছিল। যে আজ বহুদিন পরপারে, দেশ ছেড়ে যাবার আগে না জানি সে তাঁকে কি জানাতে চেয়েছিল কিন্তু সে কি খোঁজ করলে তাঁর ঠিকানা পেত না? তবে কেন তাঁর সঙ্গে দেখা না করে বা চিঠিটা তাঁকে না দিয়ে তার মার জিম্মায় দিয়ে গিয়েছিলেন? দ্বিধা কাটিয়ে খামটা খুলে ফেললেন। চিঠিটা এই:—

"স্যার,

হঠাৎ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি, যেতে বাধ্য হচ্ছি বলাই ঠিক হবে আপনার সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তার উপায় নেই। প্রথমতঃ আমার হাতে সময় অত্যন্ত কম দ্বিতীয়তঃ আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে এ কথা এখন জানাজানি হলে আপনার ক্ষতি হতে পারে।

মা আমার সঙ্গে যেতে রাজী হলেন না বোধহয় জন্মভূমি মাকে ছেড়ে যাচ্ছি তাই আমার এ শাস্তি। আপনি আমার মাকে বলেছিলেন একদিন তার কাছে খাবেন। আমি জানি আপনি আপনার কথা রাখবেনই তাই মার ওপর ভার দিয়ে গেলাম।

আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর নসীব আমার পাল্টে গিয়েছিল, অনেক টাকা করেছিলাম। অবশ্য খোদাতালার সামনে গিয়ে বলতে পারব না তার সবটাই সৎপথে এসেছে। কিন্তু তাঁরই নাম নিয়ে বলছি অনেক দিন পর্য্যন্ত সৎপথে থেকেই রোজগার করেছি।

আপনি একদিন বলেছিলেন দশ হাজার টাকার অভাবে আপনি ওকালতি করতে পারেন নি। সেদিন মনে বড় লেগেছিল কিন্তু সেদিন আমার সঙ্গতি ছিল না। আজ দেশ ছেড়ে যাবার আগে এই সামান্য ক'টা টাকা আপনার জন্যে মার কাছে রেখে গেলাম। মা জানেন না ওতে কি আছে, তার ধারণা দরকারি কাগজ-পত্র। খোদাতালা ছাড়া এ কথা আর কেউ কোনদিন জানবে না। আপনি যখন ওকালতি করে অনেক পয়সা করবেন তখন যে কোন সৎকাজে ঐ দশ হাজার টাকা খরচ করবেন; তাতেই আপনার ঋণ শোধ হবে।

আপনাকে বন্ধু বলে দাবী করবার যোগ্যতা আমার

নেই কিন্তু শ্রদ্ধা করবার অধিকার তো আছে। সেই অধিকারেই এতটা সাহস করলাম।

জানি না আর কখনও দেখা হবে কিনা তবে যেখানেই থাকি খোদাতালার কাছে আপনার জন্যে প্রার্থনা করব।

দুখুমিয়া।

চিঠিটার শেষটা পড়তে নিখিলবাবুর কষ্ট হচ্ছিল চেষ্টা করেও চোখটা ঝাপসা হওয়া বন্ধ করতে পারছিলেন না। দুর্দিন তাঁর জীবনে অনেক গিয়েছে। অর্থ সাহায্য দূরে থাক একটু সহানুভূতি কারও কাছে পান নি, না তার আত্মীয়দের কাছে, না তাঁর উচ্চশিক্ষিত বন্ধুদের কাছে। আর এই একটা সল্প পরিচিত লোক যাকে অর্দ্ধশিক্ষিত ভাবতেও দ্বিধা হত, যাকে কোনদিন কিছুমাত্র সম্মান দেখান দরকার মনে করেন নি সে কিনা হঠাৎ বলে ফেলা একটা কথা এমন দরদ দিয়ে শুনেছিল যে দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময়কার অসংখ্য সমস্যার মধ্যে সে কথা সে ভোলে নি আর এতগুলো টাকার মায়া অনায়াসে কাটাতে পারল।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন "চিঠিতে কি লিখেছে বাবা?"

অনেক চেষ্টা করে নিখিলবাবু চিঠিটা তাঁকে পড়ে শোনালেন। চোখ মুছে বৃদ্ধা বললেন, "তাহলে বাবা এবার আমায় দায়মুক্ত কর।"

নিখিলবাবু বললেন, "সে যে আর হয় না মা, অতীত জীবনটা ফিরে পাওয়ার উপায় থাকলে বন্ধুর দান মাথা পেতে নিতাম। আজ শুধু তাঁকে সেলাম জানাতে পারি। কিন্তু আমার এ সেলাম কি তাঁর কাছে পৌঁছুবে?"

টগর, দিব্যেন্দু, মিনতি ও আরো অনেকে

গৌরমোহন দাস দে

টগর যখন এখানে প্রথম এসেছিল তখন সে ওর সঙ্গে দুখানা গেরুয়া রং-এর শাড়ী আর দুটো সায়া শুধু সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। মল্লিক সাহেব সে কথা জানতেন। তাই বাড়ী ফেরার সময় নিজে দোকানে গিয়ে দুটো শাড়ী, দুটো ব্লাউজ, দুটো সায়া আর এক জোড়া চটি জুতো টগরের জন্যে কিনে নিয়ে এলেন। রমাপতিকে ডেকে টগরকে সব পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু টগর শুধু শাড়ী আর সায়া নিয়ে সব ফেরত দিয়ে দিলে। রমাপতি ওগুলো নিলে না কেন জিজ্ঞাসা করতে সে বললে যে ভেতরের জামা আর চটি-জুতো নাকি মেমসাহেবরা পরে থাকে। সে ঐ সব পরে মেমসাহেব হতে পারবে না। পরলে পরে, লোকে তাকে ছি ছি করবে। আর তাছাড়া তার স্বামী তাকে পরতে দেখলে তাকে আর ঘরে নেবে না। রমাপতি সাহেবকে ফেরত দিয়ে সব কথা খুলে বললে।

মল্লিক সাহেব তাকে আর জোর-জবরদস্তি করতে বারণ করে দিলেন।

রাত্রে রমাপতি টগরকে বললে যে সাহেব বড় বদরাগী। তিনি যা যা করতে বলবেন সেইমত যেন সে করে যায়। বড় সাহেব আর ছোট সাহেব ঠাণ্ডা খাবার কোন দিনই খান না। যখনই তাদের খাবার দেওয়া হবে তখন যেন সে খাবারগুলো খুব গরম করে নিয়ে যায়। টগর মাথা নেড়ে ওকে বললে যে সে ওর কথামতই কাজ করে যাবে। রাত্রে খাবার সময় মল্লিকসাহেব গরম গরম খাবার দেখে টগরের খুব তারিফ করলেন।

এইভাবে টগর ওখানে দুদিন ভালভাবেই কাজ করে গেল। তৃতীয় দিনের রাত্রে মল্লিক সাহেব রমাপতির মাধ্যমে টগরকে আগামীকাল পান্তাভাত খাবেন বলে জানিয়ে দিলেন। মল্লিক সাহেব পাড়াগাঁয়ের ছেলে। ছোট বেলায় মায়ের কাছে টক পান্তাভাত খেয়ে স্কুলে পড়তে যেতেন। এখনও সেই খাওয়ার লোভটা তাঁর আছে। মাঝে মাঝে তিনি খেতেন। দিব্যেন্দু কিন্তু ওসব খেত না। যখন তিনি দেখলেন যে টগর একেবারে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে—তখন পান্তাভাত খাবার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। ভাতের মাড় বাড়ীতে রেখে পান্তাভাতের সঙ্গে মিশিয়ে টক্ পান্তাভাত পাড়াগাঁয়ে তৈরী হয়। কিন্তু এখানে সেটা লেবুর রস দিয়ে টক পান্তাভাত তৈরী করা হয়ে থাকে।

রাত্রে টগর সাহেবের জন্যে ভাতে জল ঢেলে রেখে দিলে।

পরদিন রবিবার। মল্লিক সাহেব রমাপতিকে বাজার থেকে চিংড়ীমাছ আনতে বললেন। চিংড়ীমাছ ভাজা আর টক্ পান্তা মধ্যাহ্ন ভোজন করবেন বলে তিনি স্থির করলেন। রমাপতিও পান্তা খেতে খুব ভালবাসে। সে টগরকে কি ভাবে পান্তাভাতের সঙ্গে পিঁয়াজ লঙ্কা কুচো দিয়ে মেশাতে হয় তার একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দেয়। টগর ওর সব কথাই শুনে যায়। এ'কদিন সে ওদের বাড়ীতে রয়েছে, যত না সে ভয় করে সাহেবদের, রমাপতিকে ওর খুব ভয় লাগে। কেবলই রমাপতি ওর ওপর তম্বি করতে থাকে। সে যদিও ওর কাজ দেখে খুব খুশী, তবুও ঝি-চাকরদের যে চোখ পাকিয়ে সব সময় শাসনে রাখতে হয় সেটা ও অনেকের কাছ থেকেই শুনেছে। তাই টগরকে সে সব সময়ে শাসনে রাখতে চায়।

দুই সাহেব স্নান করে এসে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় টেবিলে এসে বসেন। মল্লিক সাহেব টেবিলে বসে হঠাৎ তাঁর বিধবা মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁরা খুব গরীব ছিলেন। তাই অনেক কষ্টে তাঁকে মানুষ হতে হয়েছিল। দুবেলা ঠিক পেট ভরে তাঁরা খেতে পেতেন না। রাতের

ভাত সকালে ছেলেকে খাইয়ে তিনি তাকে স্কুলে পাঠাতেন। সরকারী সব সময় তাঁর কপালে জুটতো না। তাই মল্লিক সাহেবকে ছোটবেলায় প্রায় রোজই পান্তাভাত খেয়ে স্কুলে যেতে হতো। তাই এখন তিনি তাঁর বাড়ীতে কেউ ভিখিরী এলে তাকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। কেউ খেতে চাইলে তাকে তিনি কখনও ফেরাতেন না।

ছোট সাহেবের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এলো। কিন্তু তাঁর পাতে তখনও কিছু পড়লো না দেখে মল্লিক সাহেব টগরকে ডাক দিলেন। রমাপতি ওখানে ছিল না। দোকানে একটা জিনিষ কিনতে গিয়েছে। যাবার আগে সে পেঁয়াজ লঙ্কা কুচিয়ে পান্তাভাতের সঙ্গে মিশিয়ে চলে গেছে। চিংড়ী মাছ যে ভাজা হয়ে গেছে তার গন্ধ মল্লিক সাহেব পেয়েছেন। কিন্তু টগরকে ডাকা সত্ত্বেও এখনও তার দেরী করার কারণ তিনি খুঁজে পান না। তাই তিনি টেবিল থেকে উঠে রান্নাঘরে ঢুকলেন। রান্নাঘরে ঢুকে টগরের পান্তাভাত তৈরী করা দেখে তাঁর চোখ কপালে উঠে যায়। পান্তাভাত উনুনে টগবগ করে ফুটছে। তিনি পান্তাভাতের অবস্থা দেখে হো হো করে হেসে ওঠেন। বাবার হাসি শুনে দিবেন্দু ছুটে এসে রান্নাঘরে ঢুকে সব দেখেশুনে সেও হাসতে সুরু করে দেয়। টগর কিছু বুঝতে না পেরে খুব অবাক হয়ে যায়। মল্লিক সাহেব ওর বিস্মিত ডাগর চোখ দুটো দেখে হাসতে হাসতে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কখনও পান্তাভাত খাওনি?"

টগর বললে, "খাই তো।"

"পান্তাভাত ফুটিয়ে খায় না ঠাণ্ডা অবস্থায় খায়?"

"আমরা তো ঠাণ্ডাই খাই। রমাপতিদা আমায় বলে দিয়েছে যে আপনাদের পাতে সব সময় গরম গরম খাবার না দিলে আমাকে আপনারা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন। আমি তাহলে যাই কোথায়?"

এর মধ্যে রমাপতি এসে গেছে। মল্লিক সাহেব ওকে ধমক দিয়ে বললেন, "তুই আর কোনদিন রান্নাঘরে ঢুকবি না। তুই রান্নার কি বুঝিস যে ওকে রান্না শেখাতে গেছিস? ওর যে ভাবে মন চায় ও সেই ভাবেই রান্না করবে।"

টগরের দিকে চেয়ে বললেন, "টগর, যা হবার হয়েছে। তুমি আমার জন্যে চাট্টি ভাত বসিয়ে দাও। আমি একটু অপেক্ষা করছি। আরা একদিন পান্তাভাত খেলেই হবে এখন।"

সাহেবের খাওয়া হ'ল না দেখে টগর কেঁদে ফেললে। মল্লিক সাহেব ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "তার জন্যে কেঁদ না। মানুষ মাত্রেই ভুল হয়। আমারও ভুল হয়। একটা সামান্য ভুলের জন্যে কি কাঁদতে আছে?"

এইভাবে আরো দিন চারেক কেটে গেল। রমাপতি আর রান্নাঘরে ঢোকে না বা রান্নার সম্বন্ধে কোন উপদেশও দেয় না। টগরও নিজের মনে রেঁধে সাহেবদের খেতে দেয়। মল্লিক সাহেব ওর মন বোঝেন। ও যে তাঁকে এখনও খুব ভয় করে চলে সে কথাটা তিনি ভাল ভাবেই বুঝতে পারেন।

মল্লিক সাহেব টগরের ভয় ভাঙাবার জন্যে তাকে মাঝে মাঝে কাছে ডেকে এনে কথা বলেন। তার বাবা-মার কথা, তার ছোটবেলার কথা এক এক করে তিনি টগরকে জিজ্ঞাসা করেন। কথার মধ্যে মধ্যে তিনি এক একটা এমন অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতে সুরু করে দেন যে টগর তা শুনে হেসে ফেলে। সাহেবের সঙ্গে বাগানে ঘুরে ঘুরে টগর মাঝে মাঝে তাঁকে সাহায্য করে। এই ভাবে ধীরে ধীরে মল্লিক সাহেবের কাছে তার ভয় ভেঙ্গে যায়। সে আর ওর সামনে একহাত ঘোমটা দেয় না। কিন্তু ছোট সাহেবের কাছে সে একহাত ঘোমটা না দিয়ে বার হয় না। ছোটসাহেব দু-চারটে প্রশ্ন করলেও সে ঐ ঘোমটার মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে উত্তর দেয়।

দিবেন্দু একদিন খেতে খেতে ওর রান্নার খুব সুখ্যাতি করে। তবে ওর এই ঘোমটা দেওয়াটা সে কোন মতেই সহ্য করতে পারে না। সে রমাপতিকে আড়ালে ডেকে বলে দিলে টগরের এই গেঁয়ো স্বভাবটা ছাড়িয়ে দিতে। রমাপতি কিন্তু আজকাল টগরকে খুব ভয় করে। সে সাহস করে তাকে কিছু বলতে পারে না। টগর যে খুব স্পষ্টবক্তা আর খুব মুখরা মেয়ে তা সে একদিনেই টের পেয়ে গেছে। একদিন ও তাকে ঘোমটা খুলে ছোটসাহেবের টেবিলে খাবার

দিয়ে আসতে বলেছিল। তাতে টগর তাকে রুক্ষস্বরেই বলেছিল যে মেয়েরা কি করে আর কি না করে তা দেখবার জন্যে পুরুষদের এত মাথা ব্যথা কেন? ঐটুকু পুচকে মেয়ের কথা শুনে সেদিন ওর মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল। দিব্যেন্দুকে গিয়ে সে সেকথা শুনিয়ে এসেছিল। দিব্যেন্দু এর পর টগরকে আর ঘাঁটায় নি।

দেখতে দেখতে পনের-ষোলদিন কেটে গেল। সেদিন টগর ঘরের মধ্যে কাজ করছিল আর মল্লিক সাহেব ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে বাগানের গোলাপ গাছগুলোর তদারক করছিলেন। রমাপতি বাজার যাবার জন্যে বাজারের থলি খুঁজছিল। এমন সময় হঠাৎ বাইরে থেকে একটা সঙ্গীতের রেশ ওর কানে ভেসে এ'ল, "চুল না ভিজাবি সিনান করিবি ভাবিনি ভাবের দেহা।" টগর গানটা শুনেই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দেয়। ধীরে ধীরে গান করতে করতে মরণদাস এসে ঢোকে। মল্লিক সাহেবকে দেখেই সে গান বন্ধ করে দেয়। মল্লিক সাহেবের কানে গানের রেশটা এসে তাঁর মনটাকে উতলা করে দিলে। হঠাৎ তিনি দরজার দিকে তাকাতেই মরণদাস আর টগরকে দেখতে পেলেন। তিনি হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললেন, "এসো এসো কীর্ত্তনীয়া, তোমায় তো দশদিন পরে আসতে বলেছিলাম। এত দেরী করলে কেন?"

মরণদাস হাসতে হাসতে বললে, "আপনার দেওয়া টাকার কিছুটা এখনও আছে সাহেব। তাই আমার দেরী হয়ে গেল।"

মল্লিক সাহেব অবাক হয়ে বললেন, "বুঝতে পারলাম না তো। আমার দেওয়ার টাকার সঙ্গে এর অর্থ কি।"

মরণদাস বললো, "সাহেব, মানুষের পেটে যতটুকু ধরে শুধু ততটুকুই নেবার সে অধিকারী। তার চেয়ে বেশী যে গ্রহণ করে সে চৌর্য্য অপরাধে অপরাধী হয়। তদনুরূপ তার শাস্তি হওয়া উচিত। কথাগুলো কিন্তু আমার নয়, মহাভারতে নারদ যুধিষ্ঠিরকে একথা একদিন বলেছিলেন।"

মল্লিক সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, "এটা আমি জানতাম না। তবে গীতার এক জায়গায় লেখা আছে "পরিশ্রম না করে যে খায় সে চুরি করছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে নেয় অর্থাৎ পরিগ্রহ করে নিঃস্বার্থে সে অপর কাউকে বঞ্চিত করছে।" যাক, শোন তোমার চাকরী একটা হয়েছে। কিন্তু এখানে নয় বাঁকুড়া জেলায় বি. ডি. ও সাহেবের অফিসে।"

মরণদাস হাসতে হাসতে বললে, "ভিখিরীদের পছন্দ অপছন্দ নেই। যে যা পায় তাতেই তার সুখী হওয়া উচিত। আমি যাব সাহেব।"

"বেশ আজই তোমায় আমি সঙ্গে করে অফিসে নিয়ে যাব। সেখান থেকেই আমার লোক দিয়ে বাঁকুড়া বি. ডি. ও অফিসে পাঠিয়ে দেব। আজ এখানে তুমি খেয়ে যাবে মরণদাস।"

"ঠিক আছে সাহেব। আমি এখানেই খেয়ে নেব।"

"টগর, মরণদাসকে আজ কিন্তু ভালকরে খাইয়ে দেবে।"

টগর হাসি মুখে মরণদাসকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যায়।

দিব্যেন্দু টগরকে এই ঘোমটা খোলা অবস্থায় হাসতে প্রথম দেখতে পেলে।

মল্লিক সাহেব ও দিব্যেন্দু টগরের রান্নাবান্না ও অন্যান্য কাজকর্মে খুবই সন্তুষ্ট। দিব্যেন্দুর বন্ধুবান্ধব ও তাঁদের স্ত্রীরা এসে ওর হাতের রান্না খেয়ে খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। টগর যেন এখন তাঁদের কাছে একটা ঈর্ষার বস্তু হবে দাঁড়িয়েছে। বাড়ী-ঘরদোর এমন ভাবে সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রেখে দেয় যে দেখলে মনে হয় এঁদের বাড়ীতে বোধহয় অনেকগুলো ঝি-চাকর কাজ করে। মল্লিক সাহেবের বাগানে নানা রকমের ফুল ফুটে রয়েছে। আগে তিনি নিজেই বাগানটার তদ্বির করতেন। এখন টগরও ওঁর সঙ্গে কাজ সুরু করে দিয়েছে। অনেক সময় সে মল্লিক সাহেবকে ফুল সম্বন্ধে দু'চার কথা মুখ ফুটে বলে ফেলে। মল্লিক সাহেব তখন বুঝতে পারেন যে টগরের ফুল সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান আছে।

বেশ কিছুদিন হল টগর এখানে এসেছে। রমাপতি মল্লিক সাহেবকে সাহেব বলে ডেকে থাকে সেটা টগর

শুনেছে। তাই আজকাল সে মল্লিক সাহেবকে সাহেব বলে ডাকতে সুরু করে দেয়। মল্লিক সাহেব তাকে সাহেব বলে সম্বোধন করতে বারণ করা সত্ত্বেও সে বারণটা শুনতে চায় না। রমাপতি থেকে সহরের সকলেই তাকে সাহেব বলে ডাকে সে-ই বা তাকে সাহেব বলে ডাকবে না কেন?

বাড়ীতে ফ্রিজ রয়েছে। টগর তার ধারে কাছেও যায় না। ওর নাকি ওটাকে খুব ভয় করে। রমাপতি বেশ কয়েকবার ওকে জোর করে ফ্রিজটা খুলতে আর বন্ধ করতে শিখিয়েছিল কিন্তু সে কিছুতেই ফ্রিজ খুলবে না। তাই রমাপতি ওকে আর জোর করে না। সে নিজেই মাংস মাছ ডিম তরিতরকারী সব ফ্রিজ থেকে বার করে ওর সামনে রেখে দেয়। মাছ মাংস ডিম সকলকে রেঁধে সে খাওয়ায়। কিন্তু নিজে সে ঐ মাছ মাংস ডিম কখনও দাঁতে কাটেনি। রমাপতি ওর না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ও যে পচা মাছ-মাংস খায় না তা তাকে স্পষ্ট করে বলে দেয়। মল্লিক সাহেব রমাপতির কাছে ওর কথাগুলো শুনে আর মাছ-মাংস কিনে এনে ফ্রিজে রাখতে বারণ করে দেন।

রমাপতিকে রোজই মাছ-মাংস কিনতে বাজারে যেতে হয়। সেদিন মুর্গির মাংস আনবার জন্যে দিব্যেন্দু যখন রমাপতিকে বলছিল, টগর রান্নাঘরের মধ্যে বসে বসে সে কথাটা শুনেছিল। রমাপতি থলে নিয়ে বাজারে যাবার উদ্যোগ করতেই সে বলে উঠলো, "সাহেব এ বাড়ীতে ঠাকুর পুজো করেন। ঘরের মধ্যে মুর্গির মাংস ঢোকালে ঠাকুর রাগ করবেন। এ বাড়ীতে যেন ঐ মাংস না ঢোকে তোমায় বলে দিলাম।"

রমাপতি দিব্যেন্দুর মুখের দিকে চায়। মল্লিক সাহেব পাশেই বসেছিলেন, তিনি একটু হেসে বললেন, "রমাপতি, মুর্গির মাংস আজ থাক। তুমি পাঁঠার মাংসই এনো।"

দিব্যেন্দু চুপ করে এতক্ষণ বসেছিল। বাবার কথা শুনে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে "ওটা একটা বন্ধ পাগল।"

রমাপতি ওর এই রকম গিন্নীপনা দেখে মনে মনে বেশ জ্বলে ওঠে। এক একবার তার মনে হয় যে টগরকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই উচিত। এতদিন যে রকম করে সংসার চলছিল সেই রকম করেই সংসার চলুক। কিন্তু মল্লিক সাহেবের জন্যে সে মুখ ফুটে কিছু না বলে বাজার করতে চলে যায়।

মল্লিক সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বা তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে তাঁকে খাওয়াতে টগর এখন মোটেই ভয় পায় না। কিন্তু দিব্যেন্দু সামনে থাকলে সে মল্লিক সাহেবের কাছেও যায় না। খুব দরকার পড়লে একহাত ঘোমটা দিয়ে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ায়। দিব্যেন্দুকে সে সব সময় এড়িয়ে চলে। ওকে দেখলেই টগর যেন কেমন হয়ে যায়। দিব্যেন্দু অফিসে বার হয় সকাল দশটায়। বাড়ী ফেরে কখনও রাত এগারোটায় আবার কখনও বারটাও বেজে যায়। টগরের তখন মাঝরাত। ছেলেমানুষ বলে টগরকে কেউ ডাকাডাকি করে না। রমাপতি জেগে থাকে। সেই ছোট সাহেবের খাবার টেবিলে ধরে আনে। তবে ভোর বেলার গরম চায়ের কাপটা ঘরের টেবিলে ঠিক সময়েই টগর রেখে দিয়ে যায়। এই সময়ে ছোট সাহেব যে ধূমায়িত চায়ে মুখ দিতে ভালবাসে আর সকাল আটটায় সে আবার এক কাপ কফি খায় টগর একথা ভালভাবেই জানে। বিলাতের অভ্যাসটা দিব্যেন্দু এখনও ছাড়তে পারে নি।

যদি কোনদিন দিব্যেন্দু ভোরের চা খাবার সময় ঘুমিয়ে পড়ে টগর চায়ের কাপ আর ডিসে বেশ একটা শব্দ করতে থাকে। ওকে জেগে উঠতে দেখলে টগর পালিয়ে যায়।

দিব্যেন্দু যখন কফি খেতে সুরু করে হাতে তার একখানা বই সব দিনই প্রায় থাকে। টগর তখন বেসিনের ওপর তার সেভিং সেটটা গুছিয়ে রেখে তার স্নানের বন্দোবস্ত করতে থাকে। ব্রেকফাষ্টের সময় বড় সাহেব ও ছোট সাহেবের খাবার আলাদা। সেই ভাবেই সে রান্না করে একটী একটী করে টেবিলের ওপর রেখে চলে যায়। তারপর সে দিব্যেন্দুর ব্রীফ কেসটা বসবার ঘরে যত্ন করে রেখে দিয়ে আসে। দিব্যেন্দু ওখান থেকেই তার ব্রীফ কেসটা নিয়ে রোজ গাড়ীতে গিয়ে ওঠে।

আজকাল সে যে দিব্যেন্দুর অনেক কিছু কাজ বুঝে নিয়েছে তা দিব্যেন্দুর বুঝতে কষ্ট হয় না। সে এই সব কথা বলে তার বাবার কাছে টগরের খুব প্রশংসা করে। কিন্তু দিব্যেন্দু কোন সময়ে টগরের নতুন নাম ধরে হাঁক দিলে টগরকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মল্লিক সাহেব এই সব দেখে হাসতে হাসতে ওকে বলেন, "টগর তোমায় ভয় করে দিব্যেন্দু। ওকে চেঁচিয়ে ডেকোনা। আর নতুন নামটা ছেড়ে দিও। তা না হলে ও কখনও তোমার ডাকে সাড়া দেবে না। আর তাছাড়া তোমাকে ও খুব ভয় করে। একদিন দেখবে তোমার ভয়ে ও হার্টফেল করে হয়ত মারা পড়বে।"

দিব্যেন্দু বাবার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠে বললে, "না, বাবা, ও খুব কাজের লোক আর খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। ও মানুষকে অল্প সময়েই বুঝতে পারে। আমার কি চাই বা না চাই সে সব ধরে ফেলেছে। খুব ক্লেভার মেয়ে। আর এত ভাল রান্না করে যার জন্যে তার প্রশংসা পাওয়া খুবই উচিৎ। এমন সুন্দর রান্না আমি অনেক বছর মুখে তুলিনি। বিলাতের ঝিগুলোর কথা ছেড়েই দাও। দিল্লীর ঝিয়েদের কথা বলছি। সেগুলো সব এক একটা যেন মেমসাহেব। একটু কিছু ভুল ধরলে আর কি রক্ষে আছে? তার পরদিনই কাজে ইস্তফা দিয়ে টাকা পয়সার হিসেব নিয়ে তারা একেবারে সটান চলে যাবে। মাইনে আটকালে আর রক্ষে নেই। ওখানকার ঝিয়েদের সব রটিয়ে দেবে যে বাবু খাটিয়ে পয়সা দেয় না। তারপর আর কোন ঝি-ই কাজ করতে আসবে না।"

ওর কথা শুনে মল্লিক সাহেব বললেন, "দিল্লীর কথা কেন বলছো দিব্যেন্দু, সব জায়গাতেই একই সমস্যা। আমি যখন হাওড়াতে প্রথম কাজ নিই, তোমার মা তখন প্রথম আমার ঘরে এসেছিলেন। একটা ঝিএর তখন খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়লো। পিয়নটাকে বলতে সে কোথা থেকে একটা ঠিকে ঝি জোগাড় করে নিয়ে এলো। ঝিটা কাজ করতে এসে রোজ রোজ একটু করে দুধ চুরী করে খেত। একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। তখন সে বললে, "বাবু আমি রোজ আফিং খাই কিনা তাই যার বাড়ীতে কাজ করতে যাই সেখান থেকে আমাকে একটু দুধ খেতেই হয়। চুরী করে না খেলে চাইলে কি আর বাবুরা আমায় দিতেন?" যাক্ দুধ খেয়েও ও যদি কাজ করে যেত তাহলে আমার আর বলার কিছু ছিল না। কাজ করতে করতে একদিন হঠাৎ সে না বলে-কয়ে মাইনে হাতে নিয়ে একেবারে ডুব দিলে। পিয়নটাকে নিয়ে তার বাড়ী খুঁজে খুঁজে তাকে ধরলাম। সে কি বললে জানো?"

দিব্যেন্দু হাসতে হাসতে বললে, "কি বললে বাবা?"

সে আমাকে বললে, "বাবু আপনি ঝি খুঁজতে এসেছেন? ঝি আর পাওয়া যাবে না। হাওড়া জুট মিলে কাজ পেয়েছি। এখন আমার এই দুটো ছোট ছোট ছেলেকে দেখবার জন্যে আমিই একটা ঝি খুঁজে মরছি। ঝি খুঁজতে সকালে বেরিয়েছিলাম, এই ফিরছি।"

দিব্যেন্দু চোখ কপালে তুলে বললে, "মাই গুডনেস।"

টগর এখানে মাসখানেকের বেশী হলো এসে গেছে। তবুও নিজেকে সে এ বাড়ীর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। দুপুরে সকলেই যে যার কাজে বার হয়ে যায়। কেউ বাড়ীতে থাকে না। সে শুধু বাড়ীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে এটা ওটা কাজ করতে থাকে। টেলিফোনটা হঠাৎই মাঝে মাঝে বেজে ওঠে। তখন ওর বুকের ভেতর ধড়াস্ ধড়াস্ করে ওঠে। তখন সে টেলিফোনের ধারে-কাছেও যেতে ভয় পায়। টেলিফোনটা তখন বেজে বেজে নিজেই ক্লান্ত হয়ে চুপ করে যায়।

ছোট সাহেব কেন এমন নি ওর রমাপতিদা পর্যন্ত একটা বাক্সো থেকে কতরকমের গান-বাজনা বার করে। কখনও পুরুষের গলার গান আবার কখনও মেয়ের গলায় মিহিসুরে গান। তা থেকে আবার কখনও বক্তৃতা বার হয়। ওটাকে ওর রমাপতিদা নাকি রেডিও বলে। টগর অবাক হয়ে যায়। সকলে চলে গেলে সে একদিন ঐ বাকসোর চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখেছিল। কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারে না। ওর রমাপতিদা ওকে বলেছে হাওয়া থেকে নাকি গান-বাজনা সব ভেসে এসে বাক্সের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। তারপর কল টিপলেই জলের কলের মত গান-বাজনা বার হয়ে আসে। সে ভাবে যে সে তো কতবার ঝড়ো হাওয়ার মুখে গিয়ে পড়েছে তবুও তো সে গান কেন একটা বাজনা পর্যন্ত শুনতে পায়নি। ওর রমাপতিদার কথা সে বিশ্বাস করতে

পারে না।

ও একদিন ভেবে ভেবে স্থির করলো যে হাওয়া যাতে ঘরের মধ্যে না ঢোকে তারই একটা ব্যবস্থা সে করবে। একে একে সে সব দোর-জানলা বন্ধ করে দিয়ে বসে রইলো। রমাপতি আসতেই ওকে সে বললে, "এবার কিন্তু ঐ বাকসো থেকে আর কোন গান-বাজনা বার হবে না, দেখবে। আমি কি করেছি তোমায় বলবো না।"

রমাপতি ওর কথায় খুব ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে যে হয়ত রেডিও খুলে টগর এটা ওটা ভেঙ্গে ফেলেছে। সে রেডিওর সুইচ টিপে দিতেই গান-বাজতে সুরু করে দিলে। রমাপতি হেসে বললে, "এবার গান বাজছে তো?"

"তুমি যে বলেছিলে হাওয়ায় গান ভেসে আসে। আমি তো এ ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছি।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। চায়ের জল বসিয়ে দাওগে, বড় সাহেব এখনই আসছেন" বলে সে অন্য ঘরে চলে যায়।

টগর সেদিন সব দেখে শুনে খুব হতাশ হয়ে গিয়েছিল।

এর কয়েকদিন পরেই কমলার মৃত্যুদিন পালন করা হবে বলে টগর জানতে পারে। মৃত্যুর দিন খুব ভোরে উঠে সে স্নান করে বাগান থেকে ফুল জোগাড় করে নিয়ে এসে একটা বেলফুলের মালা গেঁথে রেখে দিলে। তারপর চন্দন ঘসে একটা বাটীতে রাখলে। কমলার ফটো বাইরের ঘরে ঝোলানো ছিল। সাহেব তখন ওখানেই বসে ছিলেন। টগর তার কাছে গিয়ে চন্দনের বাটী আর ফুলের মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। টগরের ইচ্ছাটা জেনে নিয়ে কমলার ফটোটী তিনি ওর হাতে দিয়ে দেন। ফটোটিকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ভাল করে সাজিয়ে টগর মল্লিক সাহেবের হাতে দিলে। তারপর সে গঙ্গাজল নিয়ে এসে বসবার ঘরের একটা জায়গা ভাল করে ধুয়ে-মুছে সেখানে একটা চৌকির ওপর সেই ফটোটিকে রেখে মালাটা পরিয়ে দিয়ে চলে গেল। একটু বেলা হলে ওঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব এসে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে লাগলেন। টগর ঘরের বাইরে বসে বসে চোখ বুজে গান শুনতে লাগলো। গানে সে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ মল্লিক সাহেবের ডাকে ওর তন্ময়তার ভাব কেটে যায়।

"টগর এবার তোমাকে যে একটা মায়ের নাম শোনাতে হবে। ঘরের মধ্যে চলে এসো।"

টগর একহাত ঘোমটা দিয়ে ওঁর পেছনে এসে বসে গান ধরলো।

ছেড়েছি মা ভবের খেলা
পিছু আমায় কেন ডাকিস্?
এর জ্বালা যে বিষম জ্বালা
ফিরে আমায় কেন টানিস্!
ফিরে যেতে চায় না যে মন
ডুবতে চায় না (আর) মোহের ঘোরে
তাই তো আমি সব ছেড়েছি
ডুববো বলে ভাব সাগরে।
মিছে কেন দেখিয়ে মোহ মা
করিস আমায় হয়রাণ,
বুঝতে তো সবই পারিস্ তুই
এবার আসবে আমার ফরমান।
ভবের খেলা শেষ হ'লে মা
আমি বাজিয়ে যাব ডঙ্কা,
কাকেও আমি ছোট করিনি মা
তাই করিনি কাকেও শঙ্কা।
মিছা মিছি কত খেটেছি মা
মোহের ঘোরে এতটা দিন
সময়টা যে মোর নষ্ট হ'ল
দেহটা মোর হ'ল ক্ষীণ।
ভবের খেলা ঘুচিয়ে দিয়ে
তোর কোলে মা তুলে নিস্
পিছন ফিরে ডাকিস্ না আর
স্নেহের ছায়া একটু দিস্।

টগরের গান শুনে সকলেই খুব মুগ্ধ হলেন। মল্লিক সাহেবের চোখে জল। দিবেন্দু ওর মায়ের ফটোর দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিল। তার চোখদুটোও শুষ্ক ছিল না। টগর গানের শেষে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বার হয়ে যায়।

বাড়ীতে সবদিনই টগরকে একা থাকতে হয়। দিনে সে

ঘুমোয় না। দিন-রাত কাজ করে যায়। বিশ্রাম নেবার সময়ই সে পায় না। সেদিন রমাপতির হঠাৎ অসুখ করে গেল।

সেদিন সে আর অফিস যেতে পারলো না। বাধ্য হয়েই সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। বসবার ঘরে টেলিফোন থাকে। টেলিফোন বাজলে টগরই আগে শুনতে পায়। বেশীক্ষণ ধরে বাজলে তবে রমাপতির কানে যায়। সেদিন টেলিফোন বেজেই যাচ্ছিল। টগর তো ভয়ে ধরলো না। রমাপতিকে তার জানানো উচিত ছিল। কিন্তু রমাপতি অসুস্থ বলে টগর তাকে ডাকেনি। অনেকক্ষণ ধরে বাজার পর রমাপতিকে ফোন ধরার জন্যে আসতে হ'ল। টগর তখন ওকে দেখে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। একে অসুস্থ তার ওপর টগরের এই ব্যবহারে রমাপতি খুব রুষ্ট হয়েই ওকে বললে, "বোকা চাষা মেয়ে কোথাকার। এতক্ষণ ধরে ফোনটা বেজেই যাচ্ছে ধরবার নাম পর্যন্ত নেই। আমাকেও তো ডাকতে পারতে। একটা গাধা ঘরে থাকলে সেও তাকে এটা জানিয়ে দিত।"

তারপর সে টেলিফোনটা কানের কাছে তুলে বলতে থাকে "হ্যালো, হ্যালো!"

রমাপতির বকুনিতে টগর চমকে উঠেছিল। কিন্তু রমাপতিকে যখন ঐ যন্ত্রটার সঙ্গে কথা বলতে দেখলো সে হেসে কুটোকুটি হয়ে বলে ফেলে, "আমি বোকা, চাষার মেয়ে? তুমি তো একটা পাগল রমাপতিদা। ঐ কাঠের হাতলটার সঙ্গে কথা বলতে লেগেছো? শুধু তুমি কেন আমি তো দেখছি বাড়ীর সকলেই ঐ হাতলটার সঙ্গে কথা বলে। বাড়ীর সকলেই দেখছি পাগল হয়ে গেছে। কি রমাপতিদা, তাই নয়।"

রমাপতি কথা বলছে না দেখে টগর তার সামনে গিয়ে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে হাত ঘোরাতে থাকে আর তার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভেংচাতে থাকে।

রমাপতি ওর মুখ ভেংচানো দেখে খুব বিরক্ত হ'ল। তারপর সে শান্তভাবে টেলিফোনে কথাবার্ত্তা বলে যায়। টগর তখনও ওকে ভেংচাতে থাকে। রমাপতির কাজ শেষ হয়ে গেলে সে টেলিফোনটা রেখে টগরের দিকে কটমটিয়ে চেয়ে—রাগত কণ্ঠে বলে ওঠে, "ভূত কোথাকার! পাড়াগাঁয়ের একটা পেত্নী। আমি বাড়ীর কর্ত্তা হলে আজই তোমার ঐ ঘাড়টা ধরে বাড়ীর বার করে দিতাম।" বলে সে নিজের ঘরে শুতে চলে যায়।

টগর ওর কথাগুলি শুনে একেবারে ক্ষেপে যায়। সে নিজের মনে গজরাতে থাকে, "আমাকে পাড়াগাঁয়ের ভূত-পেত্নী বলা? দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। চায়ের সময় হলে চা দেব না। ওর সামনে আমি ভাত রেঁধেও ধরে দেব না। বাজারে তো শুনি সব জিনিষ কিনতে পাওয়া যায়। ওকে বাজার থেকেই কিনে খেতে হবে। দেখি ও আমার কি করতে পারে। আমার ঘাড় ধরে বাড়ীর বার করে দেবে? মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি? আমার সঙ্গে যা তা ব্যবহার করবে? এত সাহস ওর হয়েছে?"

সেদিন ছিল শনিবার। মল্লিক সাহেব আর দিব্যেন্দু দুজনেই সকাল সকাল বাড়ী ফিরলেন। টগর চা করে নিয়ে ওদের টেবিলে ধরে দিয়ে আসে। বাপেতে ছেলেতে চা খেতে খেতে গল্পে মশগুল হয়ে পড়েন। এদিকে রমাপতি টগরের কাছে চা চাইতে গেলে টগর অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে বলে ওঠে, "তোমার জন্যে আমি চা করতে পারবো না। তুমি বাইরে থেকে কিনে খাবে।"

"কেন করতে পারবে না? আমি তো এই বাড়ীরই লোক।"

"আমায় পাড়াগাঁয়ের ভূত-পেতনী বলা বার করে দেব। যত বড় মুখ না তত বড় কথা। আজ থেকে তোমার জন্যে আমি রান্নাও করতে পারবো না বলে দিলুম। তুমি রমাপতি না ভূতপতি, শাঁকচুন্নীপতি, পেতনীপতি। যাও আমার সামনে থেকে। আমাকে এখানে এসে আর কখনও জ্বালাবে না বলে দিলুম।"

রমাপতি অসুস্থ তার ওপর কোন কারণে মনটা তার বিগড়েও গিয়েছিল। ওর গালাগাল খেয়ে নিজেকে সংযত করতে না পেরে ওকে দুচারটে ইংরাজী গালাগাল দিয়ে আর বেশ কিছুটা বকুনি দিয়ে সে হন হন করে বাড়ীর বার হয়ে গেল। ওর কাছ থেকে গালাগাল আর বকুনি খেয়ে টগর নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করে আরো রেগে ওঠে।

রমাপতির ইংরাজী গালাগাল সাহেবের কানে গিয়েও পেঁছায়।

প্রতিদিন রাত্রে সাহেবদের খাওয়া হয়ে গেলে রমাপতিকে খাইয়ে তবে টগর খেতে বসে, তারপর তার খাওয়া হয়ে গেলে এঁটো-কাঁটাগুলো ফেলে দিয়ে বাসনগুলো মেজে রেখে সে শুতে চলে যায়। সেদিন সাহেবদের খাওয়া হয়ে গেলে টগর রমাপতিকে খেতে ডাকলো না আর নিজেও খেলো না। এঁটো-কাঁটাগুলো ফেলে বাসনগুলো মেজে রেখে সে নিজের ঘরে গিয়ে জোর করে খিল তুলে দিলে। বাপেতে ছেলেতে দুজনেই টগরের কাণ্ড-কারখানা দেখলেন। রমাপতি টগরকে ঘরে খিল দিতে দেখে বাড়ীর বার হয়ে গেল। তাও ওঁদের দুজনের চোখ এড়ালো না। ওঁরা দুজনেই খুব অবাক হয়ে যান। তবে কি টগরের সঙ্গে রমাপতির কিছু গোপন ঘটনা ঘটে চলেছে? ওরা কি দুজন দুজনকে ভালবেসে ফেলেছে? ওঁরা দুজনেই বেশ একটু ভয় পেয়ে গেলেন। ওদের মধ্যে যদি একটা অঘটন ঘটে যায় তাহলে মরণদাসকে তাঁরা তার কি জবাব দেবেন? আগামীকাল সকালেই ওদের দুজনের কাছ থেকে সব কথা জেনে নিয়ে যা হোক একটা কিছু করা যাবে এই মনে করে ওঁরা দুজনেই শুতে গেলেন।

পরদিন সকালে ব্রেকফাষ্ট খেতে বসে মল্লিক সাহেব টগরকে ডেকে গতকালের ঘটনাটা জানতে চাইলেন। কি এমন অঘটন ঘটলো যার জন্যে সে রমাপতিকে গতকাল খেতেও দেয় নি আর নিজেও খেতে পারে নি। দিব্যেন্দু সহজভাবে খেয়ে যেতে থাকে। টগর একহাত ঘোমটা দিয়ে মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে বললে, "রমাপতিদা আমাকে গাধা, গেঁয়ো পেত্নী বলেছিল। তাই আমি রাগ করে ওকে চা দিই নি, তার জন্যে সে আমায় আরো গালাগাল আর বকুনি দিলে। সেজন্যে আমি রাত্রে তার জন্যে রাঁধিনি। আমি ওকে বলে দিয়েছি এবার থেকে ওকে বাজারে গিয়ে খেয়ে আসতে হবে। ও আবার আমায় গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বার করে দেবে বলেছে। আমি ওর জন্যে আর রাঁধবো না।"

মল্লিক সাহেব মুখ নীচু করে বললেন, "ওকে না হয় খেতে দাওনি বুঝলাম। তা তুমি কেন রাত্রে খেলে না বাপু? না খেয়ে ঘরে গিয়ে খিল দিলে।"

"রাগ করে পুরুষেরে খিতে দিলুম না। মেয়ে মানুষ হয়ে আমি কি করে খাই?" মুখ নীচু করে টগর ধীরে ধীরে কথাগুলো বললে।

"হুঁ" বলে মল্লিক সাহেব টগরকে রমাপতিকে ডাকতে বললেন।

"ওর সঙ্গে আমি কথা বলবো না," কথাগুলো বলে সে আর ওখান থেকে এক পাও নড়লো না।

"বেশ আমি ওকে ডাকছি। রমাপতি এদিকে একবার শুনে যা তো।" মল্লিক সাহেব একটু বেশ চেঁচিয়ে ডাকলেন।

রমাপতি ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিল। সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে সে এসে উপস্থিত হল।

মল্লিক সাহেব ওকে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই ওকে গালাগাল দিয়েছিস? আবার ওর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বার করে দিবি বলেছিস?"

"হ্যাঁ সাহেব বলেছি। একটা জরুরী ফোন কলকাতা থেকে এসেছিল। আপনাকে সেটা গতকাল জানিয়েছি। ফোনে কথা বলবার সময়ে ও আমাকে অযথা বিরক্ত করছিল তাই আমি রাগ চাপতে না পেরে আমি ওকে ঐ সব কথা বলেছি। আর চা দেয়নি বলে ওকে স্টুপিড ননসেন্স বলেছি।"

"তোমায় বিরক্ত করছিল কি করে সেটা একটু খুলে বল।"

সে টগরের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললে, "টগর আমার সামনে এসে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে জিব বার করে মুখ ভেংচাতে লাগলো। তারপর দাঁত দেখালো, হাত দুটো লম্বা করে একহাত ঘোমটা দিয়ে ভূতের মতন আমাকে ভয় দেখাতে থাকে। আমি সহ্য করতে না পেরে ওকে যা-তা বলেছি। আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে সাহেব। আমি এমন কাজ আর কখনও করবো না।"

মল্লিক সাহেব ওর কথা শুনে হাসি পেলেও হাসতে পারছিলেন না। দিব্যেন্দু কিন্তু মুচকি মুচকি হাসছিল। মল্লিক সাহেব তখন টগরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "টগর, ও সব সত্যি কথা বলছে?"

"হ্যাঁ সাহেব, ও সব সত্যি কথা বলছে। ও তো কখনও মিথ্যা কথা বলে না।"

"ও যখন ফোন ধরেছিল তুমি এমনি ভাবে ওর সময় নষ্ট করছিলে কেন?"

"সাহেব, একটা কাঠের হাতলের সঙ্গে পাগলের মত অনবরত বকবকানি সুরু করা দেখে আমার খুব হাসি পেয়েছিল। একটা কাঠের সঙ্গে কথা বলে ও সময় নষ্ট করছিল। আমি যেই ওকে এই কথা বললুম ও একেবারে চোখ পাকিয়ে আমায় বকাবকি সুরু করে দিলে। আমার রাগ হবে না?"

দিব্যেন্দু এতক্ষণ ধরে হাসি চেপে আসছিল। এখন সে আর চাপতে না পেরে হো হো শব্দ করে হেসে রমাপতিকে ডাকলো, "রমাপতি।"

"ছোট সাহেব!"

দিব্যেন্দু তখন পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে ওর হাতে দিয়ে বললে, "এখনই এই টাকা নিয়ে দোকান থেকে স্লেট-পেনসিল আর প্রথমভাগ কিনে নিয়ে আসবি। রোজ দুবেলা ঘণ্টাখানেক ওকে বসে বসে পড়াবি। যদি ফাঁকি দেয় তাহলে আমায় বলে দিবি।"

রমাপতি টাকাটা হাতে নিয়ে বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই টগর ছুটে এসে বড় সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "সাহেব বই পড়তে ছোটবেলা থেকেই আমার বড় ভয় করে। বই পড়া আমার সইবে না, আমি ওকে আর কোন দিন কিছু বলবো না। ওকে রোজ দুবেলা চা করে দেব। ওর জন্যে রোজ রান্না করবো। আমি ওর কাছে পড়বো না। পড়া না করতে পারলে ও আমায় খুব গালাগালি আর বকাবকি করবে।"

"বেশ তাহলে আমিই তোমাকে পড়াবো। রাজী আছ তো?" —দিব্যেন্দু বললে।

"আমি বড় সাহেবের কাছে পড়বো। আমি আর কারো কাছে পড়বো না।" টগর কাঁদতে কাঁদতে কথা-গুলো বললে।

মল্লিক সাহেব ওকে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "বেশ তো, যা হবার হয়ে গেছে। এর জন্যে কাঁদবার কি আছে? লেখাপড়া শেখা সকলেরই উচিত।"

দিব্যেন্দু বললে, "বেশ তাই হবে। রমাপতি তুই বই-পত্রগুলো কিনে নিয়ে আয়। লেখাপড়া না শিখলে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি খোলে না। তাই তোমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। আমার কাছে না পড়তে চাইলে বাবাই তোমাকে আজ থেকে পড়াবেন। তাহলে পড়বে তো?"

টগর চোখ মুছতে মুছতে বললে, "পড়বো।"

সেইদিন থেকে টগরের পড়া সুরু হয়ে গেল। মল্লিক সাহেবের কাছেই ওর প্রথম হাতে খড়ি হ'ল।

এরপর মাস ছয়েক পার হয়ে গেল, টগরও ধীরে ধীরে মল্লিক সাহেবের কাছ থেকে পাঠ নিতে লাগলো। সে খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে। প্রথমভাগটা এই ক'মাসের মধ্যেই সে শেষ করে ফেললে। স্মরণশক্তি যে তার খুব প্রখর তা মল্লিক সাহেব অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই জেনে ফেলেছেন। প্রথমভাগের সঙ্গে সঙ্গে ধারাপাতের পাঠ এগোতে থাকে। মরণদাসের সমস্ত গান ওর স্মৃতিতে যেন গাঁথা থাকে। মধ্যে মধ্যে টগর ওঁকে মায়ের নাম-গান গেয়ে শোনায়। গানের একটা কলিও সে ভোলে নি। মরণদাস এর মধ্যে বেশ কয়েকবার এসে গেছে। সাহেবের জন্যে বাঁকুড়া থেকে গুড়, ভাল চাল এনেছে। কিন্তু মরণ-দাসকে দেখে মনে হয় যেন সে আরো ক্লান্ত আরো রুগ্ন হয়ে পড়েছে। ওকে জিজ্ঞাসা করলে ও বলে যে এদেশের হাওয়াটা নাকি ওর শরীরের পক্ষে ভাল নয়। কাশিটা এখনও সারে নি। বিডিও সাহেব ওকে এক শিশি কাশির অসুধ কিনে দিয়েছেন, ওঁরা নাকি সকলেই ওকে ভালবাসেন। তাকে মাঝে মাঝে ওঁদের গান শোনাতে হয়। আজকাল আর সে গাইতে পারে না। গাইতে গেলেও হাঁপিয়ে ওঠে। ওদের বাড়ী সেদিন এসে বড় সাহেবকে একটা গান শোনালে।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-সাধক দীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীবিভূতিভূষণ বসু

বিগত শতাব্দীতে যে সকল মনীষি তাঁদের কর্ম, বিদ্যা-বত্তা ও প্রতিভার দ্বারা বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বাংলা সাহিত্য, লোকসাহিত্য, পৌরাণিক কাহিনী, কবিতা ও উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি দেশমাতৃকার সেবা করেছিলেন। সুতরাং এটা অতি সুস্পষ্ট যে বাংলা ভাষা সাহিত্য ও জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্রের অবদান সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করার সময় হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বিশেষ কোনও উল্লেখ-যোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয় নি আজও পর্য্যন্ত। কেবল মাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁর সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত করে তাঁদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত করেছেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ১২৭৩ সনের ১৭ই কার্ত্তিক) শুক্রবার রাতে দীনেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ধামরাই গ্রামের হেড মাষ্টার ও মাতা ঢাকা জেলা কোর্টের সরকারী উকিল গোকুলকৃষ্ণ মুন্সীর কন্যা রূপলতা। মানিকগঞ্জ মহকুমার বগজ্জরী গ্রামে তিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। আদি নিবাস ছিল ঢাকার সুয়াপুর গ্রামে। সুয়াপুর গ্রাম্য পাঠশালা, মানিকগঞ্জ মাইনর স্কুল, জগন্নাথ স্কুল ও ঢাকা কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। মাত্র বার বছর বয়সে কুমিল্লা কালেক্টরীর হেডক্লার্ক উমানাথ সেনের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা বিনোদিনীকে বিবাহ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ হতে এফ. এ. ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করেন। তখন তিনি শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অগাষ্ট ও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁর পিতা ও মাতা যথাক্রমে পর-লোক গমন করেন। বি এ পাশ করার পর কুমিল্লার শম্ভুনাথ ইনস্টিট্যুসনে ৫০ টাকা বেতনে হেডমাষ্টারের চাকুরী গ্রহণ করেন ও পত্নী-কন্যা সহ কুমিল্লায় আসেন। পরে ভিক্টোরিয়া স্কুলে যোগদান করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কলকাতার পিস এ্যাসোসিয়েশন কর্ত্তৃক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লেখার জন্য বিদ্যাসাগর পদক লাভ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরাধিপতির অর্থসাহায্যে কুমিল্লা হতে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা ও এর দ্বারা তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ ও স্যার আশুতোষের ন্যায় বাংলার তৎ-কালীন মনীষিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাহিত্যিক রজনীকান্ত গুপ্তের (১৮৪৯-১৯০০) দেহত্যাগের পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ কর্ত্তৃক বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন ও ১৯০০ সাল হতেই তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাসিন্দা হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সমেত প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে স্যার আশুতোষ তাঁকে যে কোনও বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করেন। যে বক্তৃতাবলী History of Bengali Language and Literature নামে প্রকাশিত হয় ও ইউরোপ ও আমেরিকায় ভারতীয় বিষয়ে পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দের (যথা রঁমা রঁলা, মিলভ্যান লৈভী, বীয়ারসন) দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ সাহিত্যের রিডার ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রধান অধ্যাপক অর্থাৎ রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে সম্মানসূচক ডিলিট ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে

জগত্তারিণী পদক লাভ করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে হাওড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মূল ও সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। রাঁচির সম্মেলনের সময় তাঁর পত্নী দেহত্যাগ করেন। পরিশেষে অশেষ সম্মান লাভ করে ৭৩ বছর বয়সে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে বেহালাস্থিত রূপেশ্বর ভবনে দীনেশচন্দ্র পরলোক গমন করেন। নিভে যায় বাংলার সাহিত্য জগতে এক উজ্জ্বল তারকা।

সংক্ষেপে এটাই হল ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী। প্রধানতঃ দুটি কারণে দীনেশচন্দ্রকে বাংলার ভবিষ্যৎ পুরুষ স্মরণ করবে। প্রথমতঃ প্রথম জীবনে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যেরূপ কঠোর সংগ্রাম করে তিনি পূর্ববঙ্গের পল্লী অঞ্চল সমূহ হতে হস্ত লিখিত কীটদ্রষ্ট বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে গেছেন সে কথা আমাদের গভীর শ্রদ্ধা-মিশ্রিত চিত্তে স্মরণ করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ও গাথা প্রভৃতি কাব্যভাণ্ডার হতে উপকরণ সংগ্রহ করে সরল সুললিত গান সর্বসাধারণের উপভোগের জন্য সেগুলি সযত্নে পরিবেশন করে তাঁদের সাহিত্যরস ও গল্প-পিপাসা সার্থকভাবে মিটিয়ে দিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ হয়েও তাঁরা রামায়ণ কথা শুনতে পেয়েছেন। তাঁরই উৎসাহে ও চেষ্টায় পূর্ববঙ্গের গাথা কাব্যগুলি মুদ্রিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ হয়ে দাড়িয়েছে। তাঁর কাছে এই ঋণ আমাদের অপরিশোধ্য।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের History of Bengali Language and Literature প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে মহীয়সী নারী ভগিনী নিবেদিতার নাম জড়িত আছে। দীনেশচন্দ্র বাগবাজারে কাটাপুকুর লেনে (অধুনা বিশ্বকোষ লেন) থাকতেন। তিনি পুস্তকটি শেষ হতে ভগিনী নিবেদিতাকে বইখানি দেখে দিতে বলেন (১৯০৯)। নিবেদিতা প্রায় বছরখানেক ধরে বইখানা দেখে দিয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র লিখেছেন—

"কোনও একটি বিষয়ের ভার নিলে নিবেদিতা মনে করতেন না যে সেটা পরের। তিনি সম্পূর্ণ আপনার ভাবে খাটতেন। এভাবের পরিশ্রম কেহ মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে পারেন না। কোন দিন সকাল হতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত উভয়ে খেটেছেন। এর মধ্যে দু' পাঁচ মিনিটের জন্য খেয়ে নিয়েছেন মাত্র। এরূপ নিঃস্বার্থ আত্মপরভাব বিরহিত, প্রতিদান সম্বন্ধে শুধু উদাসীন নহে, একান্ত বিরোধী ও কার্য্যে তন্ময় লোক আমি জীবনে বেশী দেখেছি বলে জানি না। তিনি আমাকে নিষ্কাম কর্মের যে আদর্শ দেখিয়েছেন সে শুধু গীতায় পড়েছিলাম (শিখাময়ী নিবেদিতা—উষা-দেবী সরস্বতী)।"

ভগিনী নিবেদিতাও তাঁকে বলেছিলেন যে আপনি বিনা আড়ম্বরে দেশের জন্য এতটা খেটেছেন ও দেশের ওপর এতটা মমতার পরিচয় দিয়েছেন যে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনি প্রকৃত দেশভক্তের স্থানের দাবী করার যোগ্যতা রাখেন—এজন্য আপনাকে আমার ভাল লাগে।" অন্য সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন—— "দীনেশবাবু, আপনি সত্যিই একজন প্রধান কবি। আপনার লেখা গান হলে কি হবে? আপনার ভাষা প্রকৃত কবির। আপনার সাহিত্যিক শক্তি অপূর্ব।" নিবেদিতার অবদান সম্বন্ধে পরিশেষে দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করেছিলেন— "যে দিন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম সেদিন সমস্ত বোস পাড়াটা আমার নিকট একটা মহাশূন্যের ন্যায় বোধ হইয়াছিল (ভগিনী নিবেদিতা—মুক্তিপ্রাণা প্রব্রাজিকা)।

আচার্য্য দীনেশচন্দ্রের রচনাবলী এখনও পর্য্যন্ত সঙ্কলন করা হয় নি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক জীবনী গ্রন্থে ৩৯টি বাংলা পুস্তক, এগারটি ইংরেজী গ্রন্থ ও ১৫টি সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর উল্লেখ পাই। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। রামায়ণী কথা (১৯০৪)
২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম ভাগ)—ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব পর্য্যন্ত (১৮৯৬)
৩। বেহুলা (কর্ণেল পেটাভেল ও ক্ষিতীশচন্দ্র সেন

দ্বারা ইংরেজীতে অনূদিত ও স্যার আশুতোষ কর্তৃক ভূমিকা লিখিত) (১৯০৭)

৪। বৃহৎ বঙ্গ (২ খণ্ড) (১৯৩৪ ও ১৯৩৫)

৫। ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য (১৯২২)

৬। পৌরাণিকী—(১৯৩৪)

৭। প্রাচীন সাহিত্যে মুসলমানের অবদান (১৯৪০)

8। Vaishnava Literature in Medlaeval Bengal (1917)

9. Chaitanya and his Age. (1917)

10. The folk literature of Bengal. (1920)

11. Eastern Bengal Ballads of Mymensingh (forewarded by Lord Rasalday, Governor of Bengal) (1926, 1928, 1932)

12. History of Bengali Language and Literature (1911)

১৩। ময়মনসিংহ গীতিকা—সম্পাদিত (১৯২৩)

১৪। পূর্ববঙ্গ গীতিকা— „ (১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩২)

১৫। কাশীদাসী মহাভারত— „ (১৯১২)

১৬। কৃত্তিবাসী রামায়ণ— „ (১৯১৬)

১৭। কবিকঙ্কন চণ্ডী— „ (১৯২৪, ১৯২৬)

১৮। বৈষ্ণব পদাবলী— " (১৯৩০)

এতদ্ব্যতীত সাতটি পুস্তকের ভূমিকাও তিনি লিখেছিলেন। দীনেশচন্দ্রের সমস্ত পুস্তক পাওয়া যায় না। সমস্ত ইংরেজী পুস্তক ও ত্রিশটি বাংলা পুস্তক ও সম্পাদিত পুস্তকগুলি জাতীয় গ্রন্থাগারে রাখা হয়েছে। মাত্র সাতটি পুস্তকের (গায়ে হলুদ, মামুদের শিবমন্দির, কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ, সরল বাংলা সাহিত্য, ওপারের আলো, ভয়ভাঙ্গা ও বৈশাখী,) কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। বঙ্গবাণী ও বৈদ্যহিতৈষণী পত্রিকার সম্পাদনাও তিনি করেছিলেন।

দীনেশচন্দ্র প্রথম জীবনে কবি ছিলেন। কিন্তু জ্ঞানতৃষ্ণার প্রেরনায় তিনি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক ও বাংলা সাহিত্যের গবেষকরূপে রূপান্তরিত হন। পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য তিনি দশ মাইল গ্রাম্যপথ অতিক্রম করে যেতেন ও পাণ্ডুলিপি না পেয়ে হতাশভাবে আরও দশ মাইল হেঁটে আসতেন। এইরূপে বহু গমনাগমনই তাঁর সার হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের কবিতাগুলি প্রধানতঃ তাঁর দ্বারাই সর্বপ্রথম সংগৃহীত হয়েছিল ও তাঁর দ্বারাই গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে অঙ্গ, মগধ ও বঙ্গলিপি খৃষ্টজন্মের তিনশত বছর পূর্বে প্রচলিত ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ ছিলেন। তাঁর পূর্বে কেউ জানতেন না যে বঙ্গলিপি দেবনাগরী হতে প্রাচীনতর ছিল। পরবর্ত্তীকালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলার ইতিহাসে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। মহারাজ চন্দ্রবর্মার লিপি প্রাচীন বঙ্গলিপির নিদর্শন। দীনেশচন্দ্রের আগে কেউ জানতেন না যে দেবনাগরী মাত্র সপ্তম শতাব্দীতে প্রচলিত হয়েছিল। এই তথ্য ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত Cultural heritage of Bengal পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন।

দীনেশচন্দ্র অতি সুন্দর গদ্য রচনা করতে পারতেন। রামায়ণী কথা (১৯০৪), ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য (১৯২২), পদাবলী মাধুর্য্য (১৯৩৭), প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান (১৯৪০), উপন্যাস শ্যামল ও কজ্জল (১৯৩৬) তার প্রমাণ। ছোটদের জন্য তিনি শিশির পাব্লিসিং হাউস হতে প্রকাশিত সাজের ভোগ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাচীন পটভূমি, বঙ্গ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, বাংলা পুঁথি, পট প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা তাঁকে কলকাতার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থটি দুইভাগে সমাপ্ত। কামরূপ বিহার উৎকল ও বঙ্গ—এই বৃহৎ অংশ নিয়ে বৃহৎ বঙ্গ। বাঙ্গালীর জাতি, বর্ণ, কৌলিন্য প্রথা ও পূজাপার্বনের নানাবিধ সংস্কার—এই গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়।

দীনেশচন্দ্র অনেক সময় কোনও গ্রন্থাদি না দেখে বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করতে পারতেন তথ্য ও সন-তারিখে যা নিখুঁত। এমন স্মৃতিশক্তি বড় দেখা যায় না। ব্যক্তিগত

জীবনে তিনি অতিশয় স্নেহপরায়ণ মানুষ ছিলেন। কত ছাত্র ও অনাথ যে তাঁর কাছে প্রতিপালিত হয়েছিল তার হিসাব পাওয়া দুষ্কর। তরুণ সাহিত্য প্রতিভার তিনি পৃষ্ঠপোষণ করতেন। শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্করের সাহিত্য প্রতিভার সম্বন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম আলোচনা করেন। কল্লোলের লেখকদের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—'এদের লেখা পড়ে যে কত খুশী হয়েছি তা বলতে পারি না। আমাদের মনে হয় যে ডোবা ছেড়ে পদ্মার স্রোতে এসে পড়েছি, লতার কৃত্রিম বাগান ছেড়ে নন্দনকাননে এসেছি'। তারাশঙ্করের আগুন উপন্যাসটি পাঠ করে দীনেশচন্দ্র নীল পেন্সিলে বইটির পোস্তানিতে ইংরেজী ভাষায় অকুণ্ঠিত প্রশংসা লিখেছিলেন। তার মধ্যে সমালোচনা ছিল। কিন্তু তারাশঙ্কর যে একদা আপনার গৌরবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক উচ্চ সম্মানের আসন ও মর্য্যাদা লাভ করবেন এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তিনিই সর্বপ্রথম মাসিক ভারতবর্ষে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তার কয়েকমাস পূর্বে সাহিত্যিক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট দীনেশচন্দ্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয় ও পরে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাস গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় পুস্তকালয় হতে সমালোচনার জন্য পান। প্রবন্ধের মধ্যে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন—

> "শরৎবাবুর ভাষায় সংযম আছে; সংযত দুই-একটি কথায় তাঁহার চরিত্রগুলির অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শরৎবাবুর প্রতিভা অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছে.....আমরা সাহিত্য ক্ষেত্রে নববল-দৃপ্ত অসামান্য প্রতিভাশালী এই লেখকের অভ্যুত্থানে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।"
>
> (শরৎ কথামালা—ইন্দ্র মিত্র—৩১ পৃষ্ঠা)

১৯১১ খৃষ্টাব্দের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য History of Bengali Language Literature নামে প্রকাশিত হয় ও ভগিনী নিবেদিতার দার্জিলিং যাওয়ার পূর্বে দীনেশচন্দ্র তাঁকে দুটি পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্রের গবেষণার হয়তো অপূর্ণতা আছে। তা থাকা কিছু অসম্ভব নয়। তখনকার দিনে এই সব কাজ করা যে কি কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ছিল সেকথাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। দীনেশচন্দ্র পথিকৃৎ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—

> "যেমন ভূস্তর পর্য্যায়ে ভূমিকম্প, অগ্নি-উচ্ছ্বাস, জল-প্লাবন, তুষার সংহতি কালে কালে ভূমি গঠনের ইতিহাস নানা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করে এবং বৈজ্ঞানিক সেই লিপি উদ্‌ঘাটন করিয়া বিচিত্র সৃজনশক্তির রহস্য-লীলা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করেন, তেমনি যে সকল প্রলয় শক্তি ও সৃজনশক্তি অদৃশ্যভাবে সমাজকে পরিণতি দান করিয়া আসিয়াছে সাহিত্যের স্তরে স্তরে তাহাদের ইতিবৃত্ত আপনি মুদ্রিত হইয়া যায়। সেই নিগূঢ় ইতিহাসটি উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে প্রকৃতভাবে সজীবভাবে আমাদের দেশকে জানিতে পারিব।"
>
> (বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ ভূমিকা)

অন্যস্থানে তিনি লিখেছিলেন "কবির কথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন, এইরূপ পূজার আবেগ মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমাদের মতে প্রকৃত সমালোচনা।" যদিও দীনেশচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নি তবুও তিনি লেখার মাধ্যমে বঙ্গজননীর সেবা করেছিলেন। তিনি সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে (১৮৯০-১৯৩৯) বঙ্গভাষার সেবা করেছেন। তাঁর রচনা নানা প্রকারের ছিল। স্ত্রী শিক্ষা, শিশুদের শিক্ষা, একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা, আদর্শ গৃহস্থ জীবন, পল্লী জীবন ও গৃহসমস্যার সমাধান, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, বাড়ীর ভৃত্যদের সঙ্গে ব্যবহার—সকল বিষয়েই তিনি আলোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য গৃহশ্রী পুস্তক)। সমাজের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছিলেন। আমরা সে সব বিষয়ে কিছু আলোচনা করবো—

(১) শিক্ষা—স্ত্রীশিক্ষা ও শিশুদের শিক্ষা—এই দুই বিষয়েই দীনেশচন্দ্র বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে "যে শিক্ষায় লালসা বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক ভিত্তি একেবারে নষ্ট করে নিজেকে সাবধানে রাখতে হবে।

কলুষশূন্য মন, নিষ্পাপ দেহ হিন্দু রমণীর গৌরব—এই বন্যার মুখে যেন আমাদের সেই যথাসর্ব্বস্ব প্রকৃতিগত পবিত্রতা না হারাই কবেই পরিবর্ত্তনে আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না।" আদর্শের পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও আমাদের জীবনের লক্ষ্য ধ্রুবতারকার মত উজ্জ্বল থাকবে। এখন আর অল্পশিক্ষায় যুগ প্রয়োজন মিটবে না—পুরুষের সঙ্গে রমণীদের উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে হবে। জীবনের পবিত্রতা স্থির রেখে এখন শিক্ষা বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে রমণীরা এক পংক্তিতে স্থান নেবেন। কিন্তু তাঁদের সুগৃহিনী নাম যাতে লোপ না পায়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তিনি আলোচনা করেছেন। হস্তাক্ষর সুন্দর, উপন্যাস, ডিডেকটিভ, অসার গল্প, বই পড়া, ইতিহাস শিক্ষা, ইংরাজী শিক্ষা, গীতশিক্ষা, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় অর্থাৎ ডাক্তারী শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—সমস্ত বিষয়েই আলোচনা করেছেন। গীতশিক্ষা সমর্থন করেছেন সভয়ে। শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ছেলেদের উচ্ছৃংখলতা ক্রিকেট, ফুটবল খেলা, ধর্মশিক্ষা, খাওয়া সম্বন্ধে সংযম, শিষ্টাচার প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করেছেন, তাঁর মতে ছেলেদের প্রাতঃকালে যদি আধঘণ্টা বা পনের মিনিট ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত রাখা যায়, তার ফল খুব বেশী পাওয়া যাবে। যদি শৈশব হতে ভগবানকে ডাকবার অভ্যাস না হয়, তখন বিপদের দিনে তিনি সাড়া দেবেন কেন? তাঁর মতে শিশুদের ওপরই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর পরিচালানার ভার। ওরাই ভবিষ্যতের সমাজ নেতা, বিচারক, শিক্ষক ও ধর্মগুরু। ওরা অবহেলার সামগ্রী নহে। মাতা শিশুর ইহকাল ও পরকালের শিক্ষক। সুতরাং শিশু শিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা এ দুটি বিষয়ে শিক্ষাকে তিনি অগ্রাধিকার দান করেছেন। কারণ তাঁর মতে স্ত্রীলোকের সঠিক শিক্ষা হলে শিশু ও সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে।

(২) যৌথ পরিবার প্রথা:—দীনেশচন্দ্র যৌথ পরিবার প্রথা সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে এদেশের সমাজের কাঠামো পাশ্চাত্য জগতের সমাজ হতে সম্পূর্ণ-ভাবে ভিন্ন। বিলাতে বড় বড় হাসপাতাল আছে। অসুস্থ হলেই হাসপাতালে লোকে যায় ও আরোগ্য লাভ করে বাড়ীতে ফেরে। আর আমাদের দেশে বিপদের সময়ে ধরবার লোক থাকে না। দ্রুতব্য চিকিৎসালয়ে কে যেতে সম্মত হবেন? আর আমাদের পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে তার ব্যাপক ব্যবস্থাই বা কোথায়? যে প্রচুর অর্থ-দ্বারা এই বৃহৎ ব্যাপার হতে পারে তা এদেশে কোন কালে হতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে যৌথ পরিবার ত্যাগের প্রকৃত ক্ষেত্র। যেখানে ত্যাগ নেই, উচ্চ ধর্মভাব নেই, সেখানে যেন কেহ যৌথ পরিবার গড়বার বিফল চেষ্টা না করেন। দীনেশচন্দ্র সেজন্য যৌথ পরিবারের পক্ষপাতী হলেও যেখানে ত্যাগ নেই, উদারতা নেই, সেক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের বিপক্ষে ছিলেন। যেখানে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়েছে, যেখানে ক্ষমা ও ত্যাগ সংসারকে শোভন ও সুন্দর করেছে, সেখানেই যৌথ পরিবার সফল হতে দেখা যায়। যাঁরা নিজের সুখ অপেক্ষা পরের সুখ কিসে বেশী হয়, এই চিন্তা করতে পারেন, যাঁরা ক্ষমা ও দয়ার দ্বারা পরকে আপন করে নিতে পারেন, তারাই এক ছত্রের তলে বাস করার যোগ্য। তিনি দেশকে আহ্বান করেছেন যাতে উদার আদর্শ রক্ষা পায়—তজ্জন্য চেষ্টা করার জন্য। অলসভাবে প্রশ্রয় না দিয়েও যৌথ পরিবার বহু লোকের সমবেত চেষ্টায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। প্রাচীন ধর্মভাবের সঙ্গে এখনকার কর্মের আদর্শের যদি যোগ করা যায় তখন ত্যাগের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যৌথ পরিবার পুনরায় নবজীবন লাভ করতে পারে। দীনেশচন্দ্র যৌথ পরিবার প্রথা বজায় রাখার জন্য কয়েকটি নিয়মের কথা বলেছেন—অসাক্ষাতে কারও দোষ কীর্ত্তন না করা, আপন ভাই বা বোনের দুঃখ-কষ্টে সমব্যথী হওয়া, সবর্মীর নিষ্কর্মা ভাইদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না হওয়া, সকল ছেলেকে সমান চোখে দেখা, চিত্তসংযম—হঠাৎ না রাগা—এগুলি একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথার পক্ষে। দীনেশচন্দ্র পরিশেষে যাতে যৌথ পরিবার প্রথা ত্যাগ, সেবা ও ক্ষমার ওপর ভিত্তি করে পুনর্জীবিত হয় সে বিষয়ে চিন্তা করার জন্য দেশবাসীদের অনুরোধ করেছিলেন। কারণ "তাঁর মতে ভাঙ্গা সহজ, গড়া শক্ত। আজকালকার সভ্যতায় যৌথ

পরিবারের আদর্শ ভাঙ্গিতে বসিয়াছে। উহা টলটলায়মান।"

(৩) পল্লীজীবন ও গৃহসমস্যা—যৌথ পরিবার প্রথা আলোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র পল্লীজীবনের আদর্শকে দেশবাসীর নিকট তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে "আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পল্লীজীবনই অবলম্বন করিতে হইবে। সহরের বৈদ্যুতিক আলো আমাদিগের পথ উজ্জ্বল রাখিবে না, সহরের ট্রামে আমাদের গন্তব্যস্থির হইবে না। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় ও বায়োস্কোপে আমাদের জীবনে প্রকৃত স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া পাইব না। আমাদের সংসারের মেয়েরা যদি একথা বুঝেন তবে আমাদের ইহা বুঝিতে দেরী হইবে না।" তাঁরা সহরে থাকতে চান বলে পুরুষরা সহরে এসেছেন। তাঁরা যদি এই সব আমোদ ও আপাত সুবিধাগুলির মোহে অন্ধ না হয়ে পল্লীর গৃহস্থালীকে বরণ করে নেন তবে পল্লীতে ভদ্রলোকগণ ফিরে যাবেন ও পল্লীগুলির অবস্থা ভাল হবে। যদি মেয়েরা পল্লীজীবনের পক্ষপাতিনী হন, তবে আমাদের সমাজের মঙ্গল। পাড়াগাঁয়ে ফুলের বাগান থাকা আবশ্যক। ফুলের বাগান আমাদের জীবন যাত্রার পক্ষে দরকার। তা নিতান্ত বাজে সামগ্রী নহে। তা হলে ভগবান প্রতি গৃহের কোণে, রাস্তার ধারে ও পুকুরধারে যথা-তথা তাদের জন্য আসন রক্ষা করে রাখলেন কেন? ফুল ক্লান্তির অপমোদন করে, মনকে প্রফুল্ল করে, তার গন্ধ ও শোভা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী।

(৪) গুরুজনদের প্রতি ব্যবহার—গুরুজনের প্রতি গৃহললনারা কিরূপ ব্যবহার করেন, বাল্যকাল হতেই তা শিক্ষার দরকার। বধূ ও কন্যারা প্রাতে উঠে ভগবানকে ডাকার পর জনক-জননীর বা শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর পাদ-বন্দনা করবে। এ প্রণামের ফলে সে দিন শুভ হবে।

(৫) আদর্শ দাম্পত্য জীবন—বিবাহ মানুষের জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা। কারণ বিবহের দ্বারা আত্মীয়-স্বজন, গৃহস্বামী, স্বামীর পরিবারের সকলেই সুখ-দুঃখের ভাগী হন। বিবাহের পর কোথাও আনন্দের সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়, কোথাও বা সমস্ত স্নেহ-মায়ার চিতানল জ্বলে গৃহখানা স্বার্থের একটি নরককুণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রী-পুরুষ যদি উভয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করতে পারেন তবে তাঁদের প্রেম দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে। স্বামীর ব্যবহারের অসংযমের পথে স্ত্রীকে পদে পদে বাধা দিতে হবে। স্বামীর কারও ওপর দুর্ব্যবহারের জন্য স্ত্রীকে স্বামীর সাময়িক ক্রোধ সহ্য করেও বাধা দিতে হবে। তার ফলে স্বামী স্ত্রীকে সহ্য করতে পারবেন। স্ত্রী ও স্বামী উভয়েরই বাকসংযম ও ধৈর্য্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। মোটামুটি ক্ষমা গুণের ওপরেই সংসারে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থায়ী হয়।

(৬) আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন—প্রাতঃকালে ভগবানের সমীপে আরাধনা করা গৃহস্থের প্রথম কর্ত্তব্য। "গৃহের সকল তোমার—আমি সকলই তোমায় নিবেদন করিতেছি। আজ যেন সকলে সাধু পথে চলে, কেহ যেন নিজের সুখ খুঁজে অপরকে কষ্ট না দেয়, এই পরিবারের সমস্ত সংসারের মঙ্গল হোক। তোমার যা ইচ্ছা তা পালন করিতে যেন আমার কষ্ট না হয়। তুমি যা দিবে তাই তোমার প্রসাদ বলিয়া মাথায় করিয়া নিব, আমি নিজের সুখ খুঁজিব না।" প্রাতঃকালে এরূপ প্রার্থনা করা প্রথম কর্ত্তব্য। ছেলেরাও বলবে—"জগৎপিতা, তুমি আমাদের হাত ধরে সুপথে নিয়ে যাও। ভাল হবার শক্তি আমাদের দিয়েছ—আমরা কেন মন্দ পথে চলব? আমরা নিজেরা চলতে জানি না।" বিনয় ও লজ্জা নারী জাতির ভূষণ। লজ্জা ও নম্রতাই তাঁদের প্রকৃত সৌন্দর্য্য। কিন্তু লজ্জার অর্থে আজানুলম্বিত ঘোমটা নয়। প্রকৃত লজ্জা জিহ্বাদি সংযম। সংযত দৃষ্টি, সংযত কথা ও সংযত ব্যবহারেই স্ত্রীলোকের প্রকৃত লজ্জা প্রকাশ করে।

এতদ্ব্যতীত গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, বাড়ীর চাকর-ঝিদের প্রতি সহানুভূতিমূলক ব্যবহার, বাড়ীর নিত্য-প্রয়োজনীয় শিক্ষা—এসব বিষয়েও দীনেশচন্দ্র বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। দীনেশচন্দ্রের রচনাবলী অধুনা প্রায় পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র 'জিজ্ঞাসা পুস্তকালয়' তাঁর চৌদ্দটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। ইংরেজী রচনাবলী পুনঃ প্রকাশিত হয় নি ও সম্পাদিত ১৫টি পুস্তকও অপ্রকাশিত রয়েছে। দেশের সুধীবৃন্দের ও সরকারের পবিত্র দায়িত্ব আছে এই রচনাবলী প্রকাশের জন্য।

দীনেশচন্দ্র জাতির নমস্য—বঙ্গ ভাষার সাহিত্য ইতিহাস রচনার জন্য জাতির স্মরণীয়। আজ এই সাহিত্যিককে আমরা শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করি।

আমেরিকার টুকিটাকি

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

টিউব অথবা বাসের তুলনায় আমেরিকার ট্যাক্সি ব্যয়-বহুল হলেও ও দেশের আর্থিক মানদণ্ড খুব খরচের নয়—আধ-ঘণ্টার মত পথ যেতে গেলে মিটারে সাত আট ডলার ওঠে। তবে প্রায় প্রতিটি শহরের ট্যাক্সির অবস্থা খুব ভালো—আমাদের দেশের অনেক ধনীরও অত ভালো গাড়ী নেই। ট্যাক্সি পাওয়াও খুব সহজ, রাস্তায় হাত তুলে দাঁড়ালে খালি ট্যাক্সি এসে থামবে। অথবা ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য "ট্যাক্সি" উচ্চারণ করতে হবে।

ট্যাক্সির বহু বুথ - সেখানে ফোন করলেও দুই-তিন মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সি পৌঁছে যাবে। ট্যাক্সি চালক ও তার বুথের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ রেখে চলেন ও বুথের নির্দেশে পরবর্তী গন্তব্যস্থলের দিকে যান। ঐ রেডিওর সাহায্যে হদিস জানা না থাকলে বুথ থেকে জেনে নেন। আমার মত নতুন লোকেরও তাই কখনও কোন ঠিকানায় পৌঁছতে অসুবিধা হয়নি। ট্যাক্সি চালকদের মাসিক রোজগার ১৫০০ ডলারের মত। ট্যাক্সি চালকেরাই অত্যন্ত ভদ্র। যাত্রীর জিনিস বয়ে দেওয়া ওদেশের রেওয়াজ না হলেও যথোচিত ভাবে প্রয়োজনে তারা যাত্রীর মাল বয়ে দিয়ে সাহায্য করেন। মিটারের ভাড়ার চেয়ে কাউকে কখনও বেশী চাইতে দেখি নি—এমন কি ভাড়ার উপর টিপসও নয়। আটলান্টায় জনৈক কৃষ্ণকায় ট্যাক্সি চালক অন্যযাত্রী থাকায় আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না বলে নিজে রেডিও টেলিফোনের সাহায্যে আমার জন্য বুথ থেকে একটি ট্যাক্সি তো আনিয়ে দিলেনই, উপরন্তু পাঁচ মিনিট ওদেশে ঘণ্টাধরে মজুরী) সময় আমার জন্য ব্যয় করলেন। এই সময়ের দাম কম নয়। ম্যাপ ধরে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে আমার গন্তব্যস্থলের হদিশ বার করে ট্যাক্সি চালকদের পথের নিশানা বুঝিয়ে দিলেন। ওয়াশিংটন ডি. সি. তে আর একজন আমারই অজ্ঞতার কারণে বেশ কিছুটা পথ অহেতুক পরিক্রমা করা সত্বেও বার বার অনুরোধ করলে ও সেই পথের ভাড়া আমার কাছে নিলেন না এই বলে যে তিনি ত্রিশ বছর ধরে এখানে ট্যাক্সি চালানো সত্বেও যদি সঠিক ঠিকানাটা না জেনে থাকেন, তাহলে আমি বিদেশী আমার ত ভুল হবেই।

টেলিভিসন ঃ—আমেরিকাতে টেলিভিসনের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খবর অথবা অপচারের জন্যই নয়। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের প্রচারেও দেখেছি এর ভূমিকা কী প্রবল! শহর গ্রাম সর্বত্রই টি. ভি-এর ছড়াছড়ি বলে জনসাধারণের কাছে নিজ বক্তব্য পৌঁছে দেবার জন্য সবাই এর কদর করেন। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের ঠিক পূর্বে রেগণ সমর্থকদের দ্বারা প্রচারিত তিন মিনিটের একটি প্রোগ্রাম যাতে এক প্রৌঢ়ার জবানীতে কার্টারের প্রস্তাবিত গর্ভপাতও সমকামীতা আইনসঙ্গত করার বিরুদ্ধে বলা হয়—সমগ্র দেশে দেখানোর ফলে হাওয়া অনেকটা কার্টারের বিরুদ্ধে চলে যায়। এ ছাড়া ২৮শে অক্টোবর কার্টার ও রেগনের মধ্যে যে জাতীয় বিতর্ক হল এবং ঐ দিন রাতেই টি. ভি.তে সে সম্বন্ধে জনমতের যে প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পেলেন তাতেই বোঝা গেল পাল্লা কোন দিকে ভারি। কোন কোন শহরে টি, ভি,তে বারোটি পর্যন্ত চ্যানেল দেখেছি। এর অধিকাংশই রঙীণ। দুই একটি স্রেফ কার্টুন ছবির প্রোগ্রাম হয়। তবে একটি ছাড়া আর সবই ব্যবসায়িক প্রোগ্রাম এবং তার খরচ চলে বিজ্ঞাপনের আয়ে। টি, ভি, ওদেশে সরকার নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত নয়। ফিনিকস শহরে শ্রীযুক্ত টম কোর্টনীর বাড়ীতে নৈশ ভোজনের নেমতন্ন ছিল। দুটি আসবাবের দোকানের মাধ্যমে বছরে তিনি ১০ লক্ষ ডলারের ব্যবসা করেন

এর জন্য কেবল টি, ভি,-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের খরচ করেণ ৩০ হাজার ডলার। গভীর রাতের কয়েক ঘণ্টা বাদ দিলে দিনের কোন না কোন সময়ই চ্যানেলে পাবলিক ব্রড কাস্টিং সিস্টেমে কেবল উচ্চ শ্রেণীয় শিক্ষামূলক প্রোগ্রামও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার চলে। এর খরচ চলে প্রধানতঃ বিভিন্ন ফাউণ্ডেশান অথবা করপোরেশনের দানে এবং অংশত সরকারী সহায়তায়। যে ত্রিশদিন আমেরিকায় ছিলাম সর্বত্র হোটেলের কামরায় টি, ভি, থাকায় সময় পেলেই পাবলিক ব্রড কাস্টিং সিস্টেমের প্রোগ্রাম দেখতাম। তেসরা অক্টোবর ওয়াশিংটন ডি সিতে পালিত সন্তানদের নিজের মূল অর্থাৎ আসল মা-বাবাকে খোঁজার একটি অত্যন্ত আবেগময় প্রোগ্রাম দেখলাম। অবৈধ ওদেশে হাসপাতাল অথবা অনাথ আশ্রমের মাধ্যমে অবশেষে কোন দায়িত্বশীল পরিবারের আশ্রয় পায়। দত্তক প্রথা অনুসারে জন্মদাত্রী মা অথবা সন্তান কেউ-ই নিজেদের যথার্থ পরিচয় পায় না। কারণ তার নানা সমস্যা আছে কিন্তু তবু পালিত পুত্র-কন্যা বড় হলেও প্রোগ্রামের তিনজনই মহিলা ছিলেন। তাদের মনে সময় সময় যথার্থ মা বাবার পরিচয় পাবার তীব্র ইচ্ছা জাগে এবং কেউ কেউ প্রবল প্রয়াসে খুঁজে পেতে নিজেদের আসল জনক-জননীকে আবিষ্কারও করেন। তখন তাদের যে মানসিক অবস্থা হয় তা অনুরূপ পরিস্থিতি কর্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়। আর ওদেশে এরকম কর্ণ এক-আধটা নয়, হাজারে হাজারে।

টাক মাথায় চুল গজিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতিতে যে সব তথাকথিত কিনিক অনেক টাকা লুটছে, তার বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক টি, ভি,তে সুন্দর একটি বিজ্ঞান সম্মত প্রোগ্রাম ছিল। অনুরূপভাবে ১৬ই অক্টোবর ফিলাডেলফিয়াতে টি, ভি,তে ক্যানসারের এক হাতুড়ে চিকিৎসকদের অবৈজ্ঞানিক দাবি সম্বন্ধেও একটি শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম দেখেছি। পরের দিন সকালে ঐ ফিলাডেলফিয়ার নারীদের সমানাধিকারের দাবি সম্বন্ধে একটি ভালো প্রোগ্রাম হল! পুরুষ ও নারী উভয়েই যদি রোজগার ররতে বেরোয় তাহলে বাড়ী ফিরে পুরুষরাও কেন ঘর-গৃহস্থালির কাজ নেবে না—এই বক্তব্য চমৎকার ভাবে তুলে ধরা হল আলোচনার মাধ্যমে।

সমস্যা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে টি, ভি,-র এই জাতীয় প্রোগ্রাম বিপন্ন মানুষদের সাহায্য করে। ৯ই অক্টোবর নিউইয়র্কের এক প্রোগ্রামে দেখলাম যে কমপিউটারের ভুলে এক অসুস্থা বৃদ্ধার সর্ব সময়ের সেবিকা একটি জ্যামাইকান তরুণীর মাইনের চেক (১৮০০ ডলার হিসেবে) ১১ সপ্তাহ ধরে না আসায় তাঁর কী বিড়ম্বনা। তবে টি, ভি,-র মাধ্যমে বেতনদাতা সমাজ কল্যাণ বিভাগের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন হবার ফলে তিন দিনের মধ্যে তরুণীটির বকেয়া (কম্পিউটারের পুরাতন বেতন দেবার ক্ষমতা নেই) ও নিয়মিত বেতন পাবার ব্যবস্থা হয়। উপকৃত তরুণীটি এবং বৃদ্ধাও (যদিও সেবিকাটি কাজ ছেড়ে চলে যায়) কত ধন্যবাদ দিলেন টি' ভি, কর্তৃপক্ষকে। বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করার এমনি আর একটি প্রোগ্রাম দেখলাম ২৭শে অক্টোবর ডেনভারে। একটি বিমান বন্দরের স্টেশন ম্যানেজার ও একটি প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক সেলস ডাইরেকটাররা চারজন উচ্চপদস্থ কর্মীকে মালিক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন এক তরফা অবসর দিয়ে। আমেরিকাতে কর্মী নিয়োগ ও বরখাস্তের ব্যাপারে মালিকের অনেক স্বাধীনতা—বিশেষ করে উচ্চ-পদস্থ কর্মীদের ক্ষেত্রে। ইউনিয়ন দ্বারা সংরক্ষিত নন। মালিকের গোপন উদ্দেশ্য হল—অপেক্ষাকৃত কম বেতনে (কারণ তাঁরা বেতন স্কেলের প্রথম ধাপ থেকে শুরু করবেন) তরুণদের নিয়োগ করে লাভের অঙ্ক বাড়ান। আর এই বয়সে রোজগারের নূতন প্রথা ধরা সহজ নয়। প্রবীন সেলস ডাইরেকটার ভদ্রলোক জানালেন যে বরখাস্ত করার খবর পাওয়ার দিন সন্ধ্যায় তাঁর বাড়ীতে নিজের জন্মদিনের ডিনার পার্টি, বাড়ীতে পৌঁছে তাঁর অবস্থা কি হল সহজেই অনুমেয়। এই অবিচারের বিরুদ্ধে জন-মত তৈরী করছে টি, ভি,।

বৃদ্ধদের অবস্থা :—বৃদ্ধরা ওদেশে একাধারে অনাদৃত। সম্মানে দিয়ে তাঁদের (এবং অশক্তদের) জন্য বাস ও টিউব ট্রেনে সংরক্ষিত আসন রাখা হয়। কোন কোন জায়গায় বিনা ভাড়ায়, কোথাও বা সস্তায় ভ্রমনের টিকিট লওয়া হয়। কিন্তু তারা খুব কাজের নয় বলে অনাদৃত নন। ওরা অপেক্ষাকৃত বেশী কর্মক্ষম বলে ওদেশে কাজ থেকে অবসর

গ্রহণের নিয়ম বেশী বয়সে। ৬৫ বছরের আগে ত নয়ই কোথাও কোথাও ৭০ বৎসর বয়সে। কিন্তু বয়স্কদের কিভাবে সরিয়ে দেবার প্রয়াস হয় তার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। এ ছাড়া কদাচিৎ ছেলে-মেয়েরা বৃদ্ধ বাবা-মার সঙ্গে থাকেন সেই জন্য তাদের জীবন নিঃসঙ্গ। এর মধ্যে দম্পতিদের একজন মারা গেলে অথবা তাঁরা বিচ্ছিন্ন হলে তাঁদের গতি বৃদ্ধদের আশ্রয় নিবাসে। ১২ লক্ষ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছেন। সেখানে সন্তানেরা বড়দিনে কার্ড পাঠালে অথবা টেলি-ফোনে একাআধবার কুশল সংবাদ নিলে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা বেন র্তে যান! অবশ্য এর ব্যতিক্রম নেই তা নয়। ওদেশে মানুষ যে যৌবনকে ধরে রাখতে চান। বার্ধক্যেও সাজ-গোজের কমতি নেই তার একটা কারণ হয়ত তাঁরা এই অনাদৃত বার্ধক্যকে স্বীকার করতে চান না।

বৃদ্ধ- বৃদ্ধাদের প্রতি লক্ষপাত দূর করে স্বাধিকার রক্ষার জন্য বছর কয়েক হল ওদেশে ৭৫ বৎসর বৃদ্ধ মার্গারেট কুহনের নেতৃত্বে "গ্রেপ্যান্থোর" আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। ৩১টি রাজ্যে তাঁদের ২৭ হাজার সদস্য হয়ে গেছে। এঁদের আন্দোলন প্রচারের ফলে বেসরকারী শল্পে অবসর গ্রহণের বয়স ৬৫ থেকে ৭০ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সকারের ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের কোন বাধ্যতা-মূলক বয়স রাখা হয়নি। এদের একটা প্রধান কর্মসূচী হল—সমুচিত সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য শৈশব থেকেই ছেলেমেয়েরা যাতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গে একত্র বড় হয়ে ওঠে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যৌথ পরিবার প্রথার সাপেক্ষ হুকি!

ট্রেন-বাস ঃ—দূরপাল্লার ট্রেনের ওদেশের সঙ্গে তুলনা হতে পারে আমাদের দেশের একমাত্র রাজধানী এক্সপ্রেসের সঙ্গে গ্রেহাউড বা ঐ জাতীয় দূরপাল্লার বাসের ভ্রমনও সমান সুখদায়ক। প্রায় সব বড় বড় শহরেই বাস অথবা ট্রলি বাসের সঙ্গে সঙ্গে মাটির নীচে রেলেওয়ে ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। বাস অথবা ট্রলি বাসের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ড্রাইভারের পাশে রাখা কাঁচের আধারে নির্দিষ্ট ভাড়া (৫০ থেকে ৭০ সেন্ট, যত দূরের যাত্রীই হোক না কেন) দিয়ে বসতে হয়। কোন কনডাকটার নেই। নির্দিষ্ট জায়গায় ফুটবোর্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ড্রাইভার নিজের আসন থেকেই যন্ত্রের সাহায্যে দরজা খুলে দেন। কোথাও কোথাও বাসের টিকিট দেওয়ার জন্য কনডাকটার থাকেন। টিউব ট্রেন সর্বাপেক্ষা সস্তার যান হলেও এর অজস্র সংখ্যার জন এমন কি অফিসের সময়ও ঠাসাঠাসি ভীড় নেই। প্রতিটি ষ্টেশন আসার পূর্বে মাইক্রোফোনে নাম ঘোষণা করেন। ট্রেন থামলে দরজাখোলে, ছাড়লে বন্ধ হয়ে যায়। মাটির তলার ষ্টেশনের ওপরে ওঠার চলন্ত সিঁড়ি অথবা ট্রেনের বাইরে-ভিতর সবই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একমাত্র দেখলাম নিউইয়র্কের টিউব ট্রেন—যার ভিতর-বাইরে সর্বত্র কলকাতার মতই কুৎসিৎ। হস্তলিপিতে যা ইচ্ছা তাই লেখা। যে কোন দামের টিকিট কেটে ট্রেনে চড়া যায়। ষ্টেশন থেকে বেরোবার সময় গেটের নির্দিষ্ট জায়গায় টিকিট ঢুকিয়ে দিলে যদি উপযুক্ত ভাড়া দেওয়া হয় তাহলে আর এক জায়গা দিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গেট খুলে যায় ও যাত্রী বেরিয়ে যান। নচেৎ একটা যান্ত্রিক আওয়াজ হয় ও গেটও বন্ধ থাকে। গেটের একমাত্র কর্মচারীর কাছে উপযুক্ত ভাড়া দিয়ে বেরোতে হয়। প্রথমেই অতিরিক্ত ভাড়া দেওয়া থাকলে একদিনের টিকিটে অন্য দিনও ট্রেনে চড়া যায়।

শিক্ষাব্যবস্থা—

আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধেও জানতে হলে বড় একটি বই লিখতে হয়। তা সম্ভব নয় বলে তার যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে সংক্ষেপে তা ব্যক্ত করছি। একমাত্র ধনীদের সন্তানরাই ব্যয়বহুল প্রাইভেট স্কুলে যায়। এছাড়া আর সবাই অন্ততঃ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত অবৈতনিক সরকারী স্কুলের ছাত্র। পাঠ্য পুস্তক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খাতা পেনসিলও স্কুল থেকে পাওয়া যায়। বহু স্কুলের তরফ থেকে লাঞ্চ দেবার ব্যবস্থ আছে। স্কুলগুলি সাধারণতঃ মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক পরিচালিত। বন্ধু এডওয়ার্ড লাজারের সঙ্গে পালো অলিটিতে তাঁর ছেলের স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। খেলাধুলো, ছবি আঁকা, লাইব্রেরী ও নানাবিধ হাতের কাজের কী চমৎকার ব্যবস্থা

ছেলে তাঁর ক্লাসের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর সম্বন্ধে অভিযোগ করে খুব বকাঝকা করে বলে বন্ধু আরও দু-চারজনের কাছ থেকে খবর নিয়ে দেখেছেন অভিযোগ সত্য। প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে অনুরোধ করে এত সহজে ছেলেকে অন্য সেকসানে স্থানান্তরিত করলেন যা আমরা কল্পনাই করতে পারব না। তবে ভালো ফল করতে হলে এখানে ছাত্রদের খাটতেও হয় খুব। অলিংটনে দেখেছি বন্ধু প্রসূন মিত্রের মেয়েরা (উঁচু ক্লাসের ছাত্রী) স্কুল থেকে ফিরেই খেয়ে দেয়ে রাত দশটার পর পর্যন্ত এধং তারপর ভোর পাঁচটা থেকে আটটায় স্কুল রওনা হবার আগের মুহূর্ত অবধি হোমটাস্ক করছে। বক্তৃতা লওয়া, নাচ-গান-বাজনা-ছবি-আঁকা, অভিনয় এসবই স্কুলের শিক্ষাক্রমের অঙ্গ।

পাঠ্যপুস্তক প্রকাশন ঃ—

বন্ধু এডওয়ার্ড লাজার আমেরিকার কিন্তু মাঝারী আকারের মুখ্যতঃ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশক Addition weekly প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী। পালো আলটো শহরের এক প্রান্তে একটি টিলার এর সম্পাদকীয় বিভাগের বিরাট তিনতলা বাড়ী। বছরে এই প্রতিষ্ঠান ৭ কোটি ডলারের ব্যবস্থা করে। চারটি ভিন্ন দেশস্থ মোট দশ জায়গায় ঐ প্রতিষ্ঠানের বই ছাপা হয়। গুদাম জাত করা ও পাইকারী বিক্রির দপ্তর বা কেন্দ্র আছে। পালো আলটার সম্পাদকীয় দপ্তরে পাণ্ডুলিপি লেখা ও লেখান ছাড়াও ছবি আঁকান, ডিজাইন ও টাইপ সেট করা হয়। বই ছাপান হয় দেশের যে গুটি কয়েক বিশালায়তন ছাপাখানা আছে সেখানে। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এঁটে উঠতে না পেরে ছোট মাঝারী ছাপাখানা আমেরিকা থেকে উঠে গেছে। পাতায় পাতায় চার রঙের ছবিসহ চমৎকার ছাপান সেই সব পাঠ্য-পুস্তক দেখে চোখ-মন জুড়িয়ে যায়। বিজ্ঞান বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ত্রিমাত্রিক পাঠ্যপুস্তকও কত! পড়াতে হলে শিক্ষকদেরও খাটতে হয়। শিক্ষা সহায়ক পুস্তক না দেখলে বিশ্বাস হবে না। শিক্ষা সহায়ক পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়গুলিকে বিনামূল্যে সরবরাহ করেন। জ্ঞানানুশীলনের জন্য কত ব্যবস্থা এবং কী প্রভূত ব্যয় করেন এঁরা!

স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়েরঃ—মাঝারী আ একটি শহর নিয়ে স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় মৃত পুত্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের জন্য স্টেনফোর্ড পরিবার তাঁদের দা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তবে বর্তমানে এটি ব্যয়বহুল ও অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম চলে প্রধানতঃ স্টানফোর্ড পরিবারের দানে স মেণ্টের আয় ও ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনে। বে হলেও যথার্থ যোগ্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনে ব্যবস্থাও আছে। বিশাল এবং সুদৃশ্য ভাস্ গীর্জা ছাড়াও নানা বিভাগের অসংখ্য বিশ্ববিদ ঘোরাফেরার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বাহন সাইকে দিকে বিরাট একটি চোখ যায়! সুবিস্ত তাতে রোদ উপভোগ করতে অনেকে পড়ছে, পরিবেশ বিস্মৃত হয়ে প্রণয়ালিঙ্গনে বন্ধ। কাজে বাধা হচ্ছে না। বিশাল লাইব্রেরী ছাত্র ছাত্রীরা হাসিমুখে ঢুকছে বেরোচ্ছে। স্টোর এবং রেস্টুরেণ্ট। প্রায় হাজার-কুড়ি ছ বিভাগ মিলিয়ে। ওরমেটারীতে ছাত্র-ছা থাকে। বিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীদের সপরিবারে পৃথক অ্যাপার্টমেণ্টের ব্যবস্থা আছে। স্ত্রীর যে কোন একজন পড়তে এলে অপর অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন শহর পাে কোন কাজ জুটিয়ে নেন। তাহলে পড় দাম্পত্য জীবন ব্যাহত হয় না! আর দে করে অর্থ জমিয়ে দফায় দফায় সেমিস্টার সুবিধাও রয়েছে। জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়কে সর্বজন সুলভ করে লওয়া হয়েছে।

সাধারণ পাঠাগার ঃ—আরিজোনা রাজে ফিনিক্সের জনসংখ্যা ৭ লাখের কম হলে হ কাউনসিলে বা মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালি সাধারণ পাঠ্যগারটি দেখে তাক লেগে যায় এক ও উপরে দুই তলা চমৎকার আধুনিক স সুসজ্জিত বাড়ীতে এই পাঠাগার। ঢোকার ম

অন্ততঃ শ'দুয়েক গাড়ী বাইরে রয়েছে। পাঠক অথবা যাঁরা নিতে এসেছেন তাঁদের। ভিতরে গিয়ে দেখলাম বিভিন্ন বয়সের অন্ততঃ হাজার খানেক নর-নারী তন্ময় হয়ে পড়ছেন অথবা বই ফেরত দেওয়া অথবা নেওয়ার জন এসেছেন। বইএর সংখ্যা সম্ভবতঃ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে তুলনীয়। আর বই-এর শ্রেণী বিভাগ অনুসারে পড়ার হলও বিশ-পচিশটির কম হবে না। ভারতবর্ষসহ দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকার জন্যও একটি স্বতন্ত্র বিভাগ রয়েছে। এছাড়া রেকর্ড, টি,ভি, টেপ ফিল্মের জন্য আলাদা বিভাগ। শিশু সাহিত্যের বিভাগে নানারকম খেলনার মাঝখানে ছোটরা তাদের বই পড়ছে। প্রত্যেক বিভাগে দায়িত্বশীল সহায়ক রয়েছেন আগ্রহী পাঠককে আরও সাহায্য করার জন্য। লেখক ও গবেষকদের জন্য নামমাত্র ব্যয়ে (১০ সেণ্ট) দুর্লভ গ্রন্থ অথবা পত্রিকার জেরক্স অথবা মাইক্রোফিল্ম করে নেবার ব্যবস্থা রয়েছে। শহরের মধ্যেই এর ১০টি শাখা ও ভ্রাম্যমান বিভাগ আছে। নিঃশুল্ক এই পাঠাগারটির খরচ চলে সিটি কাউন্সিলের অনুদান ও সর্বসাধারণের দানে। শহরের স্বেচ্ছাসেবকেরা পালা করে পাঠাগারের বহু কাজ করে দেন। সানফ্রান্সিসিসকোতেও এমনি প্রথম শ্রেণীর সাধারণ পাঠাগার দেখেছি। আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই এমনি চমৎকার পাঠাগার আছে এবং নরনারীদের পাঠস্পৃহাও প্রবল। এত জ্ঞানপিপাসু জাতির উন্নতি কেউ আটকাতে পারে না।

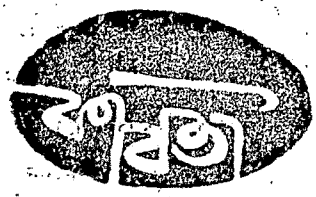

তানসেন

(১৫০৬—১৫৭৪)

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(১)

ছিলেন কাশীতে কথক ঠাকুর মুকুন্দরাম পাঁড়ে,
জীবিকার্জ্জন করিতেন তিনি সেথা কথকতা করি';
তাঁহার পুত্র রামতনু বটে বিখ্যাত তানসেন,
তানসেনকে শিষ্য করেন সুগায়ক হরিদাস।
কোনো এক প্রেমকুমারী ছিলেন সম্বামুনের মেয়ে,
তাঁর ইসলামী নাম হ'য়েছিল হোসেনী সবাই জানে,
তাঁকে তানসেন বিবাহ করিতে হলেন জাতিচ্যুত,
ইতিমধ্যেই বাপ-মাও তাঁর গিয়েছেন পরলোকে।

(২)

পৌরোহিত্য করেন বিবাহে এক মোছলেম পীর
তারপর তানসেনের নামটা হোলো আতা আলীখান;
গৌড়ীয় এক বামুনের ছেলে হ'লেন মুসলমান,
প্রেমের জন্য জাতিচ্যুতির ঘটনা সহে না মোর।
সঙ্গীতজ্ঞ গুরু হরিদাস তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার
দান ক'রে যান, সুর-সাধনায় খ্যাত হন তানসেন।
গুরুজীর কাছে দুইশো ধ্রুপদ শিখিলেন অবশেষে,
নাদসিদ্ধিও ঘটেছিল তাঁর সদা সাধনার ফলে।

(৩)

চার ছেলে আর একটি মেয়েও বাপের নিকটে পড়ে
নাদবিদ্যায় শিক্ষা লভিয়া করিল সিদ্ধিলাভ,
রেওয়ার রাজা শ্রীরাজারামের সভায় গায়ক এই
তানসেন অভিভূত করেছেন আকবর বাদ্‌শাকে।
আকবর তাঁকে দিল্লীতে নিয়ে গেলেন অতঃপর,
তাঁর রাজসভা তানসেন দ্বারা করেন অলঙ্কৃত;
সারাদিন গান শুনে বাদশার তৃপ্ত হোতো না প্রাণ,
মিশ্রী সিংও বীণা বাজাতেন বাদ্‌শার দরবারে।

(৪)

সরস্বতীর বিবাহ দিলেন মিশ্রী সিংহের সাথে,
তানসেনের এই বোবা মেয়ের নামটি সরস্বতী;
মিশ্রী সিংয়ের বিন্দুমাত্র কোনও দুঃখ নাই,
বাদ্‌শার কাছে তাঁর সমাদর বাড়িতে লাগিল ক্রমে।
সঙ্গীতে চার ছেলেও করিল পারদর্শিতা লাভ,
দরবারে তারা প্রথম গাহিয়া পেয়েছে হাজার টাকা,
প্রতিমাস পরে প্রত্যেকে পেতো পাঁচ শত টাকা করি'
অবসর নিয়ে তানসেন পান মাসিক হাজার টাকা'।

(৫)

সারাটা ভারতবর্ষে তাদের সুনাম ছড়ায়ে পড়ে,
পিতার যশের অংশ লভিয়া তারাও আদর পায়;
ধনের চাইতে মান বড় বটে, মানের চাইতে প্রাণ,
প্রাণের চেয়েও দেশ বড় হয়—গুণীরা সবার বড়।
কোথা তানসেন, বাদ্‌শা কোথায়, গুণগ্রাহীরা সব?
তাঁহাদের যশ, কীর্ত্তি এখনো ঘোষিতেছে ইতিহাস'
লোক চ'লে যায়, গুণ তবু রয়, গুণের হয় না
শেষ;—
পৃথিবীর 'পরে গুণীরা সদাই মৃত্যুকে করে জয়!

আমরা বাঙ্গালী

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

আমরা বাঙ্গালী একের ধ্বংসে অপরেতে খুশী হই,
আমরা বাঙ্গালী আত্মকলহে নিত্য মগ্ন হই।
একদা আমরা ভারতবর্ষে ছিলেম জাতির শ্রেষ্ঠ
সেই গরবের অপরাধে আজ আমরা অতি নিকৃষ্ট।
সেদিনেতে হায় ছিল না মোদের এতটুকু দূরদৃষ্টি
হঠিয়ে বিদেশী করেছিনু মোরা স্বাধীন ভারত সৃষ্টি।
ভাবিনিক হায় ইংরেজ গিয়ে ইংরেজ হবে রাজা
আমরা তাদের পদতলে রব অতি দরিদ্র প্রজা।
ভাবালুতাতে প্রাণ যায় শুধু মান থাকে নাকো কভু
সেদিনে সে কথা ছিলনাক মনে, তাই আজ দেখি
শুধু—
মরুভূমি আর মরীচিকা ঘোরে মৃত্যুদূতের মত
বিষ-নাগিনীর উদ্যত ফণা দংশিছে শত শত।
ছেলেরা মোদের ওদের কাছেতে শেষে রবে গৃহ-ভৃত্য?
বুঝি সে আনন্দে ওদের ভাষায়-গানে করে সদা নৃত্য?
মেয়েরা সকলে পেটের জ্বালায় দেখি যে ওদের কাছেতে
দেহ বিলাসিনি রূপ ধরা দেয় নিলাজ নগ্ন সাজেতে।
হ্যাঁ হ্যাঁ জানি আমি সকলেই নয়, বাকী কিছু বরপুত্র
আছে যারা, রয়ে গেছে ছাড়াছাড়ি ওদের প্রসাদপুষ্ট।
তারা সেথা আছে নিজের বংশ নিজের দলের টানতে
রসাতলে দেশ যায় যদি যাক কী হবে মিথ্যে ভাবিতে।
সেই ফাঁকে যেন আমরা সকলে রক্তচোষার মত
নিরীহ অপর ভায়ের শোণিত শুষে থাকি অবিরত।
তাতে যদি ক্ষুধা মেটে আমাদের কী আনন্দের কথা
কেন ভেবে মরি মিছিমিছি শুধু পরদুঃখের কথা।
আমাদের আজ কিছু নাই শুধু তাই এত হানাহানি
ঘৃণাভরে "ওই কাঙালী যে যায়"—ওরা করে
কানাকানি।
তবুও মোদের নাহিক লজ্জা নাহি ঘৃণা নাহি বোধ
জানিনে ক' কবে কে আসিবে আবার
করিবে এ ঋণ শোধ।
সেই দিন লাগি আজো বসে আছি স্তব্ধ মগ্ন হয়ে
যদি সে না আসে আসুক ধ্বংস তাও যাবো আমি সয়ে।
এই অনাচার আর তো পারিনে দেখিবারে আমি প্রভু
একসাথে যদি শেষ করে দাও মিটিবে কলংক তবু।
নয়তো জাতিরে বাঁচাও আবার নূতন প্রাণের ছটায়
দীন এ সেবক যাক ফিরে এক উজল দিনের আশায়।
আবার বাঙ্গালী জ্ঞানে ও গুণেতে উঠুক সর্বদিক
আবার বঙ্গালী —মহিমার গানে যাক ভরে চারিদিক।
শৃঙ্খলাবোধ সততায় গুণে শ্রেষ্ঠাঙ্কিত রয়

অলস স্বপ্ন

শান্তনু দে সরকার

আদর্শ এক জাতি বলে যেন আবার পূজিত হয়।
কখনো কখনো মনে হয় আমি কমলালেবুর দেশে,
প্রজাপতি হয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় একাকী বেড়াই ভেসে।
কখনো কখনো মনে হয় আমি সাগর পারের পাখি,
নীলীমার কোলে ডানা মেলে কোন্ অজানা সাথীরে
ডাকি
আবার কখনো মনে হয় আমি নদীর জলের ঢেউ,
কূলে কূলে শুধু কলতান রচি', সঙ্গিনী নেই কেউ!
যে পথে কখনো শোনে নাই কেউ, পথিকের পদধ্বনি,
মনে ভাবি আমি রেখে যাবো সেথা চরণচিহ্নখানি।
যদি আসে কোনো সন্ধানী কভু, আমারে খুঁজিয়া
পাবে,
পাখির কূজনে, নদী কলতানে, কূলেদের উৎসবে।

অমৃতস্য পুত্রা

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

আমি তোমাদের অমরত্ব দিতে পারি।
এসো কে চাও অমরতা
তোমরা অমর।
কিন্তু ভেবো না,
পরিবর্তন থেকেও তোমাদের
আমি রক্ষা করতে পারি।
গভীর দুঃখের সঙ্গে আমি বলছি ;
না ! আমি সে পারি না।
তোমরা শিশু ছিলে,
কিশোর-কিশোরী ছিলে
তরুণ ছিলে তরুণী ছিলে
তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ—এগিয়ে যাবে—
আরও এগিয়ে যাবে পরিবর্তন
বিবর্তন আবর্তন জন্মমৃত্যুর পথ ধরে
শুধু এগিয়ে যাবে—
বীজ থেকে ফলে।
ফল থেকে বীজে।
তোমাদের এ গতি—এই অগ্রগতি
চিরন্তন—অনিবার্য
তোমরা অমর অবিনশ্বর।

হারাধনের দশটি ছেলে

অনুপ ধাড়া

আমাদের পাড়ার হারাধন
বলল সেদিন, "শোনরে পটাই,
গাইছি না কোন সাফাই,
জানিস তো আমার দশটি ছেলে
তার একটাকে করবো আমি 'পেলে'।
দ্বিতীয়টিকে করবো আমি
সাঁতারেতে চীজ'
দেখবি ও হবেই একদিন 'মার্ক' স্পিজ।
তৃতীয়টিকে করবো আমি
টেনিসেতে পূরণ
একদিন ও হবেই হবে 'বর্গ' বরণ'।
চতুর্থটি হবেই আমার
বিশ্বের আর এক সোনা
দেখিস তোরা হবেই ও
আর এক 'রুভি হরতনা'।
পঞ্চমটিকে নিয়ে হয়েছেরে ফ্যাসাদ
বলছে ও হবেই নাকি হকির 'ধ্যানচাঁদ'।
ষষ্ঠটা ধরেছে বায়ন রে ভাই
হতে চায় ক্রিকেটে সুপারষ্টার
হবেই নাকি একদিন ঠিক
'ব্যাটমান' নয়তো 'গাভাসকার'।
দাবাড়ু হবে আমার সপ্তম ছেলে
'কারপভ'সমান হবে সে দাবা খেলে।
অষ্টমটিকে কি আর করি বল,
দেখছি ওর বড্ড হাতে জোর—
তাই ভাবছি করবো ওকে 'টম নয়তো 'হল'।
নবমটির চেহারা দেখছি হয়েছে বেশ পুরুষালী
তাইতো ভাবছি করবো ওকে 'মহম্মদ আলী',
দশমটিকে কি করবো পাই না ভেবে আর,
ভাবছি ওকে করবো আমি খেলার সমঝদার
ঠিক করেছি করবো ওকে
কোলকাতারই ফুটের সাপোর্টার।

মেঘদূত

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কবে কোন দিনে পথ চিনে চিনে
গিয়েছিলে তুমি অলকায়
হে বীর! তোমার জ্যোতির্মাল্য
কণ্ঠে বিজলী ঝলকায়।

অনাদিকালের রস-নির্ঝর
ঝরায়ে ভরালে এই চরাচর
রামগিরিপুরে দূর-পরবাসী
বেঁধেছিল বুক ভরসায়—
আজিও হে মেঘ! অনাদি যক্ষ
কাঁদে অনন্ত বেদনায়।

গগনে গগনে সেই ঘন-ঘটা
দ্রিংকি দ্রিমিকি মাদলের
সেই গুরু-গুরু হিয়া দুরু-দুরু
আর্দ্র নয়ন বাদলের—
অনতিকথিত ব্যথিত বিদায়
অধরে পরাণ সমাগতপ্রায়,
সিক্ত-সমিধ-দগ্ধ-ধূঁয়ায়
যজ্ঞতিলক বিরহের—
অলকাপুরীর সে-বিরহিণীর
নয়ন-গলিত কাজলের।

ছায়ায় ঘিরিল অম্বরতল
ব্যথায় ভরিল ধরাতল
বিশ্ববিরহী নয়ন-ধারায়
পাথার করিল ধারাজল।

জীমূতমন্দ্রে গভীর আরব
ছুটে নির্ঝরে গৈরিক স্রাব,
আঁখির তাড়িতে কৌতুকে নাচে
পেখম তুলিয়া শিখিদল,
শুভ্র উদার রূপসম্ভার
হাসিতে ফুটায় শতদল।

মেঘ দূত উৎসব
কলিকাতা সাহিত্যিক ও বঙ্গীয় কবি-সম্মেলন
চুম্বিয়া নিয়া ধরণীর রস
রসাল হয়েছো আপনি
রস সিঞ্চিয়া রিক্ত হয়েছো
সঞ্চিয়া কিছু রাখনি।

শুষ্ক সরসী করেছো সরস
অমৃতসিক্ত তোমার পরশ
শ্যামল জলদ শ্যাম সুধারস
সঞ্চারি দিলে লাবণি,—
মুকুলে ও ফুলে পুলকে বিবশ
তোমার প্রেয়সী ধরণী।

অজগরসম গরজে তটিনী
তীরবেগে বহে বারিধার,
পাটল পরাগ নব অনুরাগ
ছল ছল আঁখি কলিকার।

বিষাদ বাষ্প রুদ্ধ বেদনা—
উতল বাতাস কহিছে,—কেঁদনা,
তোলো মুখ তোলো, লাজময়ী ওলো!

মেঘদূত এলো বরষার,
জলভারাতুর জলদ মেদুর
বক্ষে মালিকা বলাকার।

গিরিশৈবাল-শষ্প উষীর-
বন্যভেষজ-পরিমল,
ধন্য হইল তৃণ শাদ্বল
শ্যামল হইল সমতল।

সুদূরোত্থিত ঊর্মির মত
অস্ফুট বাণী কহিছ সতত,
বন-লক্ষ্মীর নয়নযুগল
পুলকোজ্জ্বল ঢল ঢল্
হে মেঘ! তোমার বিজলী মাল্য
কণ্ঠে রহুক অচপল।

শ্রীধাম বৃন্দাবন কথা

কানাইলাল দত্ত

দানঘাটিতে এসে গোবর্ধন পরিক্রমা শেষ হয়। পথে মাধবেন্দ্র পুরীর ভজন স্থান—কদম্ব খণ্ড রয়েছে। কয়েকটি কুণ্ডও আছে। অনেকেই গোবর্ধন পরিক্রমান্তে পথিপার্শ্বস্থ আমবাগানে রাত কাটানো সুফলপ্রদ বলে মেনে থাকেন। পরদিন ভোরে আবার যাত্রা সুরু। যেতে হবে লাঠাবন। রাধাকৃষ্ণের দোললীলার অন্যতম পীঠস্থান গাঁঠুলি। সখীরা রাধাকৃষ্ণের গাঁঠছাড়া বেঁধে দিয়েছিলেন, তাই নাকি নাম হয়েছে গাঁঠুলি। লাঠাবনে অনেকে রাত্রি যাপন করেন। লাঠাবনের পর কাম্যবন। এরও দূরত্বটা অনেক, প্রায় ২৪ কি.মি.। একটানা এতটা পথ চলা কষ্টকর। সে জন্য মধ্যস্থলে অবস্থিত কেদার ও আদি বদ্রিতে বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে।

কাম্যবনে বৃন্দাদেবী অধিষ্ঠিতা। সাম্প্রদায়িক মুসলমান দস্যুদের হাত থেকে ব্রজমণ্ডলের বিগ্রহাদি রক্ষা করবার জন্য কোন এক সময়ে তাদের রাজপুতনায়, বিশেষ করে জয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃন্দাদেবী কিন্তু যেতে চাইলেন না। কাম্যবনে এসে তিনি তার অনিচ্ছা জানিয়ে দিলেন। তখন আর তো কোন উপায় নেই, সেখানেই তাকে প্রতিষ্ঠা করা হল, বৃন্দাবনে না হোক ব্রজমণ্ডলের মধ্যেই তিনি রয়ে গেলেন। জনশ্রুতি হল সনাতন গোস্বামী মদনমোহনের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবার পূর্বে বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। এখন সেই মন্দির বা বিগ্রহের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। বৃন্দা ছাড়া কাম্যবনের গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং চৌরাশী স্তম্ভের মন্দিরটি অবশ্য দর্শনীয়। কাম্যবন প্রদক্ষিণের পথে—সেতুবন্ধ, লুকোলুকি কুণ্ড, কামেশ্বর শিব, ভোজনস্থলী প্রভৃতি। ভোজনস্থলী কৃষ্ণের রম্য বনভোজনের স্থান। বিমলা কুণ্ড, চরণ পাহাড়ী, পিছল পাহাড়ী ও বোমাসুর চব্দাও দর্শনীয়ের তালিকায় স্থান পেয়েছে। কাছেই চরণ পাহাড়ী এক মহা বিস্ময়। এখানে বনজঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের পাথরের বুকে মানুষ ও পশু-পক্ষীর অসংখ্য চরণচিহ্ন বর্তমান। আমাদের যাত্রাপথে একাধিক 'চরণ পাহাড়ী' পড়ে। কিন্তু এত অধিক সংখ্যক চরণচিহ্ন আর কোথাও দেখা যায় না। এবার খদির বন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বকাসুর বধ করেছিলেন। অকুস্থলকে বকথরা বলে।

কাম্যবন থেকে আমরা যাব বরসজা। একদা ছিল বৃষভানু রাজার রাজধানী, এখন হয়েছে শ্রীজী অর্থাৎ রাধারাণীর নয়নাভিরাম মন্দির। সাধারণতঃ এই পথে পঞ্চম দিনে যাত্রীরা এখানে পৌঁছোন এবং একদিন অবস্থান করেন। বরসাজাকে এখন রীতিমত শহর বলা চলে। পাকা পথ, জলবাহী নল, বৈদ্যুতিক আলো আধুনিকতার ত্রিমূর্তিকে এখানে পাবেন। সরাসরি মথুরা থেকে বাসে আসেন অনেকেই। ব্রজ বা মথুরা মণ্ডলে এলে বরসাজা আসেন না এমন যাত্রী নেই বললেই চলে। অনেকের মতে এত সুন্দর মন্দির ব্রজমণ্ডলে বিরল। একটি সুউচ্চ টিলার সমতল শীর্ষদেশে রাধারাণীর মন্দিরটি যেমন সুন্দর বিগ্রহটিও তেমনি অপরূপ। রামলীলার দিন মন্দির দর্শন করেছিলাম। রাধারাণীকে দেখলাম রাজরাজেশ্বরী বেশে, বিশাল রৌপ্য সিংহাসনে আসীনা। সে দর্শনে অপার আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করেছিলাম। আমাদের দর্শনের সময় একদল বাঙ্গালী ভক্ত, তার মধ্যে প্যাণ্ট পরা লোকও অনেক, কপালে তিলক কেটে, গলায় মালা দুলিয়ে খোল-করতাল সহকারে মধুর কীর্তন করতে মন্দির অঙ্গনে প্রবেশ করলেন। তারা সমগ্র পথটাই পদব্রজে কীর্তন করতে করতে এসেছেন। ক্লান্ত মানুষের সেই কীর্তনও ঐ পরিবেশে অপূর্ব মনে হয়েছিল।

অনেকগুলি সিঁড়ি পেরিয়ে মন্দির চত্বরে উঠতে হয়। পদযাত্রা ক্লান্ত মানুষের পক্ষে কাজটা ক্লেশকরই হয়। কিন্তু উপরের মন্দির বিগ্রহ এবং দিগন্ত-বিস্তৃত প্রকৃতির আনন্দকর সমারোহে সে ক্লান্তি নিমেষেই দূর হয়ে যায়। একান্ত অক্ষম মানুষের জন্য মনুষ্যবাহী ডুলি আছে। উঠবার সময় তেমন খেয়াল না হলেও নামবার সময় পথের দু-ধারের নানা মন্দির চোখে পড়বে। পাণ্ডা-পুরোহিতেরা আপনাকে আহ্বান জানাবে। আপনিও দু-চারটি পয়সা দেবেন। আর আছে অসংখ্য ভিখারী। কে যে সত্যি-কার ভিখারী, কে মুফৎসে দুটো পয়সা আয় করে নিতে চাইছে তা বুঝবার উপায় নেই। সকলকেই কিছু কিছু দিন, চুকে যাক ল্যাঠা। নিচে নামতে নামতে একবার ভাল করে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন মন্দিরটা নতুন হলেও পুরানো একটা বাড়ির অবশেষ এখনও আছে। সেটা কত পুরাতন তা অবশ্য অনুমান সাপেক্ষ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাধনপ্রিয় ছিলেন। রাধারাণীও শৃঙ্গার-পটু ছিলেন। আর তিনি সে কাজে মোটেই অবহেলা করতেন না। তাঁর আলতা পরার জায়গাটার নাম হয়েছে আলতা পাহাড়ী। সেটিও ভক্তজনের প্রণম্য। এ ছাড়া কদম্ব বন, চিক শোলা, দেহ কুণ্ড প্রভৃতিও অনেকে দেখতে যান। বরসাজায় রাত কাটিয়ে পরের দিন নন্দগ্রাম বা নন্দগাঁও যাত্রা নন্দগাও মহারাজ নন্দের রাজধানী। এখানেও সরাসরি বাস আসে। বৃন্দাবন বা মথুরা থেকে যে যাত্রী বরসাজা আসেন তাদের সাধারণতঃ প্রথমে নন্দগ্রাম দেখিয়ে দেওয়া হয়। বাস রাস্তা থেকে খানিকটা ভেতরে আঁকা বাঁকা সরু গলি দিয়ে একটা টিলার শীর্ষদেশে নন্দ রাজার প্রাসাদ। সেটি এখন নন্দ বাবার মন্দির নামে খ্যাত। প্রশস্ত ছাদের উপর দাঁড়িয়ে দিগন্ত বিস্তৃত সুন্দর মাঠ দেখা যায়। হ্যাঁ, কৃষ্ণের বাল্যলীলার উপযুক্ত মাঠ বটে! পাণ্ডা-পুরোহিতেরা নানান দিকে আঙ্গুলি সঙ্কেত করে নানা নামের সঙ্গে কৃষ্ণের বিবিধ কীর্তির কথা মুখস্ত বলে চলেন। তারা জানেন যাত্রীদের সময় কম। যত বেশী বলা যাবে তত বেশী পয়সা হবে। সত্যি মিথ্যা নিয়ে কেউ তর্ক তোলেন না।

মন্দিরে কৃষ্ণ-বলরামের বিগ্রহের সঙ্গে আরও কয়েকটি মূর্তি। আমার কাছে সব বিগ্রহই প্রায় একই রকমের মনে হয়। পার্থক্য বুঝতে পারি কদাচিৎ। উৎসবের সময় ব্যাপারটা আরও শক্ত হয়ে পড়ে। বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য সাজ-সজ্জায় বিগ্রহ তখন ঢাকা পড়ে যান। পাশে জননী যশোদা ও নন্দরাজার মূর্তি রয়েছে। তার কোন সাজ পোষাক নেই জন্মাষ্টমী ও হোলীর সময় এখানে খুব ভিড় হয়। হোলীর উৎসবে নারীর ভূমিকাই মুখ্য, হোলীর দিন বরসাজা থেকে শ্রীরাধিকা সখীদের নিয়ে দলবদ্ধ ভাবে এক সঙ্গে হোলী খেলতে নন্দীগ্রাম এসেছিলেন বলেই বোধ হয় আজও বরসাজার নারীরা সেই আচারটি পালন করেন। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মতনই নন্দগ্রামের পুরুষেরা তেমনি দলবদ্ধ ভাবে পরের দিন বরসাজা যান। ব্যাপারটা দেখিনি। কিন্তু মনের চোখে দেখে এবং অন্তরে অনুভব করে খুব পুলকিত হয়েছিলাম।

বরসাজা থেকে নন্দগ্রাম আসার পথে প্রেম সরোবর এবং সঙ্কেত বট পড়ে। সঙ্কেত বটতলা রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনের স্থান। এখানে এখন একটি সাদামাঠা কোঠাবাড়ি নির্মিত হয়েছে। যাত্রী মাত্রেই এখানে একবার আসেন। পরিক্রমা-কালে মহাপ্রভুও এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। কাছেই নন্দীশ্বর মহাদেব। তারপর পারন সরোবর। বিশাখার পিতা পাবন আহিরের স্মৃতি বহন করছে এই সরোবরটি। সনাতন গোস্বামী এখানেই গোপালরূপী কৃষ্ণের দর্শন পেয়েছিলেন। নন্দগাঁও থেকে সামান্য দূরে কোকিল বন। তারই পাশে কৃষ্ণ ও গোপসখাদের চরণচিহ্ন সম্বন্বিত চরণ পাহাড়ী। আর কৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় বিহার স্থল শেষশায়ী। মহাপ্রভু এখানে নারায়ণ মূর্তি দর্শন করেছিলেন। এই স্থানে কৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকেও চতুর্ভুজ মূর্তি দেখান। কিছু দূরে প্রহ্লাদ কুণ্ড। সেখানে রাত্রিবাসের বিধান দেন অনেকে।

আয়ান ঘোষ তথা জটিলা কুটিলার বাড়ি যাবট এখান থেকে বেশী দূর নয়। পরিক্রমায় যাবট দর্শন অপরিহার্য নয়। তবে যান প্রায় সকলেই। জটিলা কুটিলা যত নিন্দিতই হোন না কেন তাদের প্রতি আকর্ষণবোধ প্রায় সর্বজনীন।

প্রহ্লাদ কুণ্ড থেকে যাত্রা করে যাত্রীরা শেরগড়ে পৌঁছান। এই শেরগড়েই কৃষ্ণের বাঁশীর সুরে মোহিত হয়ে যমুনা উজান বইতে সুরু করেন। অদূরে অক্ষয় বট ও চীরঘাট বর্তমান। বস্ত্রহরণের ঘাটের নামই চীর ঘাট। একমাসকাল ব্যাপী কাত্যায়নী ব্রত পালনের শেষ দিনে ব্যাপারটা ঘটে। শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার প্রার্থনা নিয়ে ব্রজবালিকারা কাত্যায়নী ব্রত সুরু করেন। যমুনা স্নান ব্রতের অন্যতম অঙ্গ। বালিকারা পরিধেয়গুলি ছেড়ে নগ্ন হয়েই স্নান করতেন। ব্রতের শেষ দিন তারা যখন স্নানে নেমেছেন কৃষ্ণ তখন কাপড়গুলি সরিয়ে নেন। ব্রজকুমারীরা তখন বালিকা মাত্র। এই বয়সেই তাদের কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা কত বেশী তা যাচাই করে নেবার জন্যই কৃষ্ণ এই কাজটি করেছিলেন। কৃষ্ণের বয়স তখন বছর ছয়েক মাত্র।

রাত্রে নন্দঘাটে বিশ্রাম। পরের দিন পাঠন গ্রাম যাত্রা। রাস্তা বেশ দীর্ঘ এবং পথে দর্শনীয় বিশেষ কিছু না থাকায় ক্লেশকরও বটে। এবার যমুনা অতিক্রম করে পশ্চিম তীরে যেতে হবে। পার হলেই ভদ্রবন। ভদ্রক বলেও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। এই বনে বসে শ্রীজীব গোস্বামীজী সুবিখ্যাত ভক্তি শাস্ত্র পরমার্থ সন্দর্ভ রচনা করেন। অতঃপর ভাণ্ডীর বন। কৃষ্ণের গোচারণ ভূমি ও মল্লক্রীড়া স্থল বলে এর বিশেষ গৌরব। শ্রীরাধিকা এখানে সুবলের বেশ ধরে কৃষ্ণ সমীপে আসেন। কৃষ্ণ তাঁকে সত্যি সত্যি কতটা ভালবাসেন তা নিয়ে তার মনে সন্দেহ ছিল! সে সন্দেহ নিরসনের জন্যই এই ছদ্মবেশ তথা গোয়েন্দাগিরি। কৃষ্ণ লুকিয়ে চুরিয়ে মধ্যে মধ্যে চন্দ্রাবলী প্রভৃতির কুঞ্জে রাত কাটাতেন। রাধিকার সখীরাও খুব দক্ষ গোয়েন্দা ছিলেন। তাদের কাছ থেকে এ লীলা গোপন রাখা প্রায়ই সম্ভব হত না। অনেক দিন হাতে-নাতে কৃষ্ণ ধরা পড়ে যেতেন। ধরা পড়ে যেতেন, না এই রকম ধরা দিতেন তা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। সে যাই হোক এই সব ব্যাপার-স্যাপারের জন্য শ্রীরাধিকার চিত্তে কিঞ্চিৎ সংশয় দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। রাধা কৃষ্ণ প্রেম লীলার এই সব মানবীয় দুর্বলতার অভিব্যক্তিতে আমরা পুলকিত হই, আমাদের পক্ষে রসাস্বাদন সহজ হয়।

আর একটা গোচারণ ভূমি—মাট বন। এই বনে একদিন লক্ষ গাভী চরে বেড়াত। অদূরে বেলবন। লক্ষ্মী দেবীর মন্দির আছে। লক্ষ্মী ঠাকরুণ ব্রজভূমিতে প্রবেশের অধিকার পান নি। ব্রজলীলা দেখার বাসনা নিয়ে এখানেই অবস্থান করেন। কৃষ্ণ তাকে গোপীদের স্মরণ ও সাহায্য নিতে বলেন। কেননা বৃন্দাবনে গোপী সেবা না করে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। লক্ষ্মী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে কথায়। বেদনার্ত চিত্তে ব্যর্থতা মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু গোপী সেবা করে মর্যাদা খোয়াতে স্বীকৃত হন নি। ঘটনাটি সে দিনের শ্রেণী সংগ্রামের প্রতীক। আমরাও সবে জড়িয়ে পড়ি নি। দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীদেবীর সুন্দর মূর্তি স্থাপন করে পাশে একটি গোপাল বিগ্রহ বসিয়ে দিয়েছি। ঝগড়াঝাটি যা করার তা তোমরা কর, আমরা ও সবের মধ্যে নেই।

স্থানটি বৃন্দাবনের অপরপারে। শ্রীবন নামেও উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রী ও বিল্ব একই কথা। আমাদের দেশে বেলকে শ্রীফলও বলে। কাছেই আর একটি কাব্যময় স্থান মান সরোবর। শ্রীরাধিকা খুবই অভিমানিনী ছিলেন। অভিমানের জ্বালায় নিজে কেঁদেছেন, অপরকে কাঁদিয়েছেন। সেই অশ্রুজলে সৃষ্ট পরম রমনীয় তথা রোমাণ্টিক সরোবরকে অবশ্যই মান সরোবর বলতে হবে। মান অভিমানের পালা শেষ হবার নয়, তা চলতে থাকুক। মানময়ী রাধারাণী মন্দিরে প্রণাম করে এগিয়ে চলি পানি গাঁ।

পানিগাঁ দুর্বাশা মুনির আতিথ্য স্থল। ব্রজমণ্ডলই বোধ হয় একমাত্র স্থান যেখানে দুর্বাসা ঠাকুরের ক্রোধাগ্নি প্রশমিত ছিল। প্রেমের রাজত্বে অভিমান করা যেতে পারে কিন্তু ক্রোধ নৈব নৈব চ। পরের বনটির নাম লৌহবন। কৃষ্ণ কর্তৃক লৌহাসুর বধের স্থান। তারপরেই শ্রীরাধিকার জন্মভূমি রাভেল গ্রাম। বৃষভানু রাজার প্রাচীন রাজধানী। শ্রীরাধিকার মন্দির আছে। রাভেলের অনতিদূরে বলদেবের মন্দির শোভিত বলদেব গ্রাম। পাশেই ক্ষীর সাগর। এর পর যেতে হবে মহাবন। মহাবনকে পুরাতন গোকুলও বলা হয়। নন্দরাজার প্রাচীন বাসভবন। কৃষ্ণকে কংস কারাগার থেকে প্রথমে এখানে এনেই যশোদার কোলে তুলে দেওয়া হয়। সুতরাং সর্বত্রই কৃষ্ণ-স্মৃতি

বিজড়িত নানা উল্লেখযোগ্য স্থান রয়েছে। ধন্যা জননী যশোদা। এইখানেই শিশু কৃষ্ণের ব্যাদিত মুখে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন। ছ-ক্রোশের মধ্যে যত গাছপালা সব নির্মূল করে পূতনার প্রাণ-হীন দেহ যে স্থানটিতে পড়েছিল সেই রমনরেতিও বেশী দূরে নয়। মহাবন ও সন্নিহিত অঞ্চলে তৃণাবর্ত বধ, শকট ভঞ্জন, যমলার্জুন উদ্ধার প্রভৃতি স্থানগুলি বর্তমান রয়েছে। মথুরার পরপারে আর একটা স্থানকে গোকুল বলা হয়। সেটাও পরিক্রমা পথে পড়ে। কংসের আদেশে কৃষ্ণ বলরামকে মথুরার ধনুর্যজ্ঞে নিয়ে যাবার জন্য মহাত্মা অক্রুর এই গোকুলেই এসেছিলেন। নিরাপত্তার অভাববোধ হওয়ায় শঙ্কিত নন্দরাজ পরে গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবন চলে যান। আজও গোকুলের সেই পরিত্যক্ত দশাটাই দৃষ্ট হয়। মথুরা থেকে মাত্র দশ কি. মি. এই গোকুল। নিয়মিত যাত্রী বাস চলাচল করে। তাই পরিক্রমার দলভুক্ত না হয়েও অনেক তীর্থযাত্রী বাসে করে গোকুল দর্শনে আসেন। এই গোকুলেই দেবকী গর্ভে যোগমায়া কন্যারূপে জন্ম নেন। সে কথা আমরা ভুলি নি। যোগমায়ার মন্দির করেছি। কংস যোগমায়াকে পাথরে আছড়ে মারতে গেলে তিনি শেষমেশ শঙ্খচিল হয়ে উড়ে যান। তাই শঙ্খচিল দেখলেও আমরা প্রণাম করি। তবে যাবার আগে তিনি কংসকে বলে গিয়েছিলেন— তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। ষতিপুরের গোকুলনাথজীর একটি সুন্দর মন্দির আছে। তথাকার অন্নকূট মহোৎসব বা ৫৬ ভোগ খুবই মনোরম উৎসব।

গোকুলের সঙ্গে জাতীয় গৌরবের একটা কাহিনী যুক্ত আছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ মারামারির ব্যাপারে গৌরব করবার মত তেমন কিছু আমাদের নেই। মুষ্টিমেয় বিদেশী লুঠেরা একপ্রকার বিনা বাধায় সমগ্র উত্তর ভারতটাকে তছনছ করে দিয়েছে বহুবার। অগাধ ধন সম্পত্তি লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে পিশাচেরা দেবমন্দির কলুষিত করত, রমনীদের পণ্যের মত ব্যবহার করত। ভারতীয়দের শৌর্য-বীর্যের অভাব কিম্বা যুদ্ধাদিতে স্বাভাবিক অনীহা অথবা ভিক্ষু (বৌদ্ধ) ও বৈষ্ণব জীবনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ঠিক কোন কারণে এমন একটা করুণ অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তা জানি না। তবে এই গোকুলের চার হাজার নাগা সন্ন্যাসী কেবল মাত্র ত্রিশূল আর চিমটে সম্বল করে আহমদ শা আবদালির ছ হাজার সুশিক্ষিত মুসলমান সৈন্যকে হত্যা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। আহমদ্ শা আবদালি পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। এই নৃশংস ব্যক্তিটি দিল্লী থেকে মথুরা পর্যন্ত অবাধে লুঠ-তরাজ ও নরহত্যা করেছেন। একমাত্র বৃন্দাবনেই সে দশ হাজারের মত নিরস্ত্র তীর্থযাত্রীকে হত্যা করেছিল।

দুর্যোগের রাত্রে কংস কারাগার থেকে গোকুল আনবার সময় কৃষ্ণ যমুনার জলে পড়ে যান। এই ভাবে কৃষ্ণকে যমুনা কোলে নিলেন। সে স্থানটিতে জলস্রোত পরিবর্তিত হয়ে অন্য খাতে প্রবাহিত হয়। এর পরিণতিতে যে ভূমিখণ্ড গঠিত হয়েছে তার নাম দিয়েছি কোল গ্রাম। কাহিনীটির মাধুর্যে হৃদয় দ্রবীভূত হয়। নিকটে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট। এখানে মৃত্তিকা ভক্ষনের ছলে মা যশোদাকে কৃষ্ণ দ্বিতীয়বার বিশ্বরূপ দেখান। ব্রহ্মাণ্ডঘাট ব্রজ মণ্ডলের সুন্দর ঘাটগুলির অন্যতম। আমরা পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে ফেলেছি। গোকুলে যমুনা অতিক্রম করে ভূতেশ্বর হয়ে বৃন্দাবন ফিরে যাব। পরিক্রমার প্রথম ঘাঁটি ভূতেশ্বর এবং শেষে বিন্দু ভূতেশ্বর। ভূতেশ্বরে আসার পথে অক্রুর ঘাটে মহাদেব ও শীতলা দর্শন প্রশস্ত। ব্রজমণ্ডলে রাধাকৃষ্ণের উজ্জ্বলতায় অন্যান্য দেবদেবীকে কিঞ্চিৎ অনুজ্জ্বলই মনে হবে।

মাপজোপ করলে পরিক্রমার পথটি ৮৪ ক্রোশ হবে না। কিন্তু পথে পথে অজস্র কৃষ্ণময় জায়গা আছে সে সব স্থানে সচরাচর যাত্রীরা যান না। কেউ কেউ আবার যানও। সবগুলি বিন্দুকে যদি পরিক্রমার আওতায় আনা যায় তা হলে ৮৪ ক্রোশ হওয়া বিচিত্র নয়। ৮৪ লক্ষ জন্মের পর মানুষ জন্ম এবং ৮৪ লক্ষ মানুষ জন্মের পর মুক্তি। ৮৪ সংখ্যার একটা তাৎপর্য তাই অনস্বীকার্য।

পরিক্রমার দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরের লীলা আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রভাব খুব। সেই প্রভাবে হতাশা ও সন্দেহ দূর করতে সাহায্য করে। হতাশ

হওয়া আর নাস্তিক হওয়াতে কোন তফাৎ নেই। এ জন্য পরিক্রমার অন্য পুণ্য ফল কিছু থাক বা না থাক, এ মানুষকে আস্তিক এবং সংশয়হীন হতে বিপুল ভাবে সাহায্য করে। পরিক্রমান্তে ভক্ত ভগবান আর ভাগবত অভিন্ন হয়ে ওঠেন। বেদ বলেছেন চরৈবেতি —চলতে থাক। জীবন মানেও তো এই এগিয়ে চলা, ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে চলা। প্রেম ও ভক্তির দুই শাখায় ভর করে ধর্মের প্রাণস্বরূপ আচার পালনের দ্বারা এগিয়ে চললে কোন এক সময় আমরা শ্রীভগবানের চরণে পৌঁছোবার আশা করতে পারি। বসে থাকলে অদৃষ্টও বসে থাকবে। অতএব চলতে থাক। চরৈবেতি।

যাত্রাপথের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী স্থানে স্থানে সত্যই অতুলনীয়। ঠিক বর্ষার শেষে এই পরিক্রমা সুরু হয় বলে শ্যামল বনভূমি রূপ যৌবনে ভরপুর ও মনোরম থাকে। সারাটা পথে বিচিত্র বর্ণের নানা পাখী ও ময়ূরের দর্শন মেলে। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত প্রচুর হরিণও দেখা যেত। আমাদের চোখে একটাও হরিণ পড়ে নি। বানর হনুমান আমরা আমেরিকা পাঠিয়ে বিস্ময়কর ভাবে কমিয়ে ফেলেছি।

বৃন্দাবনও ব্রজমণ্ডলের অন্যতম বন বলে গ্রাহ্য। বৃন্দাবন শহরের বুকে খানিকটা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে একটা বনভূমিকে রক্ষা করা হচ্ছে। নিধুবন— আয়তন তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। একরকম ঝোপ ঝোপ গাছে ভরা। ভেতরে মানুষ চলাচলের জন্য পায়ে হাঁটা পাকা পথ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। ভক্ত জনেরা বিশ্বাস করেন এই বনে এখনও গভীর রাত্রে রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। উচ্চ কোটির মহাত্মা সাধকেরা অনেকে তা দেখেছেনও। বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধারানী। ছোট্ট একটি মন্দিরে শ্রীরাধিকা পূজিতা হন। সামান্য দূরে ললিতা কুণ্ড। সুন্দর করে ইঁট বাঁধানো ছোট জলাধার। জল নোংরা। ললিতা বিশখাদি সখীকুলের সানন্দ সহযোগিতা ছাড়া রাধাকৃষ্ণ লীলার কথা ভাবা যায় না। সখীরা সর্বদাই নেপথ্যে থেকেছেন। বিষয়টার প্রতি চৈতন্য চরিতামৃতকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি লিখেছেন—

সখির স্বভাব এক অকথ্য কথন
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় নাহি সখির মন
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়
নিজ কেলি হইতে তাহে কোটি সুখ পায়
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম কল্পলতা
সখিগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥

নিধুবনে সামান্য কিছু পাখী ও প্রচুর বানর আছে। দর্শনার্থীরা যাবার সময় ছোলা ভাজা কিনে নিয়ে বানরদের দেন। দশ-বিশ পয়সার ছোলা ভাজার বিনিময়ে নিধুবন দর্শন নির্বিঘ্ন হয় বলে অনেকে বিশ্বাস করেন।

এখন আমরা বৃন্দাবনের কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির মাত্র দর্শন করে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। বৃন্দাবনের সব মন্দির দেখা সম্ভবপর নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে প্রতিটি গৃহই মন্দির। এমন গৃহ খুব কম আছে যেখানে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত নেই বা সেবা পূজার আয়োজন হয় না। সে জন্যই অপেক্ষাকৃত ঐতিহ্যশালী প্রাচীন কয়েকটি মন্দিরের কথায় আমরা সীমাবদ্ধ থাকব। কিন্তু আসল কথায় আসবার পূর্বে একটি বিষয়ের উল্লেখ মাত্র প্রয়োজন। বৃন্দাবনের কোন মন্দিরে অব্রাহ্মণ পুরোহিত দেখি নি। অথচ বৈষ্ণব সমাজে জাতিভেদ নেই। বিষয়টি একটি উত্তরহীন জিজ্ঞাসা হয়েই আছে আমার নিকট। দ্বিতীয় বিষয়টি দুর্বোধ্য থেকে গেছে। অনেক বৈষ্ণবই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঙ্গে নারায়নের পূজাও করেন। এইটুকুমাত্র দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু আগে নারায়ণের পূজা না কৃষ্ণের পূজা হবে তা নিয়ে তাকের মধ্যে মত পার্থক্যের যুক্তিসিদ্ধ কারণ অনুধাবন করতে পারি নি।

বৃন্দাবনের প্রাচীন মন্দিরগুলি প্রায় সবই মহাপ্রভু প্রেরিত গোস্বামীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবন প্রকটকারী ষড় গোঁসাইয়ের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তন্মধ্যে রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় তাঁরই নির্দেশে বৃন্দাবন আসেন। সুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধারের পর তাঁরাই যে সব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন সেগুলিকেই সাধারণ ভাবে আমরা বৃন্দাবনের প্রাচীন মন্দির বলে চিহ্নিত করেছি। প্রতি-

কূল পরিবেশে যাদের অনন্যসাধারণ যত্নে এবং অপরিসীম শারীরিক ক্লেশ স্বীকারের ফলে সুপ্ত বৃন্দাবন আবার জাগ্রত হয়েছে, নতুন করে মন্দির ও বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত, এক কথায় কৃষ্ণ ভক্তির চর্চা সুরু হয়েছে তাদের সাধনা ও জীবনের কথা আমরা সামান্যই জানি। বৈষ্ণব মহাজনেরা প্রতিষ্ঠাকে 'শূকরী বিষ্ঠার' ন্যায় ত্যাজ্য বিবেচনা করতেন বলেই তাদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য দুর্লভ। দু চার কথা যা নানা সূত্র থেকে জানা যায় তার কিছু প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে পাঠকের নিকট নিবেদন করব। আমাদের নিজেদের একথাগুলি প্রয়োজনে জানা দরকার।

মহাপ্রভুর সমকালে মীরাবাঈ, তুলসীদাস প্রভৃতি ভক্ত সাধক আমাদের দেশে আবির্ভূত হন। ফলে অধিকাংশ মুসলমান শাসকের সাম্প্রদায়িক ও আগ্রাসী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও ঐ সময়টায় সমগ্র দেশে একটা অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। এও এক প্রকার রেনেসাঁ বা নবজাগরণের কাল। মহাপ্রভু দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন সমাজের সর্বস্তরের জনচিত্তে কৃষ্ণ-প্রেম ধর্মকে সঞ্চারিত করতে না পারলে আমরা সত্যকার শক্তিশালী হতে পারব না। এর জন্যই বৃন্দাবন প্রকট করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। দেশের অন্যান্য প্রান্তেও নানা সন্তজনের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আকারে একই ভাবনার বিকাশ ঘটেছিল।

শ্রীরূপ, সনাতন এবং জীব গোস্বামী একই পরিবারের মানুষ। রূপ ও সনাতন সহোদর ভাই। জীব তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইহারা কর্ণাটক, ব্রাহ্মণ। পাঁচ পুরুষ (জীব থেকে হিসেব করে) পূর্বে পরিবারটি কর্ণাটক ত্যাগ করে বর্ধমানে বসতি স্থাপন করেন। কিছুকাল পরে বর্ধমান ছেড়ে বরিশাল যান। রূপ-সনাতনের পিতৃদেব কুমার দেবরায় বরিশাল ছেড়ে গৌড়ের মাধাইপুরে এসে নতুন বাসভবন নির্মাণ করেন। তাঁর তিন ছেলে। প্রথম পুত্র অমর, সনাতন নামে ভারত বিখ্যাত। দ্বিতীয় সন্তোষ রূপ নামে খ্যাত। তৃতীয় ছিলেন বল্লভ। তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। তারই পুত্র শ্রীজীব।

সনাতন সংসার জীবনে নবদ্বীপের নবাব হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। নবাব তার নতুন নামকরণ করেন সাকর মল্লিক। মুসলমান নবাবের অধীনে হিন্দু নামে কাজ করা সে দিন সম্ভব ছিল না বোধ হয়। রূপ এখানেই উপপ্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নবাবী দপ্তরে রূপের নাম হয়েছিল দাবির খাশা। রূপ কাজকর্ম ছেড়ে আচমকা পালিয়ে বৃন্দাবন চলে আসায় হুসেন শা অখুসি হন এবং তা নিয়ে সনাতনকে বেশ অসুবিধায় পড়তে [illegible] কিন্তু ঈশ্বরের আহ্বান যারা একবার শুনেছেন তাদের আটকে রাখবে কে? সনাতনও অচিরে একদিন বৃন্দাবন চলে যাবার বাসনা প্রকাশ করেন। নবাব তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে সনাতনকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগার তাকে বেশী দিন আটকে রাখতে পারে নি। তিনি পালিয়ে একরকম নিঃসম্বল অবস্থায় বৃন্দাবনে গিয়ে রূপের সঙ্গে মিলিত হলেন। পথে কাশীতে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়ীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এখানে তিনি কিছুদিন অবস্থান করে মহাপ্রভুর নিকট প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ করেন। সুপ্ত বৃন্দাবন তথা শাস্ত্রাদির প্রকটিকরণের গুরু দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত শিক্ষা ও শক্তি স্বয়ং মহাপ্রভুর নিকট থেকে লাভ করার পর সনাতন কাশী থেকে সরাসরি বৃন্দাবন চলে আসেন এবং অবিলম্বে নির্দিষ্ট কর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

বৃন্দাবনে এসে সনাতন বৃন্দাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে কঠোর সাধন-ভজনের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করতে ব্রতী হন। ভিক্ষালব্ধ অন্নে কোন রকমে জীবন ধারণ করতেন। ভিক্ষার জন্য তাকে মথুরায় যেতে হত। সেখানে এক ব্রজনারীর নিকট থেকে সনাতন মদনমোহন বিগ্রহটি পান। ঐ মহিলা বিগ্রহের জন্য পৃথক কোন সেবার আয়োজন করতেন না। পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে মদনমোহনকেও পাশে বসিয়ে খাওয়াতেন। সনাতন একদিন এই মদনমোহনের প্রসাদ পান। পরে স্বপ্নে দেখেন মদনমোহন তাকে বৃন্দাবন এনে সেবা করতে বলছেন। সনাতন তখন ভিক্ষাজীবী এবং বৃক্ষতলবাসী। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও সেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার সামর্থ তার নেই। সুতরাং

তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী হন নি। কিন্তু মদন-মোহনকে ভুলবেন কি করে? তিনি যে সনাতনের নিকট আসতে বদ্ধপরিকর। একদিন ভিক্ষা করতে গিয়ে সনাতন মদনমোহন বিগ্রহের অধিকারী ব্রজজননীকে স্বপ্ন বৃত্তান্তটি জানালেন। ভক্তিমতী সেই নারী চোখের জলের সাথে বিগ্রহটি সনাতনের হাতে তুলে দিলেন। তখন তো আর কোন উপায় নেই। একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। কালীদহের নিকট দুঃশাসন টিলার উপর গাছের তলায় সনাতন মদনমোহনকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কথিত আছে—এই বিগ্রহ সনাতনের সঙ্গে মানুষের মত কথাবার্তা বলতেন।

সনাতন একদিন অতুল ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আজ তিনি নিঃস্ব এবং ভিক্ষাজীবী ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করবেন বলে স্বেচ্ছায় এই জীবন বরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু মদনমোহনের সেবায় শাকের সঙ্গে নুনটুকুও অনেকদিন জুটত না বলে তার মনে বোধ হয় ক্ষোভের সঞ্চার হয়ে থাকবে। মদনমোহন একদিন সনাতনকে বললেন—আলুনি শাক খেতে তার কষ্ট হয়, সনাতন যেন একটু নুনের ব্যবস্থা করেন। সনাতনের অভিমানে আঘাত লাগে। তিনি সাফ জবাব দিলেন—"নুন আমি ভিক্ষা করিতে পারিব না। যদি অত ভাল মন্দ খাইবার ইচ্ছা হয় তবে আমার মত হতভাগার কাছে কেন স্বেচ্ছায় আসিলে? আজ তুমি চাহিবে লবণ, কাল শাকসব্জী, পরশু ঘি, দুধ মাখন। ভিখারী আমি কোথায় পাইব তোমার রাজভোগ? যদি তোমার রাজসেবার আকাঙ্খা থাকে তবে নিজেই বন্দোবস্ত করিয়া লও।"

ক্রমশঃ

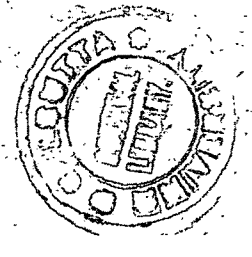

চক্ষুশূল

জমিদার রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একখানি কৌতূহলোদ্দীপক পুস্তক (বিশ্বভারতী ১৯৭৬) রচনা ও প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য ও নানা তথ্যপূর্ণ হলেও তার মধ্যকার একটি উক্তি প্রতিবাদযোগ্য। গ্রন্থকার তাঁর উক্ত পুস্তকের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হয়েও রবীন্দ্রনাথ গোপীনাথের সেবা করতেন। রথীন্দ্রনাথ নববধূসহ শিলাইদহে এলে তাঁকে সর্বাগ্রে গোপীনাথ মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিগ্রহের আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল।"

শ্রীচৌধুরীকে আমি চিঠি দিয়ে বিষয়টীর তথ্য সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলাম, তার উত্তরে তিনি আমাকে (তাং ২৩।৩।৭৯) লিখেছেন—"আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি আপনার চিঠিতে আমার কাছে যা জানতে চেয়েছেন সেই বিষয়ে জানাচ্ছি যে ঐ তথ্য আমি পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের প্রজা ও শিলাইদহের অধিবাসী শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর কাছে দ্রষ্টব্য তাঁর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ'।"

আমি শচীন্দ্রনাথের 'রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ' পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পড়েছি। তাতে কোথাও ঐরূপ কথা নেই। প্রমাণস্বরূপ আমার যুক্তি ও পুস্তকটী থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল ঃ

প্রথমতঃ শিলাইদহের জমিদারীর একটু ইতিহাস দেওয়া প্রয়োজন এবং 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' থেকেই তা উদ্ধৃত করছি। শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেছেন—"এইখানে প্রসঙ্গত কিছু কথা বলা আবশ্যক। শিলাইদহ ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির অধিষ্ঠাতা দেববিগ্রহ গোপীনাথজির সেবাপূজা পরিচালিত করতেন ঠাকুর জমিদার সেবাইত সূত্রে। (পৃঃ ৩৫১)। ..."রাণী ভবানীর পুত্র (নাটোরের রাণীর পুত্র) রাজা রামজীবন সেবাইতরূপে গোপীনাথের সেবা, পূজা, উৎসবাদি চালাতে লাগলেন" (পৃঃ ৩৭৪)..... ক্রমে রামজীবনের জমিদারী নিলামে উঠলে বিরাহিমপুর পরগণা আর গোপীনাথের দেবত্তর সম্পত্তি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর খরিদ করে সেবাইত সূত্রে কল্যাণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহদ্বয়ের পূজার্চনা চালাতে থাকেন। গোপীনাথের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী ঐ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথের সময়েই (অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের জমিদারী দেখাশুনা কালে) এই প্রসিদ্ধ দেবমন্দির ও ভবনের সংস্কার করা হয়েছিল (পৃঃ ৩৭৪)।

....."ঠাকুরবাবুরা ব্রাহ্মসমাজের হলেও ঐ বাবদ বার্ষিক তিন হাজার টাকা দিতেন; বিগ্রহের বার্ষিক দেবোত্তরের আয় ছিল মাত্র এক হাজার টাকা। দীঘির ও মেলার আয়ে মন্দিরাদি মেরামতে খরচ হত। গোপীনাথের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের কারুকার্যময় ইট দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ীর সিংহদরজা তৈরী করে দেন (নহবৎখানা সহ) এলম্‌হার্স্ট সাহেবের প্ল্যান অনুসারে।" (পৃঃ ৩৭৪)

"ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হয়েও ঠাকুর বাবুরা স্থানীয় হিন্দু জনসাধারণের অধিষ্ঠাতা দেবতার সেবাপূজা অনুষ্ঠানাদির যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন।.....বিবাহাদি প্রত্যেক অনুষ্ঠানে হিন্দু জনসাধারণ আজও গোপীনাথের চরণামৃত গ্রহণ করে থাকেন।" (পৃঃ ৩৭৫)

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে শিলাইদহের জমিদারী

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ক্রয় করেন এবং উত্তরাধিকারসূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও মহর্ষির অন্যান্য সন্তানেরা লাভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পরও শিলাইদহের জমিদার ছিলেন এবং তখনও গোপীনাথের সেবাকার্য ঠাকুর জমিদারদের দ্বারাই পরিচালিত হত। এর দ্বারা কি বলা যাবে যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ব্রাহ্ম' হয়েও 'গোপীনাথ বিগ্রহের' সেবা করতেন? এমন সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। কেননা জমিদারী ক্রয়ের পর যা কর্তব্য ছিল, তা তাঁদের পরিচালন-দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, তাঁদের ব্যক্তিগত ধর্মমত যাই হোক না কেন। অনুরূপ ভাবে রবীন্দ্রনাথও জমিদার হিসাবে তাঁর কর্তব্য করে গেছেন। তার বেশী কিছু নয়। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ধর্মবোধের কোন সম্পর্ক নেই। জমিদারী সূত্রে তিনি যে কর্তব্য করে গেছেন, তার থেকে তাঁকে মূর্তিপূজক ভাবলে সত্যের অপলাপ হয়। বর্তমানে ভারতের নানা রাজ্যে ভারত সরকার বিভিন্ন মন্দিরের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তার অর্থ কি, যাঁরা সরকার পরিচালনা করছেন, তাঁরা ঐ সমস্ত মন্দিরের বিগ্রহের সেবা করছেন? এটা হল secularism-এর এক বিশেষ রূপ ও ব্যবস্থা। তেমনি ঠাকুর পরিবারের লোকেরা রবীন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্ম হয়েও' তাঁদের secular দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। যে সময়ের কথা 'শিলাইদহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে, সে সময়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ধর্মমত স্পষ্ট-জানতে পারা যায় তাঁর তৎকালীন লিখিত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে। অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত সমসাময়িক এক পত্রে (১৯০৯) রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—".....আমাদের আশ্রমেও যদি ভূমা স্থান না পান—সেখানেও যদি সাময়িক বারোয়ারির ক্ষণকালস্থায়ী মৃন্ময় দেবতার পূজার মতোই সঞ্চারিত হয় তাহলে আশ্রমধর্ম পীড়িত হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই সাময়িক নেশায় ভোর হয়ে আছি—সেই জন্যে ৩০শে আশ্বিনের মতো দেশব্যাপী উন্মত্ততার দিনে নিত্য সত্যকে অবজ্ঞা করার আশঙ্কা আছে—সেই জন্যই আমি বারবার করে তোমাদের সতর্ক করতে চাই। যা শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম, যা সত্যতম তার থেকে লক্ষ্য কোনো কারণেই কোনোমতেই ফেরাতে দিও না। যদি লোকের কর্ণ বধির হয় তবু সত্যের মন্ত্রই শোনাতে হবে—অন্তত আমাদের আশ্রমে বেসুর না বাজে, যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং তাঁকে যেন কোনোদিনই কোনমতেই আমরা না ভুলি—তাঁর চেয়ে আর কাউকে আমরা যেন বড়ো করে না তুলি। সেদিন তোমরা ছেলেদের ডেকে ভারতবর্ষের সকলের বড়ো যে-বাণী তাই শুনিয়ে দিয়ো। সেদিন সংযম পালন যখন হচ্ছে তখন সেই সংযমের উপযোগী সাধনাও যেন অবলম্বন করা হয়—এই তোমাদের সকলের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ।"

রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ ছিল 'শান্তং শিবমদ্বৈতং' যা ব্রাহ্মসমাজের নিত্য উপাসনার মন্ত্র ও ভারতীয় উপনিষদের বাণী। সমসাময়িক রচনা 'গীতাঞ্জলী' ও 'গোরা'তেও রবীন্দ্রনাথের উদার ধর্মমতের পরিচয় পাওয়া যায়। পারিবারিক ব্যাপারেও তিনি সংস্কারমুক্ত ছিলেন। তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দেন প্রতিমা দেবীর সঙ্গে ১৪ই মাঘ, ১৩১৬ সালে। এসময় রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার তাঁর কনিষ্ঠ জামাইকে লিখছেন—"বিবাহটি বিধবাবিবাহ হয়েছে ভাও বোধহয় শুনেছ।" এই বিবাহ হয়েছিল (শালগ্রাম শিলা ছাড়া) ব্রহ্মমতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক সব অনুষ্ঠানেই মহর্ষি প্রদর্শিত বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা সম্পন্ন করা হত, তাতে কোনো বিগ্রহের স্থান ছিল না। দ্বারকানাথের সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে বাৎসরিক দুর্গাপূজা হত, কিন্তু দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর যখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, তখন থেকেই ঠাকুরবাড়ীতে তিনি বাৎসরিক দুর্গাপূজা বন্ধ করে দেন। দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ধর্মীয় ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা ছাড়া কোন প্রতীক বা শালগ্রাম শিলা ইত্যাদি রাখা হত না। রবীন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকেই নিরাকার ব্রাহ্মোপাসনার মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেছিলেন, তিনি প্রতীকোপাসনা কোনোদিনই করেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনও অপরের ধর্মমতে বা ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি অপরের ধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন, তা তাঁর

পুত্র, কন্যা বা যে কারোর ধর্মমতই হোক না কেন।

শ্রীচৌধুরী লিখেছেন—"রথীন্দ্রনাথ নববধূসহ শিলাইদহে এলে তাঁকে সর্বাগ্রে গোপীনাথ মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিগ্রহের আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল।"

এ প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর পুস্তকে আছে—"কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ নববধূসহ শিলাইদহে এসে প্রথমেই গোপীনাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন।" শ্রীঅধিকারীর এই বক্তব্যও নির্বিবাদে মেনে নিতে পারা যায় না। তবু শ্রীঅধিকারীর সিদ্ধান্তের সঙ্গে শ্রীচৌধুরীর উক্তি সর্বাংশে মেলে না। শ্রীচৌধুরী লিখেছেন—"গোপীনাথ মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিগ্রহের আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছিল।" এ উক্তিটির বিপরীত কথা কিন্তু শ্রীঅধিকারী লিখেছেন—রথীন্দ্রনাথ নিজেই গিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। যদি রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে গোপীনাথ মন্দিরে নিয়ে যেতেন তাহলে শ্রীঅধিকারী নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের সেখানে উপস্থিতির কথা উল্লেখ করতেন। কিন্তু ঘটনাটা রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে বা নির্দেশে যে হয় নি শ্রীঅধিকারীর উক্তি থেকে তা বেশ বোঝা যায়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে শ্রীচৌধুরী দায়ী করে তাঁর ধর্মমতকে বিকৃত করেছেন তা সমীচীন হয় নি।

আমি শ্রীচৌধুরীর পুস্তকের উল্লিখিত মন্তব্য সম্বন্ধে কোন প্রকৃত তথ্য আছে কিনা জানতে চেয়ে 'রবীন্দ্র-জীবনী' লেখক—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি তাঁর সেক্রেটারীর মারফত উত্তর দিয়েছেন। লিখেছেন—"আপনার গত ৩০শে এপ্রিলের (১৯৭৯) পত্রের উত্তরে বলা যায় যে, আপনার প্রস্তাবিত উত্তর কোন প্রামাণিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে পাওয়া যায় না। জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে সব তথ্য বা খাতাপত্র রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত আছে তাতে রবীন্দ্রনাথ মূর্তিপূজক ছিলেন এমন তথ্য বিরল। রবীন্দ্রনাথ বিগ্রহ বা মূর্তিপূজক ছিলেন এ ধরণের কোন উল্লেখ নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রজারঞ্জক জমিদার হিসাবে দেবমন্দির ও মসজিদের সংস্কার করার কর্তব্য পালন করেছেন। এ ক্ষেত্রে ধর্মাধর্মের কোন সম্পর্ক নাই।"

—রাধাগো বন্দ কর, তত্ত্বকৌমুদী

—সাময়িকী—

দিব্য বানী—

যে আত্মম্ভরী আপনার আয়েস খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে কৃপার পাত্র)। যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ, (প্রাণ দিয়েও পরের কল্যাণাকাঙ্খী) তারা। যারা আপনার আয়েস চায় কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার নিজের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক, এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও,—এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধি। ওঠ, ওঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, onward, onward (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়ে-মদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে onward, onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য আর কিছু নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না? একি ছেলেখেলা, একি জ্যাঠামি, একি চ্যাংড়ামি—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পারছি না—onward, এই কথাটি খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর।

—স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন হইতে উদ্ধৃত

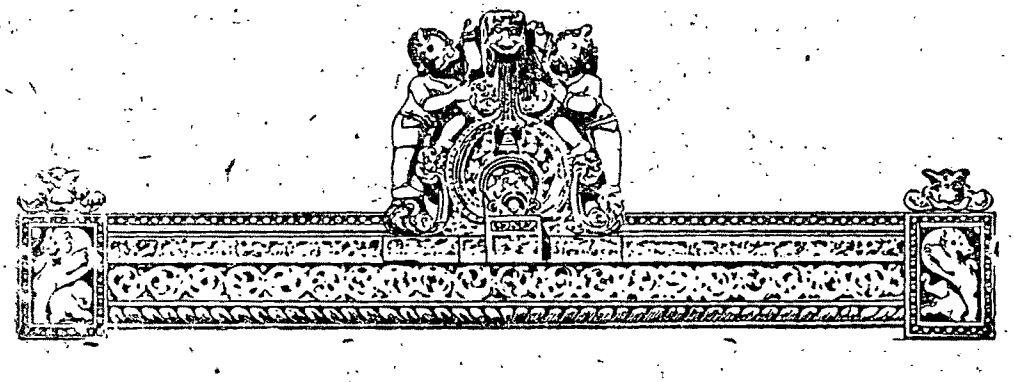

তুমিই-ই-তুমি

—কাজী শাহদাৎ আলী

তুমি শব্দ প্রখর কঠিণ মুখর
আপন গরবে গর্বিত।
তুমি দহন জ্বলন বহ্নি বারুদে
রণ সাজে সদা সজ্জিত ॥

তুমি মহান মহিমা মনের মরমে
আপনি আপনে মন্ত্রিত।
তুমি মহা-মিলনের মধুর লগনে
লাজুক নয়নে নন্দিত ॥

তুমি তপ্ত তপন আকাশে বাতাসে
হৃদয় সকাশে বন্দিত।
তুমি বিশ্ব ব্যাপিয়া নাচন মাতনে
যেন গো সদাই ছন্দিত ॥

তুমি সদাই স্বরবে আপন গরবে
কেবল কঠিন গর্জিত।
তুমি ভালবাসার আশার আলোকে
নহে তো তবুও বর্জিত ॥

পুস্তক পরিচয়

হরিপুর থেকে রামগড় ঃ নিমলেন্দু বিকাশ রক্ষিত। প্রত্যয়। ২৪।১ ক্রীক রো। কলকাতা-১৪। দর ঃ আট টাকা।

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, সম্প্রতি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অনেকেই গবেষণাধর্মী লেখা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। অপরাজেয় সংগ্রামী এবং স্বাধীনতার মূর্ত-প্রতীক সুভাষ-চন্দ্র এ-দেশের মানুষের ভালবাসা-শ্রদ্ধা যতটা পেয়েছেন, ততটা কিন্তু গবেষণায় স্থান পান নি। সেদিক থেকে বিচার করলে বর্ত্তমান গ্রন্থটি নিশ্চিতভাবে রাজনীতিবিদ, গবেষক এবং সাধারণ পাঠক-পাঠিকার কাছে যথেষ্ট মূল্যবান মনে হবে।

স্বল্প পরিসর গ্রন্থটিতে ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় দুর্যোগ-লগ্ন অত্যন্ত নিপুণভাবে বিধৃত করা হয়েছে। সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন সংগ্রাম, গান্ধী-বাদী নিষ্ক্রিয়তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের স্বার্থের যোগাযোগ, ষড়যন্ত্র এবং সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত অল্প পরিসরে লেখক যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ করেছেন। এর ফলে সাম্প্রতিক ইতিহাস অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেমন, তেমনি স্বাধীনতা-সংগ্রামের বৃহত্তর পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সঙ্কটময় অধ্যায়ের ঘটনাগুলোকে সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে লেখক দেখাতে চেয়েছেন—গান্ধীবাদী অসহযোগ শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়েছিল। এর জন্য গান্ধী শিষ্যরা পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মুলতুবী রেখে সুভাষচন্দ্রের বিরোধী শিবিরে সাময়িক কালের জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। চূড়ান্ত অবিচারের শিকার হয়ে সুভাষচন্দ্র দুর্গম বন্ধুর পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর অপাত পরাজয় চিরন্তন বিজয় গৌরবে ধন্য হয়েছে পরবর্তী কালে।

ষড়যন্ত্র-দুর্গম, রুক্ষ-বন্ধুর পথে নিঃসঙ্গ বীর আদর্শের দীপশিখা জ্বালিয়ে অবিচল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন —পিছিয়ে গেছে বন্ধু-বান্ধব, অনুরাগী—অনুগামীদের অনেকেও। আবেগময়ী ভাষায় লেখক এই উদ্দীপণাপূর্ণ অথচ করুণ পরিণতির দিকে তাঁর পাঠককে টেনে নিয়ে গেছেন। পাঠ-শেষে হৃদয় যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, ইতিহাসের অন্তরালে যে এমন মহৎ বেদনা উহ্য থাকে, অনেক সময় সেটা বিশ্বাস হয় না।

বলা বাহুল্য, লেখক কোথাও কল্পনার আশ্রয় নেন নি। সূত্র নির্দেশের অনেকগুলো পৃষ্ঠা তাঁর তথ্যপ্রীতি এবং নিষ্ঠার পরিচায়ক হয়ে আছে। অথচ তথ্যভারে লেখাটা আদৌ ভারাক্রান্ত নয়। বস্তুতঃ রচনা-মাধুর্যের সঙ্গে অথ্য সংগ্রহের দুর্লভ সমন্বয় বইটাকে অত্যন্ত সুখপাঠ্য করে তুলেছে। এক অদম্য কৌতূহল পাঠককে শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যায় রচনাভঙ্গির নিপুণতার জন্যই।

অবশ্যই লেখক জাতীয় নেতাদের অনেকেরই স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন নির্মমভাবে, কিছু কিছু মন্তব্যও রূঢ় লেগেছে। ঐতিহাসিক বিচারে তাঁর বিশ্লেষণ নির্ভুল হলেও এমন করে সত্য ভাষণের সৎ-সাহস অনেকেই দেখাতে পারেন নি। এই ধরণের সাহসিকতার প্রয়োজন ছিল, অন্তত যখন দেশে বিদেশে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

তবে এটা লক্ষণীয়, লেখাটা তথ্যবহুল হলেও

অপ্রয়োজনে মেদবৃদ্ধি করা হয় নি। বহু ঘটনা এবং চরিত্রের ঠাস-বুনোন সত্ত্বেও একমুখী লক্ষ্যের দিকেই লেখক নিয়ে গেছেন তাঁর পাঠকে। নাশ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও মূল কাহিনী এক মুহূর্ত্তের জন্যও কেন্দ্রচ্যুত হয় নি।

পরিশিষ্টে সুভাষচন্দ্রের কয়েকটা চিঠির অনুবাদ সংযোজিত হয়েছে। চিঠিগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য যেমন অপরিসীম, অনুবাদও তেমনি স্বচ্ছন্দ-সুন্দর। নিঃসন্দেহে চিঠিগুলো বর্ত্তমান গ্রন্থটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বিষয় বস্তুর চিঠিগুলোর যোগাযোগ সত্যিই অচ্ছেদ্য।

তবে মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে অনেক। সব চাইতে খারাপ লেগেছে ওটেনের আঘাতকারী হিসেবে অনঙ্গ দামের পদবী 'দাস' হওয়ায়। এই ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করা খুবই দরকার। আর একটা কথা। ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থের জন্য এত দীর্ঘ সূত্র নির্দেশ কি সত্যিই অপরিহার্য্য ছিল? আশা করব, প্রশ্নটা গুরুত্ব সহকারেই বিবেচনা করে দেখা হবে।

লেখক বিপুল পরিশ্রম ও আন্তরিক নিষ্ঠায় সুভাষ-চন্দ্র সম্বন্ধে একটা মনোজ্ঞ গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। এর জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদাই। সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে সুলিখিত বইয়ের তালিকায় বর্ত্তমান গ্রন্থটিকে নিশ্চয়ই স্থান দেওয়া যাবে। আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

REGISTERED No. WB/CC—340 THE PRABASI APRIL 1979
India Price : Single Copy ·00 and Annul Subsecription 36·00
Phone : 24-5520

2 DEC 1983

Editor—ASHOKE CHATTERJEE
Printed and Published by Samindranath Sircar, Prabasi Press Private Limited
77/1/2/1 Lenin Sarani, Calcutta-13

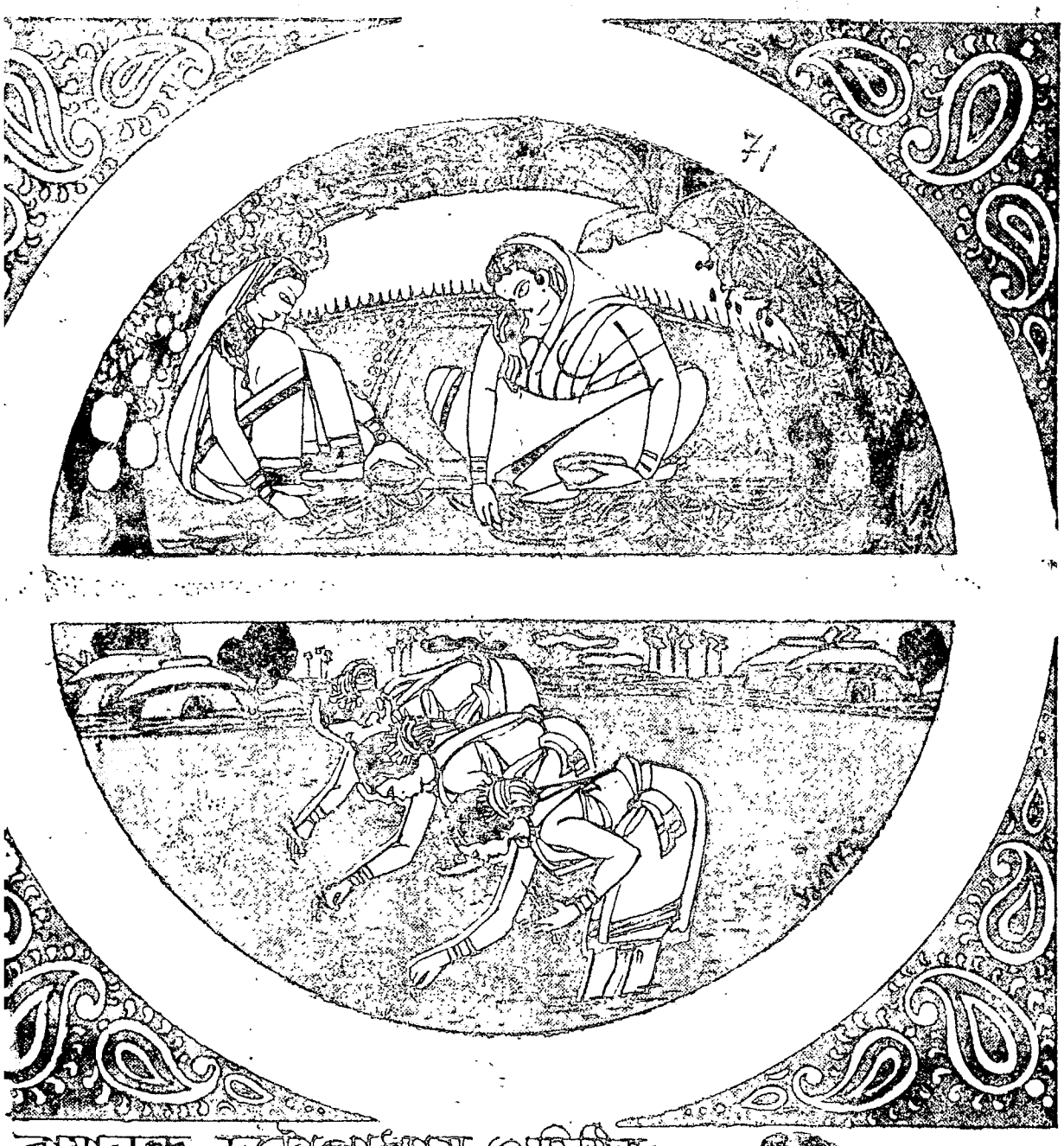

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত—

প্রবাসী

সম্পাদক—অশোক চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন—১৩৮৬

প্রবাসী—১৩৮৬

সূচীপত্র

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন

বিবিধ প্রসঙ্গ—	৬৫
বিধবা—বি, দে	৬৬
প্রথম মহাযুদ্ধে গঠিত বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট স্থায়ী হল না কেন ?—জয়শ্রী ভট্টাচার্য্য	৭০
আণবিক বিস্ফোরণে আইনষ্টাইনের দায়িত্ব কতটা ?—সন্তোষকুমার দে	৭৩
নিশিকান্না—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়	৭৮
মনিব্যাগ—প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়	৮২
টগর, দিবেন্দু মিনতি ও আরো অনেকে—গৌর সি দে	৮৪
গানের ভুবনে—শান্তনু দে সরকার	৯০
শ্রীধাম বৃন্দাবন কথা—কানাইলাল দত্ত	৯৭
কংসাবতী—নন্দলাল পড়িয়া	১০৩
আজব দেশ—ভোলানাথ মুখার্জী	১০৪
আমি—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য	১০৫
উৎসর্গ—	১০৬
সুনয়নী—কাজী শাহাদাৎ আলী	১০৬
জয়-পরাজয়—শান্তিপদ ভট্টাচার্য্য	১০৭
যৌতুক—সন্তোষ মিত্র	১১৫
সাময়িকী—	১১৯
পঞ্চশস্য—	১২১

P2502

NOTICE

Owing to difficulties in Publishing the Journals, Bi-monthly numbers will be published till further notice.

প্রবাহ

"সত্যম শিবম সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেনলভ্য"

৮০তম ভাগ | প্রথম খণ্ড | শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন—১৩৮৬ | ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিত্বের পতনের পর জনতা সরকারের আগমনে যাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, তাঁরা আজ হতাশ হয়ে হয়ত নিজেদের ভাগ্যকেই দায়ী করছেন। অবশ্য সে ক্ষেত্রে তাঁদের দোষ দেওয়াও যায় না। কারণ অনেকেরই ধারনা ছিল ইন্দিরা তথা সঞ্জয় গান্ধী দেশকে যে পথে নিয়ে যাচ্ছেন তাতে দেশে উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। বিশেষতঃ বিগত নির্ব্বাচনের কিছুকাল আগে থেকেই কেন্দ্রের শাসন যন্ত্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, যে ভাবে সঞ্জয় গান্ধীর প্রতিপত্তি কেন্দ্রিয় শাসনকে প্রভাবিত করেছিল, তাতে দেশের বহু মানী-মনীষী-দেরও চিন্তার কারণ ঘটিয়েছিল। এর প্রভাব গত নির্ব্বাচনে এমনিই বিস্তৃত ভাবে পড়েছিল, যার পরিণতি হ'ল ইন্দিরা সরকারের পতন।

কিন্তু দুঃখ এইখানেই যে ইন্দিরা সরকারের পতনে সামরিক স্বস্তির বাতাস বইতে না বইতেই দেশের জন-সাধারণ যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি মানস চক্ষে দেখেছিলেন তা' ক্রমশঃই ম্লান হয়ে এল। প্রধান মন্ত্রীর পদের দাবীতে মোরারজি দেশাই ও চরণ সিংএর বিরোধ দেশের আবাল-ধ্বনিতাকে হতাশ করেছে। জাতীয় উন্নতি সেখানে চরম আদর্শ, পদের মোহ ত্যাগ যেখানে নজীর হিসাবে উপস্থাপিত হওয়ার যোগ্য সেখানে পদাধিকার নিয়ে বিরোধ শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, লজ্জাকরও বটে। এই বিরোধ যদি পার্টিগত মতাদর্শের হ'ত, তবে দুঃখ করার কিছু থাকত না, কারণ আদর্শের বিরোধ স্বাভাবিক। কিন্তু একই আদর্শের অনুসারিদের মধ্যে যখন পদাধিকারের বিরোধ আসে, তখন আদর্শের মূল্যই শুধু কমে যায় না, উপরন্তু জন-সাধারণের মনে নেতৃত্বের ওপর বিশ্বাসের ভিত টলে যায়, তাদের মনোবলের ওপর আসে অবিচার।

ভারত দেশ হিসাবে যেমন বিরাট, তেমনিই তার সমস্যাও অসংখ্য। একদিন থেকে দেখলে এ দেশের সমস্যা-গুলিকে সুষ্ঠু সমাধানের পথে নিয়ে যেতে পারলে সম্ভা বনাও প্রচুর। শিল্পে, কৃষিতে উৎপাদনের মাত্রা বাড়ার পথ যেমন বিঘ্ন-সংকুল, তেমনিই বিঘ্ন অপসারিত করতে পারলে বিপুল সম্ভাবনা। উপযুক্ত নেতৃত্বই কেবল দিতে পারে উন্নতির প্রতিশ্রুতি। নেতৃত্বকে পদ-মর্য্যাদার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, তাকে বিস্তৃততর পথে, জন-মঙ্গলের বাসনায় চালিত করার আজ একান্তই প্রয়োজন।

বিধবা

বি, দে

সময় দুপুর।

ছান্নোর স্বামীর মৃতদেহটা এক খাটিয়ার উপর ঘরের দরজার সামনে রাখা রয়েছে।

মানুষ বেঁচে থাকতে সরকারের কোন হুঁশ থাকে না, কিন্তু মরলে যে এত ঝামেলা তা' ছান্নোর জানা ছিল না।

গ্রামের সর্দার, ডাক্তার, পুলিশ সাব ইনস্‌পেক্টর সকলে মিলে শোকের অবকাশটাকেও দিয়েছে মুছে।

সকলের নানান প্রশ্ন—কি করে মরলো, কখন মরলো মরার সময় সামনে কেউ ছিল কিনা—এই আর কি। কিন্তু যখন যে জীবিত ছিল তখন কেউই খোঁজ নিতে আসে নি ছান্নোদের কি করে চলছে।

যা'হোক এ'সব সরকারী ঝামেলা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিটে গেল।

গ্রামের জোয়ান বৃদ্ধের দল সৎকারের কাজে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলো।

মেয়েরা অশ্রুসজল চোখে ছান্নোকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। 'সত্যই একটা মরদ ছিল বটে—আমাদের সকলের শ্মশানে যাওয়া উচিৎ কি বল,' বৃদ্ধদের দলের একজন বললো।

সকলে মিলে মৃতদেহটাকে নিয়ে চললো শ্মশানের দিকে। পিছনে পিছনে চললো শোকসন্তপ্ত পরিবারের দল।

ছিতার লেলিহান শিখায় ছান্নোর স্বামীর মৃতদেহটা একটু একটু করে ইহলোকের যাবতীয় দুঃখের বোঝা নেয় নিঃশেষ হতে চলেছে।

এক পাশে জটলা করে বসে রয়েছে যুবা-বৃদ্ধের দল। সকলেই দিন-মজুর।

দিন আনে দিন খায়।

মান্ধা বলে উঠলো, 'না পোড়া পর্য্যন্ত আমরা এখানেই, থাকবো কি বলো?'

উত্তরে দলের পাণ্ডা ধীদো বেশ রাগত ভাবেই বললো 'তোমরা সব বোকার দল। কাল সকালে আমাদের খামারে যেতে হবে একথা মনে আছে। জানোনা একদিন কাজ না পেলে কি অবস্থা হবে। মড়া পোড়া শেষ হতে এখন অনেক দেরী।

রাত ভোর হয়ে যেতে পারে মড়া পোড়া শেষ করে গাঁয়ে ফিরতে। তা ছাড়া, পেটের দায় বড় দায় – সকলে থাকতেও রাজী হবে না।'

ধীদোর কথা কেউই অমান্য করতে পারলো না। সকলেই মেনে নিল তার কথা—যদিও মানবিকতা বোধ আর পেটের দায়ের এক দোটানায় দোলায়মান হচ্ছিল তাদের মন। ভিন গাঁয়ের সর্দারের খামারে পরদিন সকালে যাবে এটাই অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করলো তারা। অন্যথায় সর্দার লোক ভাড়া করে নেবে। আর, এতে তাদের অবস্থা হবে শোচনীয়। বৃদ্ধ আর ছেলের দল গাধার পিঠে চেপে বসলো, যুবকের দল চললো হেঁটে। সবার আগে হুঁকো হাতে ধীদো চললো এগিয়ে।

সকলকে শোকে অভিভূত দেখে বিরক্তিতে ধীদো বেশ ঝাঁঝের সাথেই বললো, 'যত সব শুয়োরের দল, এখনও কান্নার কি আছে। কাজে যাওয়ার সময়ও কি এ' রকম করতে থাকবে। জানো না পেটের দায়েই আমাদের মড়া পোড়া শেষ না হতেই যেতে হচ্ছে।' ধীদোর কথায় মেয়েদের দল তাদের ফোঁপানো থামালো। ছান্নো তার বোরখর মুখাবরণটার মধ্য দিয়ে একবার তাকালো ধীদোর দিকে। কান্না চাপা দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা তাকে আরো ব্যাকুল করে তুললো। ফিরে দাঁড়িয়ে শেষ বারের মত চিতার জ্বলন্ত

প্রবাসী

"সত্যম শিবম সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৮০তম ভাগ	শ্রাবণ, ভাদ্র,	৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
প্রথম খণ্ড	আশ্বিন—১৩৮৬	

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিত্বের পতনের পর জনতা সরকারের আগমনে যাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন, তাঁরা আজ হতাশ হয়ে হয়ত নিজেদের ভাগ্যকেই দায়ী করছেন। অবশ্য সে ক্ষেত্রে তাঁদের দোষ দেওয়াও যায় না। কারণ অনেকেরই ধারনা ছিল ইন্দিরা তথা সঞ্জয় গান্ধী দেশকে যে পথে নিয়ে যাচ্ছেন তাতে দেশে উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। বিশেষতঃ বিগত নির্ব্বাচনের কিছুকাল আগে থেকেই কেন্দ্রের শাসন যন্ত্রে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, যে ভাবে সঞ্জয় গান্ধীর প্রতিপত্তি কেন্দ্রের শাসনকে প্রভাবিত করেছিল, তাতে দেশের বহু মানী-মনীষী-দেরও চিন্তার কারণ ঘটিয়েছিল। এর প্রভাব গত নির্ব্বাচনে এমনিই বিস্তৃত ভাবে পড়েছিল, যার পরিণতি হ'ল ইন্দিরা সরকারের পতন।

কিন্তু দুঃখ এইখানেই যে ইন্দিরা সরকারের পতনে সামরিক স্বস্তির বাতাস বইতে না বইতেই দেশের জন-সাধারণ যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি মানস চক্ষে দেখেছিলেন তা' ক্রমশঃই ম্লান হয়ে এল। প্রধান মন্ত্রীর পদের দাবীতে মোরারজি দেশাই ও চরণ সিংএর বিরোধ দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে হতাশ করেছে। জাতীয় উন্নতি সেখানে চরম আদর্শ, পদের মোহ ত্যাগ যেখানে নজীর হিসাবে উপস্থাপিত হওয়ার যোগ্য সেখানে পদাধিকার নিয়ে বিরোধ শুধু দৃষ্টিকটুই নয়, লজ্জাকরও বটে। এই বিরোধ যদি পার্টিগত মতাদর্শের হ'ত, তবে দুঃখ করার কিছু থাকত না, কারণ আদর্শের বিরোধ স্বাভাবিক। কিন্তু একই আদর্শের অনুসারিদের মধ্যে যখন পদাধিকারের বিরোধ আসে, তখন আদর্শের মূল্যই শুধু কমে যায় না, উপরন্তু জন-সাধারণের মনে নেতৃত্বের ওপর বিশ্বাসের ভিত টলে যায়, তাদের মনোবলের ওপর আসে অবিচার।

ভারত দেশ হিসাবে যেমন বিরাট, তেমনিই তার সমস্যাও অসংখ্য। একদিন থেকে দেখলে এ দেশের সমস্যা-গুলিকে সুষ্ঠু সমাধানের পথে নিয়ে যেতে পারলে সম্ভাবনাও প্রচুর। শিল্পে, কৃষিতে উৎপাদনের মাত্রা বাড়ার পথ যেমন বিঘ্ন-সঙ্কুল, তেমনিই বিঘ্ন অপসারিত করতে পারলে বিপুল সম্ভাবনা। উপযুক্ত নেতৃত্বই কেবল দিতে পারে উন্নতির প্রতিশ্রুতি। নেতৃত্বকে পদ-মর্য্যাদার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, তাকে বিস্তৃততর পথে, জন-মঙ্গলের বাসনায় চালিত করার আজ একান্তই প্রয়োজন।

বিধবা

বি, দে

সময় দুপুর।

ছান্নোর স্বামীর মৃতদেহটা এক খাটিয়ার উপর ঘরের দরজার সামনে রাখা রয়েছে।

মানুষ বেঁচে থাকতে সরকারের কোন হুঁশ থাকে না, কিন্তু মরলে যে এত ঝামেলা তা' ছান্নোর জানা ছিল না।

গ্রামের সর্দার, ডাক্তার, পুলিশ সাব ইনস্‌পেক্টর সকলে মিলে শোকের অবকাশটাকেও দিয়েছে মুছে।

সকলের নানান প্রশ্ন—কি করে মরলো, কখন মরলো মরার সময় সামনে কেউ ছিল কিনা—এই আর কি। কিন্তু যখন যে জীবিত ছিল তখন কেউই খোঁজ নিতে আসে নি ছান্নোদের কি করে চলছে।

যা'হোক এ'সব সরকারী ঝামেলা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিটে গেল।

গ্রামের জোয়ান বৃদ্ধের দল সৎকারের কাজে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলো।

মেয়েরা অশ্রুসজল চোখে ছান্নোকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। 'সত্যই একটা মরদ ছিল বটে—আমাদের সকলের শ্মশানে যাওয়া উচিৎ কি বল,' বৃদ্ধদের দলের একজন বললো।

সকলে মিলে মৃতদেহটাকে নিয়ে চললো শ্মশানের দিকে। পিছনে পিছনে চললো শোকসন্তপ্ত পরিবারের দল।

ছিতার লেলিহান শিখায় ছান্নোর স্বামীর মৃতদেহটা একটু একটু করে ইহলোকের যাবতীয় দুঃখের বোঝা নেয় নিঃশেষ হতে চলেছে।

এক পাশে জটলা করে বসে রয়েছে যুবা-বৃদ্ধের দল। সকলেই দিন-মজুর।

দিন আনে দিন খায়।

মান্ধা বলে উঠলো, 'না পোড়া পর্যন্ত আমরা এখানেই, থাকবো কি বলো?'

উত্তরে দলের পাণ্ডা ধীদো বেশ রাগত ভাবেই বললো 'তোমরা সব বোকার দল। কাল সকালে আমাদের খামারে যেতে হবে একথা মনে আছে। জানোনা একদিন কাজ না পেলে কি অবস্থা হবে। মড়া পোড়া শেষ হতে এখন অনেক দেরী।

রাত ভোর হয়ে যেতে পারে মড়া পোড়া শেষ করে গাঁয়ে ফিরতে। তা ছাড়া, পেটের দায় বড় দায় – সকলে থাকতেও রাজী হবে না।'

ধীদোর কথা কেউই অমান্য করতে পারলো না। সকলেই মেনে নিল তার কথা—যদিও মানবিকতা বোধ আর পেটের দায়ের এক দোটানায় দোলায়মান হচ্ছিল তাদের মন। ভিন গাঁয়ের সর্দারের খামারে পরদিন সকালে যাবে এটাই অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো তারা। অন্যথায় সর্দার লোক ভাড়া করে নেবে। আর, এতে তাদের অবস্থা হবে শোচনীয়। বৃদ্ধ আর ছেলের দল গাধার পিঠে চেপে বসলো, যুবকের দল চললো হেঁটে। সবার আগে হুঁকো হাতে ধীদো চললো এগিয়ে।

সকলকে শোকে অভিভূত দেখে বিরক্তিতে ধীদো বেশ ঝাঁঝের সাথেই বললো, 'যত সব শুয়োরের দল, এখনও কান্নার কি আছে। কাজে যাওয়ার সময়ও কি এ' রকম করতে থাকবে। জানো না পেটের দায়েই আমাদের মড়া পোড়া শেষ না হতেই যেতে হচ্ছে।' ধীদোর কথায় মেয়েদের দল তাদের ফোঁপানো থামালো। ছান্নো তার বোরখার মুখাবরণটার মধ্য দিয়ে একবার তাকালো ধীদোর দিকে। কান্না চাপা দেওয়ার নিষ্ফল চেষ্টা তাকে আরো ব্যাকুল করে তুললো। ফিরে দাঁড়িয়ে শেষ বারের মত চিতার জ্বলন্ত

শিখার দিকে তাকালো সে। বুকের মধ্যে একদলা কান্না যেন ঠেলে উঠতে চাইলো উপরের দিকে। থর থর করে কাঁপতে লাগলো তার শরীর। বোরখার মুখাবরণ দিয়ে চোখের জল মুছতে গিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো অশ্রুরাজি।

'তোমাকে ভেঙে পড়লে চলবে না,' ছান্নোর ছোট দেওর তার পাশে এসে ছান্নোকে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

জলভরা চোখে সে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলো না। বোরখার মুখাবরণ দিয়ে চোখের জল মুছে তাকালো সে তার সূর্যকরোজ্জল মুখাবয়বের দিকে। অন্যান্য মেয়েরা দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোতে লাগলো। ছান্নোর মনে তখন দুঃখের সাথে একরাশ চিন্তার ভার। দেওরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগলো তার ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা। কিছু দূরে তার তিন ছিলে চলেছে। নিজেদের মধ্যে খেল করতে করতে চলেছে তারা, কখনো হাঁটছে, কখনো দৌড়াচ্ছে। মৃত্যুর শোকাতুর পরিবেশ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে নি।

এক অশ্বত্থ গাছের তলা দিয়ে যাওয়ার সময় কাকের ডানা ঝাপটানোতে কিছু ময়লা ঝরে পড়লো তাদের মাথায়। খালের পাশ দিয়ে টানা রাস্তা ধরে তারা এগিয়ে চলেছে। গাধার খুরের আঘাতে, আর নিজেদের প্রতিটা পদক্ষেপে ধুলো উড়ে তাদের সমস্ত দেহকে করে তুলছিলো ধূলিসমাচ্ছন্ন। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় টলটল করে দিল খালের জল। মনে হচ্ছিলো তাদের পায়ের জুতোগুলো যেন আগুনে তপ্ত হয়ে উঠেছে—যেন উত্তপ্ত কয়লার উপর দিয়ে চলেছে তারা।

সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে তার দেওর বললো, 'যা হবার হয়েছে। আর এ' নিয়ে ভেবো না। আমরা তো আছি, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ছান্নো চুপচাপ নিজের মনে চিন্তার জাল বুনতে লাগলো,। ছোট দেওর তপা মাথার পাগড়ীটা নিয়ে ময়লা গুলো ঝেড়ে ফেললো। সে তাকিয়ে দেখলো বৌদির চোখ জলে আবার সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

ছান্নো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জলভরা চোখে তাকালো তপার দিকে, 'ছেলেদের ভবিষ্যৎ কি হবে—তুমি এদের দায়িত্ব নিতে পারবে তো?'

শোক দাবিয়ে ভবিষ্যতের জন্য আশু চিন্তা সমস্ত কটা ঠেলে বেরিয়ে আসে ছান্নোর অন্তর থেকে।

স্বামীর মৃত্যুশোক সে ভুলতে বাধ্য হয় জীবন ধারণের প্রয়োজনের তাগিদেয়।

'বলছি তো নেবো, তোমার কোন চিন্তা নেই।' তপা একটু চিন্তান্বিত ভাবে মাথার চারপাশে পাগড়িটা ঠিকভাবে জড়িয়ে নিতে লাগলো। হাতের বাঁশের লাঠিটা মাটিতে ঠুকে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিলো যেন আশু দায়িত্বের বোঝাটাকে সহজ করে নিতে, আর শোকটাকে ভুলতে।

কাঁধে ফেলা রেশমী চাদরের প্রান্ত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে সে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় জিজ্ঞেস করে, 'তুমি মন স্থির করে নিয়েছো তো—না, কি পরে আবার বলবে ছেলেদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব নেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'বলছি তো, শ্মশান থেকে ফেরার মুহূর্তেই আমি বুঝতে পেরেছি যখন আমাকেই এ' দায়িত্ব নিতে হবে, তাই অরাজী হওয়ার আর কি আছে।'

ছান্নো যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলো না তপার কথা। তাই একটু সন্দেহের দৃষ্টিতেই তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করলো সে। যেন তপা তার কাছে নবাগত। তারপর, একটু দাঁড়িয়ে শালোয়ার থেকে ঝেড়ে ফেলতে লাগলো পথের ধুলোগুলো।

'ভেবে দেখো। তুমি কি রাজী আছো আমার ছেলেদের দেখাশোনা করতে?' সে তার বোরখা, শালোয়ার আর পায়ের জুতো থেকে ময়লাগুলো ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলে পুরোপুরি সন্দেহ কাটাতে না পেরে।

চারদিকে একবার সন্দেহ ভরা চোখে তুলে তাকিয়ে কাঁধের রেশমী চাদরটা ঝেড়ে নিয়ে কাঁধের উপর পুনরায় রাখলো সে।

স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেদের মানুষ করার চিন্তাই যখন তার বেশী করে পেয়ে বসেছে।

তপা কাঁধের উপর বাঁশের লাঠিটা রেখে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে তো কথা দিলাম, তুমি আরো কি চাও?' ছান্নো ঠিক মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছিলো না—বুঝতে পারছিলো না ঠিক কি শুনলে সে নিশ্চিন্ত হবে। তার চোখ দুটো জলন্ত অঙ্গারের মতো জলছিলো, চোখের পাতা দুটো ছিল অশ্রুসিক্ত। রেশমী চাদরটা কাঁধে ঠিকমতো জড়িয়ে তাকালো সে ঘোড়ার টানা গাড়ীতে করে ফেরা লোকজনের পিছনটার। সেখানে তখন ধূলির ধূম্রজাল তৈরী হয়েছে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় চিক্ চিক্ করছে ধূলোগুলো।

ছান্নো একদিকে স্বামীর শোক আর আরেক দিকে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তার মধ্যে চড়ে যেন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ তার ছেলেদের দায়িত্ব নিতে পারি। তাই তপার উদ্দেশ্যে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যই যেন বলে, 'আমার হাতটা একটু ধরো।'

'এই যে এদিকে—এদিকে দাও হাতটা,' তপা ধরে ছান্নোর কম্পিত হাত।

তপার হাতের স্পর্শে ছান্নোর সারা শরীরে যেন এক বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেলো। পাশাপাশি হাঁটতে গিয়ে তাদের পরস্পরের কাঁধে কাঁধ স্পর্শ করলো। সে স্পর্শে ছান্নো যেন নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পেলো।

ছান্নোর ঠোঁট কাঁপছিলো এই দুঃখের মধ্যেও নতুন প্রেরণা পেয়ে, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো পরম নিশ্চিন্ত হওয়ার এক শব্দগুচ্ছ, 'বেশ, তাহলে আর কি, তুমি তো আছো।'

দলের লোকজনদের ছেড়ে খালের ধার দিয়ে হাঁটতে লাগলো তারা। লোক,বাকাই ঘোড়ায় টানা গাড়ীটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। পিছনে তখন ধূলোয় আকাশ ছেয়ে রয়েছে। ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে ছেলের দল নিজেদের মধ্যে চীৎকার চেঁচামেচি করতে করতে এগিয়ে চলেছে। একটু আগে খালের জলে নেয়ে নিয়েছে তারা। নারী পুরুষের দল তাদের জীবীকার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনায় রত। একটু আগের শোকাবহ ঘটনার অবলুপ্তি ঘটিয়ে পেটের তাগিদের কাল কে কি করবে তাই নিয়ে এখন ব্যস্ত।

ছান্নো আর তপা খালের ওপর সেতুটার কাছে যখন এলো ছান্নো সেতুর রেলিংটার উপর উঠে দাঁড়িয়ে শেষবারের স্বামীর জলন্ত চিতাটার দিকে ফিরে তাকালো—ততদূর থেকেও লেলিহান আগুনের শিখাটা দেখা যাচ্ছিলো।

ভবিষ্যৎ চিন্তার মধ্যেও স্বামীর শোকটাকে সে কিছুতে চাপা দিতে পারছিলো না। এ' যেন স্বামীর ন্যায় নির্ভরতা আর ভালোবাসার এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া। ভালোবাসা আর নির্ভরতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা থাকে না বলেই তপার আশ্বাসবানী সত্বেও স্বামীর প্রতি পিছটানটা সে কাটাতে পারে না কিছুতে।

বাঁশের লাঠিটা মাটিতে ঠুকে ছান্নোর হঠাৎ এ' রকম ব্যবহারে ঠিক থাকতে না পেরে জোরের সাথেই বলে তপা, 'কি ব্যাপার, তুমি হঠাৎ রেলিংটার ওপর উঠে দাঁড়ালে কি করতে?'

'কিছু না, এমনিই,' মনের ভাব অসম্পূর্ণ রেখেই রেলিং থেকে নেমে পড়ে তপার হাত ধরে ছান্নো। বিশাল সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির কাঠের টুকরো আঁকড়ে ধরার মতোই তপার হাতকে আঁকড়ে ধরে সে।

আর অল্প কিছু সময়ের মধ্যে ঘোড়ায় টানা গাড়ী, গাধার পিঠের লোকজন আর হেঁটে চলা যুবকের দল পৌঁছাবে তাদের গাঁয়ে। ছান্নোর বুড়ো শ্বশুর পায়ে হেঁটেই চলছিলো। ছেলের মৃত্যুশোকে গাড়ীতে চড়ে বসতে তার ইচ্ছে হয় নি। ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত মনটাকে নিয়ে চলতে গিয়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে সে। খালের সেতুর যে রেলিংটার উপর একটু আগে ছান্নো দাঁড়িয়েছিলো, সেখানে একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে বসে সে। পাঁচ ছেলের তৃতীয় জনকে হারিয়ে সে যেন বেশ ভেঙে পড়েছে। অবশ্য, বারটাও রয়েছে। এই ছেলেই ছিল সব থেকে বেশী রোজগেরে। এর ওপর নির্ভরতা ছিলো তার সব থেকে বেশী। তাই, মৃত্যুশোকের সাথে রূঢ় বাস্তবের প্রয়োজনটাকেও অস্বীকার করতে না পেরে আরো বেশী মুহ্যমান হয়ে পড়েছে সে। জলন্ত পাইপের তামাকের মাদকতাই এই শোকের মধ্যে বাঁচার এক উৎস হিসাবে যেন

খোরাক যোগাচ্ছে তাকে। সূর্য অস্ত যাওয়ার দিনের আলো নিভে যাওয়ার মতোই তার পাইপের আগুন এসেছে নিভে। চারিদিকে নেমে এসেছে মৃত্যুর মতোই এক কালো যবনিকা।

খুব কাছের জিনিষও দেখতে কষ্ট হচ্ছে।

গাড়ী আর লোকজন তখন অনেক দূরে।

'তুমি এখনও বেঁচে আছো রাত্রি! এই বেঁচে থেকে কি তুমি পেলে—লাভটা হলো কি তোমার, নিজের মনেই সে বলে চীৎকার করে।

সব থেকে কর্মঠ ছেলেকে হারিয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাটা এখন তার কাছে এক প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার আলোতে সে এতদিন উদ্ভাসিত ছিলো তাকে হারিয়ে কি করে সে বাঁচবে—আর বাঁচলেও কিভাবে সে বাঁচবে এটাই তার কাছে এক প্রশ্ন। একাকী থাকলে নিজের মনে সে যেমন নানান জিজ্ঞাসোর বোঝা নিয়ে ভাবতো তেমনই-ভাবে নিমগ্ন হলো আত্মচিন্তায়। এ' চিন্তা ভালোবাসা হেতু শোক আর নির্ভরতা হেতু অস্তিত্বের এক মিশ্র ব্যাপার।

সে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এই হঠাৎ বিপদে সে যেন একেবারে ভেঙে পড়েছে। তার হাঁটুদুটো এমনই ভারী হয়ে উঠেছে যে সে যেন উঠতে পারছে না। তামাক খাওয়ার পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে ছাইগুলো ঝেড়ে ফেললো সে। তারপর অতিকষ্টে পা টেনে টেনে কোনরকমে এক গাছের তলায় গিয়ে বসলো সে। বসে থাকা অবস্থাতেই চারপাশ হাতড়ে যে কাঠের টুকরো আর শুকনো ঘাস পেলো তা জড়ো করে আগুন ধরালো তাতে। পাইপের মধ্যে তামাক ভরে তারপর জ্বলন্ত কাঠের এক টুকরো বসিয়ে নিলো পাইপের মুখে। জোরে একটা টান দিয়ে যেন ভুলতে চাইলো আজকের সমস্ত ঘটনাটাকে। মুখ ভরা ধোঁয়া ছেড়ে যেন সে পেলো কিছুটা স্বস্তি। তারপর জুতোর গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে নেভালো আগুনের স্তূপ। নিজেকে অতি কষ্টে নিয়ে চললো সে খালের ধারে। ঠিক কোথায় বসলে সে স্বস্তি পাবে সেটা যেন অনুমান করে উঠতে পারছিলো না সে। তাই খালের ধারে গিয়ে হাঁটুর তীব্র যন্ত্রটনাকে উপেক্ষা করে গিয়ে বসলো সেতুর রেলিংটার উপর।

পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিজের মনেই সে বলে উঠলো, 'রাত্রিয়া, এই প্রথম তুমি এক বড় আঘাত পেলে।' পুত্রশোকের প্রথম ধাক্কাটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলো না সে। ঘোড়া, গাধা আর মানুষের পদক্ষেপে যে দিকটা তখনও পুরোপুরি ধূলির ধোঁয়ামুক্ত হয়নি সে দিকে বাঁ পায়ের উপর সমস্ত শরীরটা ছেড়ে দিয়ে কোনরকমে ঘষড়ে ঘষড়ে এগিয়ে চললো সে।

দূর থেকে শুনতে পেলো ধীদোর বলিষ্ঠ ব্যাঙ্গাত্মক কর্কশ বাক্যবান, 'ওহে কুঁড়ের বাদশা, একটু তাড়াতাড়ি পা চালাও! তুমি কি একেবারে সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছো। দেখছো না রাত হয়ে আসছে—দেরী করলে গাঁয়ে আর কখন পেঁছাবে।'

ধীদোর গলার স্বর এখনও কি বলিষ্ঠ দৃপ্ততে ভাস্বর। চার চারটে ছেলেকে হারিয়েও সে এখনও বিধ্বস্ত হয় নি। কি দৃঢ়তা তার এখনও।

ধীদোর বলিষ্ঠতায় রাত্রি নিজের মনেই বলে ওঠে, 'তাহলে আমি কি নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলেছি।' 'হ্যাঁ, তুমি নিজেকে হারিয়েছো রাত্রিয়া,' নিজের অন্তর থেকেই যেন বেরিয়ে এলো কথাটা।

কোন রকম মানসিক একাগ্রতা ছাড়াই—হাতটা তার জামার পকেটের মধ্যে কতকগুলো কাঁচা টাকার মধ্যে যেন শেষ সহায় হাতড়াতে লাগলো। তার হাতের মোচড়ে সেগুলো যেন সশব্দে জানাচ্ছিলো এগুলোই এখন তার ভরসা। একটা তারের ফলার মতোই এগুলো যেন কিছু ক রছিলো তার হৃদয়কে। সব থেকে কর্মঠ ছেলেকে হারিয়ে শুধু মাত্র ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য এই নোটগুলোকে সে যেন ঠিক সহ্য করতে পারছিলো না—আবার এগুলো থেকে মনও তার সরাছিলো না। স্নেহ আর নিরাপত্তার এক দোলায়মান অবস্থায় সে তখন দুলছিলো। পাইপের জ্বলন্ত তামাকের দিকে কিছুক্ষণ শূণ্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বিরক্তি আর অবসাদে ছুঁড়ে ফেলে দিলো সেটা খালের জলে।

'আমি জানি, এ বিপদ যে তোমার ঘটবে তা ছিলো অপ্রতিরোধ্য' পকেটের মধ্যে কাঁচা টাকাগুলোকে মুষ্টিবদ্ধ করে অসহায় ভাবে চীৎকার করে উঠলো সে। মৃত্যু-শোকের পরেও ছানোর মতোই শেষ ভরসা খোঁজার আত্মিক তাগিদেয় সে তখন অসহায় ভাবে জ্বলছিলো।

(প্রাদেশিক গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

প্রথম মহাযুদ্ধে গঠিত
বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট স্থায়ী হল না কেন ?

জয়শ্রী ভট্টাচার্য্য

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে বিশ্বযুদ্ধ হইয়াছিল তাহা প্রথম জার্মান যুদ্ধ নামেও খ্যাত। এই যুদ্ধের সময় বৃটিশ বাধ্য হইয়া যখন প্রথম বাঙ্গালী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রথমে ডবল কোম্পানী ও পরে ৪৯ নং বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠন করেন তখন আমি উহাতে যোগ্য দান করি।" লিখেছেন ডাক্তার হরিমোহন রায়চৌধুরী 'আমার যুদ্ধযাত্রা গ্রন্থে। তিনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ৪৯ নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন সে পল্টনের ৬৭৮ নং সৈন্য।

ডাঃ হরিমোহন তখন তরুণ যুবক। তাঁর এক আত্মীয় হরিদাস রায়চৌধুরীর সঙ্গে গোপনে যুক্তি করে বাঙালী পল্টনে যোগদানের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন পরিবারের, স্বজনের, সকলের অজ্ঞাতে। সেযুগে সকলের, বিশেষ করে ইংরেজদের ধারণা ছিল বাঙালী ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল জাতি। কেবল কলম পিষতে আর মুখ চালাতে জানে। বাঙালী কি কখনও বন্দুক দিয়ে লড়াই করতে পারবে, কঠিন পরিশ্রমে যুদ্ধ করতে পারবে? কারো কারো ধারণা ছিল, "কারণ সেটা নয় –বাঙালীর মাথা ভাল। যুদ্ধের কাজে গিয়ে সমস্ত দেখে শুনে শিখে নিয়ে যদি বিদেশী ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে বসে সেই ভয়েই বাঙালীকে সেনাবিভাগে স্থান দেয় নি ইংরেজ। বেশীর ভাগ বাঙালীর মনেই এই সন্দেহ ছিল। যাই হোক হরিমোহন বাবুরা ভাবলেন—বাঙালী রেজিমেণ্টে যদি একবার যোগ দিতে পারেন তবে বাঙালী যে কেবল কলম পিষতেই জানে তা নয়, বন্দুক ধরেও যুদ্ধ করতে পারে তা প্রমাণ করা যাবে। ডাঃ হরিমোহন রায়চৌধুরী, শ্রীহরিদাস রায়চৌধুরীর সঙ্গে রিক্রুটমেণ্ট অধিকর্তা ডাঃ শরচ্চন্দ্র মল্লিকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন ৫ই জুন ১৯১৭ তারিখে দরখাস্ত নিয়ে। পরদিন সকাল বেলা ডাক্তারী পরীক্ষা হল। ৬ই জুন যথারীতি নিযুক্তি পত্র নিয়ে সকলের সঙ্গে "বন্দে মাতরম" ধ্বনিতে হাওড়া রেলষ্টেশন কাঁপিয়ে করাচীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। করাচীতে পৌঁছে সেখানে এক মাস কাটিয়ে ২৫/৭/১৭ তারিখে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধ ক্ষেত্র বসরা যাত্রা করলেন। যাত্রার পূর্বে ১৫/৭/১৭ তারিখে প্রতিজ্ঞা করলেন—রাজা ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য জীবনপাত করিয়াও কাজ করিব।" ৩১।৭।১৭ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় তাঁদের জাহাজ টাইগ্রিস নদীর মোহনায় গিয়ে ঢুকল। বিকাল পাঁচটায় জাহাজ বসরায় গিয়ে পৌঁছল। ডাঃ রায়চৌধুরী এই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রথম একটি কঠিন সত্য উপলব্ধি করলেন। তিনি লিখেছেন—

"যুদ্ধ ক্ষেত্রের কষ্টের এখানে আরম্ভ। কতদিনে ইহার শেষ হইবে তাহা কহই বলিতে পারে না। মৃত্যুতে না যুদ্ধান্তে। জাতির যুবকদের এইরূপ এইরূপ নিয়মানুবর্ধিতা, পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা পরিমিত আহার প্রভৃতির শিক্ষা না হইলে কোন জাতিই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। পৃথিবীতে উন্নত জাতিগুলির মধ্যে দেখা যায় যুবকদের শিক্ষা কালে বা শিক্ষান্তে যুদ্ধ বিভাগে কিছু দিন থাকিলে উপরোক্ত বিষয়গুলিতে অভ্যস্ত হইতে হয়। আমরা পরাধীন জাতি। কাজেই আমাদের যুবকদের উহা শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই। কাজেই আমাদের ঘরের যুবকদের অধিকাংশই পিতামাতার অবাধ্য। শ্রমবিমুখ, বিলাসী হইয়া এক একটি আলালের ঘরের দুলাল হয়।"

যুদ্ধক্ষেত্রে মর্মে মর্মে ডাঃ রায়চৌধুরী শৃঙ্খলাজ্ঞান, সহনশীলতা, কর্মকুশলতা প্রভৃতি অনুশীলনের উপযোগিতা অনুভব করলেন। শিক্ষা করলেন যুদ্ধ-পদ্ধতি ১০।৯।১৭ তারিখে ৪৯ নং বাঙালী রেজিমেণ্ট বাগদাদ শহরে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের যে ভংকর অবস্থা, পরাজিত দেশের জনগনের যে দুর্দশা দেখলেন তাতে তাঁর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি লিখেছেন —"৬ই, রেজ সৈন্যেরা যখন যে স্থান দখল করে তখনই সেই স্থানের প্রত্যেক বাড়ী তল্লাস করিয়া প্রথমে অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাগুলি তাহার পর ধনরত্ন ও মূল্যবান দ্রব্য, শেষে খাদ্যদ্রব্য হস্তগত করে।.....পরে কতগুলি কেন্দ্র করিয়া রেশন কার্ড করিয়া খাদ্য দিবার ব্যবস্থা কয়া হয়। এরূপ

করিলে দেশের লোকের বিদ্রোহ করিবার ক্ষমতা লোপ পায়। ...এরূপ একটি কেন্দ্রে আমাদের একমাস ডিউটি পড়িল। আমাদের কর্তব্য হইল এই যে (রেশনপ্রার্থী) সমস্ত স্ত্রীলোকদের ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে যাহাতে কোন গোলমাল না হয়। (সেদিন) বেলা নটা পর্যন্ত মাল দেওয়া হইলে প্রায় ৫০।৬০ জন স্ত্রীলোকের মাল দেওয়া বাকী থাকিবেই। ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া তাহাদের চলিয়া যাইতে বলিল। কিন্তু তাহারা যাইল না। কাঁদিতে লাগিল।.....তাহারা কিছুতেই নড়িতে চাহিল না, কাঁদিতে লাগিল। তখন ঘোড়সওয়ার বৃটিশ সৈন্যরা আসিয়া তাহাদের উপর ঘোড়া চালাইয়া দিতে লাগিল। তখন তাহারা ঘোড়ার লাথি ও ধাক্কা খাইয়া ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে পালাইতে লাগিল। জানিলাম বেলা ৯টার পর আর খাদ্য দেওয়া হয় না। ঐ সকল স্ত্রীলোক খাদ্য না পাওয়ায় কি খাইবে বা শিশু সন্তান, বালক-বালিকাদের কি খাইতে দিবে ভাবিয়া কাঁদিতেছে। আমার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল ও তাহাদের কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিলাম।"

.....একদিন দ্বিপ্রহরে আহারের পর পায়খানায় যাইয়া দেখি মেথরেরা ভুক্তাবশিষ্টের টিনগুলি আনিয়া মল পুড়াইবার স্থানে ঢালিয়া জমা করিয়াছে, আর সেখানে বহু আরবী বালক বালিকা স্ত্রীলোক আমাদের ভুক্তাবশিষ্ট হাড়গুলি বাছিয়া লইয়া কেহ চুষিতেছে কেহ পোঁটলা বাঁধিতেছে। আমি অবাক হইয়া তাহাদের দুর্দশার কথা ভাবিতে থাকি। ভাবি দেশে যুদ্ধের পরিণতির কথা।"

বাঙ্গালী পল্টনে গলদের অন্ত ছিল না। ডাঃ রায় চৌধুরী 'আমার যুদ্ধযাত্রা'য় বাঙ্গালী অফিসার এবং সিপাহীদের যে কলংকের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন তা' সত্যই লজ্জাকর। জুনিয়ার ও সিনিয়ার ভিত্তিক বিদ্বেষ-ভাব খুব প্রবল ছিল বাঙ্গালী সেনাদলে। ৪৯ নং রেজিমেন্ট ছাড়াও করাচিতে ৬০০০ বাঙালী সৈন্য মোতায়েন ছিল তাদের মধ্যে বাঙালীর গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অনেকের মনেই ছিল না।

ডাঃ রায়চৌধুরী লিখেছেন—

অনেক ভবঘুরেও ভাবের প্রাবল্যে (ইহাতে বাঙালী রেজিমেন্টে) প্রবেশ করিয়াছিল। মোট কথা যাহারা যুদ্ধে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশ খুব নিরীহ, শান্তশিষ্ট প্রকৃতির ছিল, তাহা নয়। উক্তরূপ লোকেদের মধ্য হইতেই যাঁহারা অফিসার হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেই যে খুব বিচক্ষণ, ধীরস্থির প্রকৃতির ছিলেন তাহা নয়। শিক্ষিত, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ব্যক্তি দেখিয়া অফিসার খুবই কম করা হইয়াছিল। শারীরিক পরিশ্রমী ও বাধ্য হওয়া সিপাহীদের প্রধান গুণ। আর অধিকাংশ সিপাহী-দেরই ঐ দুইটি গুণের অভাব ছিল।"

(২) "সরকারের নিয়মানুসারে ভারতীয় অফিসাররা সিপাহীদের হইতে পৃথক থাকিতে পৃথক কোয়ার্টার বা তাঁবু পাইয়া থাকেন। অন্য সকল রেজিমেন্টে দেখা যায় যদিও জমাদার সুবাদারের পৃথক কোয়ার্টার বা তাঁবু থাকে কিন্তু সর্বদা মেলামেশা খেলাধূলা গল্পগুজব সবই করে সাধারণ সিপাহীদের সঙ্গে সাধারণ পোষাকে। বুঝিতে পারা যাইত না কে সিপাহী আর কে অফিসার।.....কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী পল্টনে এমন হইল যে ইণ্ডিয়ান অফিসার-দের পৃথক মেস হইল সাহেবী ধরণে টেবিলে, ডিসে কাঁটা-চামচে আহার চলিতে লাগিল। সিপাহীরা হইল তাঁহাদের খানসামা বাবুর্চি, আর্দালী। প্যারেড গ্রাউণ্ডেও রক্তচক্ষু ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না।"

সেনাদলে যে অনেক অনুপযুক্ত লোক ঢুকে পড়েছিল সে সম্বন্ধেও ডাঃ রায়চৌধুরী তাঁর অমূল্য গ্রন্থে গভীর আক্ষেপ করেছেন—

"এখানে অনেক অল্প বয়স্ক যুবক, যাহাদের বয়স মাত্র ১৫।১৬।১৭।১৮ একটি ভাবের প্রাবল্যেই হউক অথবা রাজার যা দেশের জন্যই হউক, বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়া পালাইয়া আসিয়াছে। ইহাদের অনেকেই স্কুল-কলেজের ছাত্র তাহারা এখানে আসিয়া বহু খারাপ লোকের সঙ্গে মিশিয়া মদ সিগারেট ও গাঁজাও খাইতে শিখিয়াছিল। এখানে যেমন সরল তরল মতি স্কুল-কলেজের ছাত্র আসিয়াছিল। তেমনি বহু ভবঘুরে পাকা বদমায়েসও আসিয়াছিল। মাতাল ও বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। এই সমস্ত দুষ্ট ব্যক্তি সৈন্য বিভাগের কড়াকড়িতে বাহিরে যাইয়া দুষ্কর্ম করিতে না পারায় অল্প বয়স্ক তরল মতি বিশুদ্ধ কিশোরদের কুশিক্ষা দিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিতে লাগিল।"

বাঙালীর সুনাম রক্ষার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত এমন সৈনিকও বাঙালী রেজিমেন্টে অনেক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ডাঃ হরিমোহন রায়চৌধুরীর নাম সকলের আগে করা

যেতে পারে। তাঁর মরমী দৃষ্টি যাঁদের মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়েছিল তাঁরা হলেন—ব্রহ্মানন্দ বৈষ্ণব গোস্বামী, হেমন্ত কুমার বসু, জগদীশ চন্দ্র বর্দ্ধন, ত্রৈলক্যনাথ হালদার, ফনীভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বসু, মোহিতমোহন মুন্সী, জিতেন্দ্রনাথ দত্তরায়, দেবী সোম, রবীন্দ্রনাথ আচার্য প্রভৃতি। এঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন যাতে রেজিমেণ্টের লোকেরা অসৎ পথে না যায়, তরল মতি যুবকগণ নষ্ট না হয়। কিন্তু সকলের চেয়ে বাঙ্গালী রেজিমেণ্টকে স্থায়ী করবার জন্যে যিনি সব চেয়ে বেশী চেষ্টা করেছিলেন তিনি হলেন জমাদার রণদা সাহা।

১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে ডাঃ রায়চৌধুরী পুলিশ-ইন চার্জের পদে নিযুক্ত হন। তখন রেজিমেণ্টের ষ্টোর হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ঘটে। নজরুল ইসলাম তাঁর লেখা কবিতা পড়ে শুনাতেন আর ডাঃ রায়চৌধুরী মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। তাঁর সম্বন্ধে তিনি এই গ্রন্থে যা লিখেছেন তা সত্যই সকলের ঔৎসুক্য জাগাবে।

"দেখিতাম তাঁহার ডিউটির বাহিরে তিনি প্রায়ই হারমোনিয়াম লইয়া কবি রবি ঠাকুরের বিবিধ গান কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে গাহিয়া বেড়াইতেন।' তখন তাঁহাকে রবিঠাকুরের ভক্ত বলিয়া মনে হইয়াছিল। আমি তাঁদের নিকট হইতে রবিঠাকুরের কয়েকটি গান সুর সমেত আদায় করিয়াছিলাম। একদিন ষ্টোর অফিসে যাইতে তিনি বলিলেন, তিনি সম্ভবই বাড়ী যাইবেন। সেখানে যাইয়া যাহাতে পুলিশ সাবইন্‌স্‌পেকটারের একটা কাজ পাইতে পারেন তজ্জন্য কমাণ্ডিং অফিসারের মারফৎ জেলা মেজিষ্ট্রেটের নিকট এক দরখাস্ত পাঠাইয়াছেন। তাঁহার গানে অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছিল। এ-খবরে অনেকেই দুঃখিত হইল। দেশে আসিয়া দেখিলাম তিনি দারোগা না হইয়া জেল খাটিতেছেন। আর জেল হইতে বাহির হইয়া দেশের যুবকদের দেশাত্মবোধের অগ্নিবর্ষী কবিতা লিখিয়া দেশবরেণ্য কবি হইলেন। ভাগ্যের কি বিচিত্র গতি?" ডাঃ রায়চৌধুরী ১।১১।১৯ তারিখে সেনাবাহিনী থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতার পথে যাত্রা করেছিলেন।

গ্রন্থের শেষে উপসংহারে লেখক প্রশ্ন করেছেন—"বাঙালীকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—হাজার হাজার বাঙালী যুদ্ধে যাইয়া কি শিক্ষা লাভ করিল বা বাঙলাকে কি শিক্ষা দিল? অনেকেই গিয়াছিলেন বাঙ্গালী যে ভীরু নয়, সুযোগ পাইলে অন্য জাতির ন্যায়, ক্লাইভের ন্যায় মসী ছাড়িয়া অসি ধরিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাই প্রমাণ করিতে। কিন্তু সে আশা কি সফল হইয়াছে? বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের উপরওয়ালারা কেহ কি বলিতে পারেন যে বাঙ্গালীর আশা সফল হইয়াছে? কিংবা বাঙলার কোন লোক কি বলিতে পারেন বাঙ্গালীর পূর্ব কলঙ্ক সম্পূর্ণ রূপে দূর হইয়াছে?"

বাঙ্গালী সৈনিকেরা বোগদাদে ফায়ারিং লাইনে যাবার হুকুম পেয়েছিল। রেজিমেণ্টের ব্রিটিশ মেডিক্যাল অফিসার প্রতিটি সৈনিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানালেন—বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট ফায়ারিং লাইনে যাবার অনুপযুক্ত। তাই বোগদাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাঙ্গালী সৈনিকদের ফিরে আসতে হলো অপমানের বোঝা বয়ে। আরও বড় কলঙ্ক ছিল তাদের সে হচ্ছে 'কুটে বাঙ্গালী পল্টনে হত্যাকাণ্ড।' বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের 'বি' কোম্পানীর সুবাদার ছিলেন অরুণ কুমার মিত্র। একদিন রাত্রে তাঁকে নিদ্রিত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করল কে। সেই রাত্রেই আক্রান্ত ও আহত হলেন সুবাদার শৈলেন বসু আর জমাদার রাজেন মুখার্জি। তাঁবুর গার্ডরা দুই জন হত্যাকারীকে ধরে ফেলেন। একজন হলেন নায়ক সুকুমার সিদ্ধান্ত, অপরজন সুধীর কুমার চৌধুরী। তাঁদের বিচার হলো। শোনা গেল তারা দোষ স্বীকার করেছেন। কোর্ট মার্শেলে দুজনেরই ফাঁসীর হুকুম হল। যুদ্ধক্ষেত্রেই দুই হত্যাকারীর সমাধি হল। এরই সঙ্গে বাঙ্গালী রেজিমেণ্টের স্থায়িত্ব লাভের আশা চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে গেল। তথাপি ডাঃ রায়চৌধুরী রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার এ, এলব্যারেটের উক্তি উদ্ধৃত করে বাঙ্গালী জাতির উদ্দেশ্যে সর্তকবানী রেখে গেছেন—"প্রায় দুই বৎসর সৈন্য বিভাগে কাজ করিয়া বাঙ্গালী পল্টনের অর্দ্ধেক লোক ও সৈন্যের উপযুক্ত হইতে পারে নাই। ইহা বাঙলার ও বাঙালীর পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা। যদি বাঙ্গালী সৈন্য হইতে চায়, এবং হিন্দুস্থানের অন্যান্য যোদ্ধৃ জাতির সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইতে চায় তবে তাহাদের এ জন্য যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিতে হইবে। কলিকাতার বাঙ্গালী বাবু হইলে চলিবে না। এজন্য বাল্যকাল হইতে তাহাদের পরিশ্রমী কষ্ট সহিষ্ণু ও উপরওয়ালার বাধ্য হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। তবেই হিন্দুস্থানের অন্যান্য বীরজাতির সমতুল্য হইতে পারিবে।"

ডাঃ রায়চৌধুরী বাঙালী রেজিমেণ্টের দুর্বলতাও ব্যর্থতার যে চিত্র দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন তাতে বাঙালী জাতির চেতনা জাগ্রত হবে কি?

আণবিক বিস্ফোরণে আইনষ্টাইনের দায়িত্ব কতটা ?

সন্তোষকুমার দে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আণবিক বোমা আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হল, তারপর হল হাইড্রজেন বোমা এবং তারও পর নিউট্রণ বোমা। এইসব বোমার সংহার শক্তি কত ভয়ংকর তা আজকের দিনে কারও অজানা নয়। কিন্তু এই প্রচণ্ড ধ্বংস-শক্তির আবিষ্কারে মনেপ্রাণে শক্তিবাদী মানব-দরদী অহিংস আইনষ্টাইন কতটা দায়ী ছিলেন তা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে কিছুটা সন্দেহের অবকাশ আছে।

১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন আণবিক তত্ত্বের মূল সূত্র—$E=mc^2$ অর্থাৎ Energy contained in matter is equal in erges to its mass in grams multiplied by the square of the velocity of light in centimeters per second জগতে প্রকাশ করলেন; সেদিন কি এই শান্ত-শিষ্ট বিজ্ঞানী একবারও কল্পনা করতে পেরেছিলেন, এই সূত্রের মধ্যেই বীজাকারে সুপ্ত রয়েছে বিশ্ব ধ্বংসের মারণাস্ত্র? ভৌত পদার্থের মূলীভূত সত্তা যে পরমাণুই একথা আমাদের দেশের ঋষি কনাদই প্রথম বলেছিলেন ডেমোক্রেটাস-এর (খৃঃ পূঃ ৪২০ অব্দ) অনেক আগে।

এই সূত্র প্রকাশ হওয়ার অনেক দিন পরে ১৯২১ সালে প্রাগে এক তরুণ জার্মাণ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের কাছে এসে তাঁকে বললেন, অংকের আকারে যে সূত্রটি দিয়েছেন, তার অন্তর্নিহিত অর্থটি আমাকে ব্যাখ্যা করে বলুন। তখন আইনষ্টাইন বললেন, এর অর্থ হল যদি একটা পরমাণুকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় এবং পরে আবার সে দুটি ভাগকে ওজন করা হয় তা হলে দেখা যাবে, অবিভক্ত পরমাণুটির যে ওজন ছিল ভাগ করার পর সে ওজন আর নেই—ওজন অতি সামান্য পরিমাণে কমে গিয়েছে। ওজন কমে যাবার কারণ হল, বিভাজনের সময় পরমাণুটির কিছু অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তখন বিজ্ঞানী তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, বিভাজনজনিত ঐ শক্তির পরিমাণ কত? আইনষ্টাইন বললেন, সে শক্তি হবে অসীম Square of time। তখন বিজ্ঞানীটি আবার বললেন, একটি মাত্র পরমাণু থেকে যদি এই অপরিসীম শক্তি পাওয়া যায় তাহলে সেই শক্তিকে সংহত করে তো ভয়ংকর মারণাস্ত্রে পরিণত করা যায়। শুনে শক্তিবাদী আইনষ্টাইন বললেন, ও সব কথা থাক।

এই ঘটনা থেকে মনে হয়, আইনষ্টাইন তাঁর গবেষণা-লব্ধ সূত্রটিকে কোন দিনই ধ্বংসের কাজে লাগাতে চান নি। তখন পর্যন্ত তিনি আণবিক তত্ত্বের তত্ত্বগত অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দিকটার কথাই ভেবেছিলেন, তার ব্যবহারিক দিকটা একবারও চিন্তা করেন নি। তারপর প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে যখন জার্মানীতে প্রস্তুতি পর্ব চলছে তখন (১৯৩০ সাল) অনেক পদার্থ বিজ্ঞানীরা আইনষ্টাইনের সূত্র $E=mc2$-এর ব্যবহারিক দিক নিয়ে গোপনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে আরম্ভ করলেন। আইনষ্টাইন সম্ভবত সে খবর রাখতেন না। ১৯৩৪ সালে একটি বিজ্ঞান আলোচনা সভার কথা অধ্যাপক কনডন উল্লেখ করে বলেন, এই আলোচনা সভায় এক বিজ্ঞানী ঐ সূত্রের ব্যবহারিক দিক নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করে এর সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। সভায় আইনষ্টাইন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সূত্রের ব্যবহারিক দিকটা কাজে পরিণত করা সম্ভব, সেটা তিনি একেবারেই বিশ্বাস করতে চান নি; তাই আলোচনার শেষে অবিশ্বাসের সুরে বলেছিলেন—তাই নাকি?

এর আরও কিছুদিন পরে আর একটি বিজ্ঞান আলোচনা সভা বসে। সেখানেও কয়েকজন বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁর সমীকরণ অনুসারে পরমাণুকে বিভক্ত করলে সত্যি সত্যি কি অশ্রুতপূর্ব শক্তি আহরণ করা

যাবে ? উত্তরে আইনস্টাইন বলেছিলেন, তত্ত্বের দিক দিয়ে সত্যি হলেও, ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে সেটা সম্ভব নয় ; কারণ পরমাণুকে ভাগ করা যায় না। "পরমাণু বিভাজনের চেষ্টা হল, কতকটা অন্ধকারে আকাশে যেখানে সামান্য কয়েকটা পাখি আছে, তাদের মারবার চেষ্টা করার মতো।" পরমাণু বিভাজন সম্বন্ধে এতই অবিশ্বাসী ছিলেন তিনি। এই সভায় যে সব প্রথম শ্রেণীর পদার্থবিদ্ ছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁকে সমর্থন করলেন। করলেন না কেবল বিজ্ঞানী Le Szilard। তিনি এ বিষয়ে আংশিক ভাবে সফল হয়েছিলেন এবং তাঁর গবেষণার ফলাফল গোপনীয় বিষয় হিসেবে ব্রিটিশ এড্‌মিরালটির কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।

আইনস্টাইন ছিলেন মনেপ্রাণে অহিংস ও শান্তিবাদী। প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, "যদি আবার যুদ্ধ বাধে তা হলে, যুদ্ধে প্রকাশ্যে বা অপ্রত্যক্ষভাবে নিজে তো কোন সাহায্যই করব না উপরন্তু আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলকেই এই রকম কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

আইনস্টাইন পরমাণু বিভাজন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আপেক্ষিক তত্ত্ব যাতে সকলের বোধগম্য হয় তাই নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ক্রমাগত আলোচনা করতে লাগলেন। কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। ১৯৩২ সালে হিটলার হয়ে উঠলেন জার্মানীর সর্বেসর্বা। জার্মান পত্রিকাগুলোতে এখন থেকে "ইনটারন্যাশনাল ট্রিজন" শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে বার হতে লাগল। এই সব প্রবন্ধে আইনস্টাইন, হাইনরিস, টমাস মান, আর্ণল্ড সোরাইজ প্রভৃতি ইহুদি বুদ্ধিজীবিদের দেশের শত্রু বলে বর্ণনা করা হতে লাগলো। হিটলারের বিশুদ্ধিকরণ নীতি (Purge) আরম্ভ হল ১৯৩৩ সালে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি থেকে ইহুদি সম্প্র দায়ভুক্ত সমস্ত অধ্যাপক একে একে বিতাড়িত হতে লাগলেন। এল ১৯৩৪ সাল। এবার সিলার্ড (Szilard) টেলার, পার্লস, ফ্রিশ, অটোস্টারণ, হান্স, ম্যাক্সবর্ণ এবং ভিকটর বাইসকফ বিতাড়িত হলেন—সেই সঙ্গে বিতাড়িত হলেন তিন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, জ্ঞানতপস্বী আইনস্টাইন। এঁদের মধ্যে ৬ জন হলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর আইনস্টাইন আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়ে প্রিন্সটন বিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। ততদিনে জার্মানীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়েছে। ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে জগতের সবচেয়ে চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সফল হল। আইনস্টাইনের ভূতপূর্ব সহকর্মী কাইজার উইলহেল্ম ইনস্‌টিটিউটের অধ্যাপক ওটো হান ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রীন (নিউক্লিয়াস) দু'ভাগে ভাগ করতে সক্ষম হলেন। আরম্ভ হয়ে গেল এই দিন থেকেই পরমাণু যুগের সূচনা। এই পরমাণু বিভাজনের কথা অবশ্য তখনও বহির্বিশ্বে কেউ জানতে পারে নি।

১৯৩৯ সালে আরম্ভ হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তাই পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞানীরা পরমাণু বিভাজনের কথা আবার নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করলেন। এ ছাড়া হিটলারকে রুখবার আর অন্য কোন পথ নেই। এই পরমাণু বিভাজন কাজে ঋষিপ্রতিম স্থিতধী আইনস্টাইন প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষভাবে বেশ খানিকটা জড়িয়ে পড়লেন। তবে তিনি কতটা জড়িত ছিলেন সে কথা নিশ্চয় করে বলা শক্ত। একজন বিজ্ঞানী কিন্তু বলেন আইনস্টাইন পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

Frirz Herber, "A scientist belonged to the world during times of peace but to his country during times of war" বলে তাঁকে উত্তেজিত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনস্টাইন পরমাণু বিভাজনে কতটা সাহায্য করেছিলেন সেটা সাধারণের অজানা। এ বিষয়ে একমাত্র ম্যানহাটান প্রোজেকটের সামরিক কর্তৃপক্ষই যথার্থ আলোকপাত করতে পারেন। জোলিও কুরি, টমসন, ম্যাক্স প্ল্যাংক, নীলস্‌বোর প্রভৃতি সমস্ত প্রথম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নতুন করে ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। তাঁরা জানতে পারলেন ইউরেনিয়ম—২৩৫ থেকে প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ

পাওয়া যেতে পারে যা বিস্ফোরক হিসেবে মামুলি বিস্ফোরক থেকে লক্ষলক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী।

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আইনস্টাইন পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাবনা ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারেন নি। ইউরেনিয়ম পরমাণুর প্রচণ্ড শক্তি সংহত করে তা থেকে বোমা তৈরি করা সম্ভব সেটা ১৯৪৩ সালেও বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পেরেছিলেন নীলসবোর। তাই আইনস্টাইন বলেছিলেন,—"পরমাণু বিভাজন করে তার প্রচণ্ড শক্তি সংহত করা আমার জীবদ্দশায় সম্ভব হবে সেটা সত্যি সত্যি আগে থেকে বুঝতে পারি নি। আমার ধারণা ছিল, এটা তত্ত্বগত ভাবে সম্ভব।"

১৯৩৯ সালে নীলসবোর ইউরেনিয়ম—২৩৫ পরমাণু বিভাজন সম্ভব বলে উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন; তবু এর পরীক্ষা এক বছরের জন্যে আমেরিকার বন্ধ রাখা হল। জার্মানীতেও পরমাণু বিভাজনের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, সে কথা ১৯৪৩ সালে জানাজানি হয়ে গেল। বিজ্ঞানী সিলর্ড (পাছে আমেরিকা পরমাণু অস্ত্রে জার্মানীর পিছনে পড়ে যায় সেই ভয়ে) একখানি দীর্ঘ পত্র মুসাবিদা করে আইনস্টাইনকে পাঠিয়ে দিলেন এই অনুরোধ করে যে, তিনি যেন পত্রখানি সই করে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে পাঠিয়ে দেন। জোলি কুরি, ফার্মি, ওৎসিলার্ড গবেষণাগারে পরমাণু বোমা তৈরি করার সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন বলে ৭ই মার্চ, ১৯৪৪ সালে রুজভেলটকে জানান। আইনস্টাইন প্রেসিডেণ্ট রুজভেলটকে সিলার্ডের মুসাবিদে করা যে দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, তাতে এক জায়গায় আছে—"অনুমান করা যায়—যদিও এই অনুমানের সত্যতা খুব সীমিত—এই পরীক্ষার ফলে অতি উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট এক নতুন ধরণের বোমা তৈরি হতে পারে। এই রকম একটি মাত্র বোমা আশপাশের সমগ্র এলাকা সমেত একটা গোটা বন্দরকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তবে এই ধরণের বোমা এত ভারী হবে যে তা আকাশপথে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।"

এই রকম একখানা চিঠি নয়; পর পর আরও দুখানা চিঠি মুসাবিদে করে আইনস্টাইনকে পাঠানো হল সাক্ষর করে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে পাঠাবার জন্যে। এই পত্রগুলি পাবার পর রুজভেল্ট "রিগস্ কমিটি" নামে এক কমিটি গঠন করলেন। এই কমিটি, "ন্যাশনাল ডিফেন্স রিসার্চ কমিটি"র অধীনে ১৯৪২ সালে কয়েক কোটি ডলার ব্যয়ে "ম্যানহাটান প্রোজেকট" গঠন করলেন। ম্যানহাটান প্রোজেক্ট পারমাণবিক বোমা তৈরি কাজে সাফল্য লাভ করেন। এই সংস্থার বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন বিভক্ত ইউরেনিয়াম পরমাণু হতে উদ্ভূত শক্তি সংগ্রহ করে পরমাণু বোমা তৈরি করলেন, তা টন টন ওজনের না হয়ে কয়েক পাউণ্ড ওজন হলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে অক্লান্ত চেষ্টার পর ম্যানহাটান প্রোজেক্ট আণবিক বোমা তৈরি করে ফেললেন। ১৯৪৯ সালে জর্জ ওয়াসিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের হেজেরীয় অধ্যাপক এডওয়ার্ড টেলার হাইড্রজেন বোমা তৈরি করলেন।

১৯৫২ সালে একজন পত্রলেখক আণবিক বোমা তৈরি সম্বন্ধে তাঁর অবদান বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলে আইনস্টাইন বলেছিলেন,—"ব্যবহারিক বিজ্ঞান (এপ্লায়েড সায়েন্স) নিয়ে কখনও কাজ করি নি, সামরিক উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের আলোচনার কথা তো দূরস্থান। সত্যি সত্যি জীবনভোর আমি শান্তিবাদী গান্ধীকেই এ যুগের একমাত্র সত্যিকারের রাজনীতিজ্ঞ মনে করি।"

বিশ্বের উৎপীড়িত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইহুদিদের উদ্দেশ্যে ১৯৫৩ সালে ১২ই জুন অরিথে নিউইয়র্ক টাইমস-এ তাঁর এক উপদেশবাণী প্রকাশিত হয়েছিল "সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবীদের অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হলে কি করা উচিত? এ-বিষয়ে খোলাখুলিভাবে বলতে হলে বলতে পারি, গান্ধীর যুগান্তকারী অসহযোগ আন্দোলনই একমাত্র পথ।"

অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে কি করা উচিত, সে বিষয়ে আইনস্টাইন এক বন্ধুকে লিখেছিলেন,—"গান্ধীজীর পন্থার সম্ভাব্যতা যা সংখ্যালঘুদের নৈতিক শক্তি যোগায়, তার ওপর জোর দিতে এবং তা পরীক্ষা করে দেখতে বলার সুযোগ কখনও হারাই নি।" শান্তিবাদী

গান্ধীজী ও তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে আইনস্টাইন সত্যি সত্যি খুব শ্রদ্ধা করতেন; তাই এই সব কথা বলতে পেরেছিলেন।

এখন জিজ্ঞাস্য মানবদরদী, চিরশান্তিপ্রিয় স্থিতধী আইনস্টাইন এইরকম বিধ্বংসী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে সাহায্য করলেন কেন? সমগ্র ইহুদি জাতের ওপর যুগ যুগ ধরে অন্যায় ও অত্যাচারে কি তিনি মানসিক সাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন? মানুষের সহ্যের যে সীমা আছে, সেই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় তাঁর মতের পরিবর্তন হয়েছিল? না এতদিনে বুঝতে পারলেন শান্তিবাদী হতে হলে শক্তিমান হতে হবে? দুর্বলের শান্তিবাদ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, তাই যুদ্ধের সময় এক বন্ধুকে বলেছিলেন, তিনি আর শান্তিবাদী নন, শান্তিবাদের সীমা আছে; অবিমিশ্র শান্তিবাদী হলে সমস্ত পৃথিবী, মানব জাতির শত্রু যারা তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়বে। আঘাত দিয়েই আঘাত রুখতে হবে। "সুসংহত শক্তি অনুরূপ সুসংহত শক্তির দ্বারাই ব্যবহৃত হতে পারে। একথা বলতে দুঃখ হলেও বলছি; এছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই।" একথা বলার ১২ বছর পরে আবার বলেছিলেন,— "আমি নিঃসন্দেহে শান্তিবাদী হলেও একথা বলব, এমন অবস্থা কখনও কখনও আসতে পারে যখন বল প্রয়োগ ছাড়া অন্য গতি থাকে না; যেমন ধরা যাক শত্রু যখন আমাকে এবং আমার স্বজাতিকে ধ্বংস করতে কৃতসংকল্প তখন বল প্রয়োগ ছাড়া আর কি করা সম্ভব?"

তাই বুঝি ইজরাইলের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে বল প্রয়োগ নীতি সরাসরি সমর্থন করেছিলেন। স্বধর্মীদের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে বলেছিলেন "প্যালেস্টানিয়ানদের ভাগ্যের ওপরই পরিনামে পৃথিবীর অবশিষ্ট সমস্ত ইহুদি সম্প্রদায়ের ভাগ্য নির্ভর করছে। যারা নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করে না তাদের কেউ সম্মান করে না। আমরা দুঃখিত যে, যে উপায় অবলম্বন করতে যাচ্ছি তা আমাদের নিজেদের কাছেও অপ্রীতিকর ও মূঢ়তার পরিচায়ক; কিন্তু এ উপায় থেকে মানবজাতি আজ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করতে পারে নি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে সকলের আগে সর্বোতভাবে আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার চেষ্টা করতে হবে।" দেখা যাচ্ছে অবস্থার দাস হয়ে স্বভাব শান্তিবাদী শক্তিবাদীতে রূপান্তরিত হলেন।

এই বছরই Wroclaw-তে (ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব ইনটেলেকচুয়ালস) যে বুদ্ধিজীবীদের সভা বসেছিল তাতে কিন্তু যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তাতে তাঁর হৃদয়ের ক্ষোভ ব্যক্ত হয়েছিল:—

"আমদের মতো বিজ্ঞানীদের, যাদের করুণ নিয়তি হল ধ্বংসের কাজকে আরও ভয়ংকর ও সুনিশ্চিত করা, এখন থেকে তাদের কর্তব্য হবে এইসব ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক অস্ত্র আর যাতে কখনই ব্যবহৃত না হয় তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করা।"

আইনস্টাইনের চরিত্রে এই আপাত বিরোধী মনোভাব দেখে একজন সমালোচক বলেছেন,—

"Einstein was, even more obviously than most human beings, a one-off model. His genius was linked with attributes not only of the saint but also of the rogue elephant..... But his weakness in a predatory world was that of the man who speaks the truth by an inner compulsion; thus his ability to disregard his wartime activity suggests a psychological failing rather than dishonesty."

এ মন্তব্য খুব সমাচীন বলে মনে হয়।

১৯৫৪ সালে লাইমন পালিং-কে লিখেছিলেন,— "জীবনে আমি একটা মস্ত বড় ভুল করেছি, সে ভুলটা হল পরমাণু বোমা তৈরী করার জন্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-এর উদ্দেশ্যে যে চিঠিটা খসড়া করে আমাকে পাঠান হয়েছিল, তাতে আমি সাক্ষর করেছিলাম। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে এইটুকু বলতে পারি যে, পাছে জার্মানী আগে থেকে এই বোমা তৈরি করে ফেলে সেই ভয়েতেই চিঠিতে সই করেছিলাম।"

এই বছরই বিজ্ঞানীদের অসহায় অবস্থা দেখে আমেরিকার এক পত্রিকায় আইনস্টাইন লিখেছিলেন—"আবার যদি

যৌবন ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় এবং কিভাবে জীবিকা অর্জন করব, সেটা যদি ভাবতে হয় তাহলে জোর করে বলতে পারি বিজ্ঞানী, পণ্ডিত বা শিক্ষক হবার চেষ্টা আর করব না; তার চেয়ে বরং কলমিস্ত্রী বা ফেরিয়ালা হব; কারণ তাদের যে স্বাধীনতা আছে বর্তমান অবস্থায় বিজ্ঞানীদের সে স্বাধীনতা নেই।" বড়ই করুণ, মর্মস্পর্শী অসহায়ের আর্তনাদ।

আইনস্টাইনের এই পত্র ও বিভিন্ন সময়ে তাঁর মন্তব্যগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে ধারণা হয় তিনি স্বেচ্ছায় পরমাণু বোমা তৈরির কাজে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন নি। যে দেশে তিনি শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেলেন, সেখানকার ভালমন্দের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য নিশ্চয় জড়িয়ে পড়েছিল; কাজেই ইচ্ছের হোক আর অনিচ্ছের হোক তাঁকে এ বিষয়ে (বোমা তৈরি) সাহায্য করতে হয়েছিল। তা ছাড়া পরমাণু বোমা তৈরি হলে সেটা তাঁর শত্রু দেশ জার্মানীর ওপর পড়বে, এটাই ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস। অনেক পরে যখন জানতে পারলেন বোমা জাপানে ফেলা হয়েছে এবং তার ফলে হিরোসিমা ও নাগাসিকা, দুই শহরের প্রত্যেকটিতে ১৩০,০০০ করে নিরপরাধ নরনারী ও শিশু পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে, তখন ডুকরে কেঁদে বলেছিলেন, "Oh wch;" যা বাংলায় "হায়, হায়" বলে অনুবাদ করলেও তাঁর হৃদয়ের ব্যথা ও হতাশার পরিধি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না।

বোমা তৈরিতে সাহায্য করার জন্যে আইনস্টাইনের দুঃখ বা লজ্জা পাবার কোন কারণ দেখি নে। তিনি সাহায্য না করলেও বিশেষ কিছু এসে যেত না; কারণ এইসময় জার্মানী থেকে তাড়িত হয়ে যে সব প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরা আমেরিকায় এসে ভীড় জমিয়েছিলেন, তাঁরা এ বোমা অনায়াসেই বানাতে পারতেন। তবে হয়ত কিছু দেরি হত। ১৯৪৫ সালে সেটা হয়ত তৈরি হত না, হত কিছু পরে।

আইনস্টাইনের জীবনে আপাতবিরোধী মনোভাব দেখা গেলেও তিনি ছিলেন সত্যকারের মানবদরদী সাধক ও প্রেমিক। তাই বলি, শেষ জীবনে যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন, তা হলে আমাদের কবির কাছেই তোমার সান্ত্বনা মিলবে, "মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইতে এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষ যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মত অসঙ্গত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে; মহত্বেরই গৌরব দুঃখ।"

আজ তোমার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে হে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী তোমারে জানাই হৃদয়ের ভক্তি ও ভালবাসা আর প্রণতি। বিশ্ববাসীর হৃদয় ভরা থাক তোমার স্মৃতিসুধায়। তুমিই বলতে পার :—

"নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
অদ্যৈব করণমস্তু শতাব্দা'তরে বা
ন্যায়াৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ ॥"

লোকে স্তুতিই করুক আর নিন্দাই করুক, লক্ষ্মী আসুন বা ফিরে যান, দেহপাত আজ হোক বা শত বৎসর পরেই হোক যেন সত্যপথ থেকে স্খলিত না হই।

এ বাণীই যেন ছিল এই একাকী নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ পুরুষের মর্মকথা।

নিশিকান্ত

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়

গয়া স্টেশন।

ট্রেন থেকে নেমে একটা রিক্সা নিলেন সুরেশবাবু। যাবেন ধর্মশালায়। স্টেশন থেকে বেরুতেই অনেকগুলো পাণ্ডা তাঁকে ঘিরে ধরেছিল বটে, কিন্তু তিনি কারো কথায় কান দেন নি। তাঁর বন্ধুর ধর্মশালা থাকতে কেন যাবেন ওদের আড্ডায়?

বন্ধুটি থাকেন কলকাতায়। তাঁর কাছ থেকে একখানা পরিচয়-পত্র এনেছেন সুরেনবাবু। পত্রখানা দেখাতেই ধর্মশালার ম্যানেজার খুব খাতির করলেন তাঁকে। একটা চেয়ারে বসতে দিয়ে বললেন, কি রকম ঘর চাই? মানে, কি ধরণের ঘর হলে সুবিধে হয় আপনার?

সুরেনবাবু বললেন, একটু নিরালায় থাকতে চাই। আমি গোলমাল একেবারে সইতে পারিনে।

ম্যানেজার মশায় অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, কিছুদিন আগে যদি আসতেন, আপনার পছন্দমত একখানা ঘর দিতে পারতাম। কিন্তু এখন তীর্থযাত্রার মরশুম শুরু হওয়ায় সব সময়েই যাত্রীর আনাগোনা চলছে। বুঝতেই তো পারছেন অবস্থাটা। মানে, এই পরিস্থিতিতে আপনার ঠিক মনের মত ঘর হয়তো দিতে পারবো না।

সুরেনবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে ম্যানেজার সাহেব তাঁর হাত দুটি ধরে বললেন, দয়া করে কিছু মনে করবেন না। মানে, যাত্রীদের সংখ্যা এত বেশী যে, এই একটা বাড়ীতে স্থান-সঙ্কুলানের অভাবে অনেককে জায়গা দেওয়াই সম্ভব হচ্ছে না, তাদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি।

সুরেনবাবু বললেন, কিন্তু আপনাদের তো আরও একটা বাড়ী আছে? সেখানেও কি একটু নিরালা জায়গা পাওয়া যাবে না?

—আমাদের পাশের বাড়ীটার কথা বলছেন? ম্যানেজার মশায় চোখ কপালে তুলে বললেন, সেখানে থাকবেন আপনি? বলছেন কী?

সুরেনবাবু বললেন, কেন, সেখানে কি আমার মত সাধারণ মানুষের থাকবার অধিকার নেই?

—না, না, সেকথা আমি বলিনি। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। ম্যানেজার বললেন, আমি বলতে চাইছি যে সেখানে থাকা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কেউ থাকে না ও-বাড়ীতে।

—কেন?

—বাড়ীটার দোষ আছে।

—ভূতের বাড়ী?

—সবাই তো তা-ই বলে।

—কিন্তু ভূত জিনিসটাকেই যে আমি বিশ্বাস করিনে। হো হো করে হেসে উঠলেন সুরেনবাবু।

—তবু আপনাকে ওই বাড়ীতে আমি রাখতে চাই না। ম্যানেজার মশায় এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, আপনার মত অনেকেই সাহস করে ওখানে থাকতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।

—বলেন কী? ভূতের এত উপদ্রব? সুরেনবাবু বললেন, তাহলে এ-সুযোগ তো ছাড়া যাবে না। ওই বাড়ীতে আমাকে থাকতেই হবে, অন্ততঃ একটি রাত্তির। স্বচক্ষে একবার ভূত দেখতে চাই।

—কিন্তু আপনার কিছু ক্ষতি হলে আমার যে চাকরি যাবে! ম্যানেজার মশায় চিন্তিত হয়ে বললেন, আপনি হচ্ছেন খোদ মালিকের অতিথি।

—তা হোক, আপনি চিন্তা করবেন না। সুরেনবাবু বললেন, অন্ততঃ একটা রাতের জন্যে আপনি আমাকে ওখানে থাকতে দিন।

কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না ম্যানেজার মশায়। শেষে অনেক বুঝিয়ে রাজি করানো গেল। চাকরকে ডেকে

ভূতুড়ে বাড়ীর তিনতলার একখানা ঘর পরিষ্কার করবার হুকুম দিলেন তিনি।

একটু পরেই নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ভূতুড়ে বাড়ীতে হাজির হলেন সুরেনবাবু। সত্যিই ভূতুড়ে বাড়ীর চেহারা। যেমন নোংরা, তেমনি জরাজীর্ণ। দীর্ঘ দিনের অব্যবহারে বাড়ীটার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। দেয়ালের জায়গায় জায়গায় বালি খসে গিয়ে লাল ইঁট বেরিয়ে আছে দগদগে ঘায়ের মত। জানলা-দরজার কপাটগুলো ভাঙ্গা, নড়বড়ে। ধুলোর রংশবৃদ্ধিতে ঘরের মেঝের রং দেখবার উপায় নেই। আর, সারা বাড়ীটায় ছড়িয়ে আছে কাগজের টুকরো, শালপাতা, ভাঙ্গা কলসী, মাটির ভাঁড় ইত্যাদি। দেখলেই বোঝা যায়, অন্ততঃ দশ বছর এ বাড়ীতে মানুষের বাস নেই। এই বাড়ীর মধ্যেই তিনতলার একখানা ঘর সুরেনবাবুর জন্যে পরিষ্কার করা হয়েছে। ঘরের ফার্নিচার বলতে একখানা পুরোনো আমলের তক্তাপোস আর একটা হাতলভাঙ্গা চেয়ার। তক্তাপোসের একটা পায়া নেই, ইঁট দিয়ে ঠেকা দেওয়া আছে।

ঘর দেখিয়ে দিয়ে চাকরটা চলে গেল। যাবার সময় বললে, যা দরকার হবে সন্ধ্যের আগেই চেয়ে নেবেন। সন্ধ্যের পর কেউ ঢোকে না এ-বাড়ীতে।

বাড়ীটায় ইলেকট্রিক আলো নেই। সুরেনবাবু চাকরকে বললেন, একটা হ্যারিকেন দিয়ে যেয়ো, আর কিছু চাই না।

জিনিসপত্রগুলো ঘরের মেঝেয় রেখে হাতলভাঙ্গা চেয়ারটায় বসলেন সুরেনবাবু। বেশ লাগছে তাঁর। নিরিবিলি জায়গাই তিনি পছন্দ করেন। কান পেতে রইলেন, কোথাও কোনো আওয়াজ হচ্ছে কিনা। সমস্ত বাড়ীটা একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। নিজের নিঃশ্বাসটাও যেন ভয়ঙ্করভাবে কানে বাজে। নিরালা ভালবাসলেও এই রকম জনমানবহীন একটা বিরাট বাড়ীর মধ্যে এবং ঠিক এই রকম পরিবেশে তিনি আগে কখনো থাকেন নি। এই নিস্তব্ধ তাঁর কাছে কেমন যেন একটা আশ্চর্যের ব্যাপার বলে মনে হতে লাগলো। তিনি যেন একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগতে এসে পড়েছেন যেখানে প্রাণের স্পন্দন নেই, মানুষের পদচিহ্ন নেই। ঠিক এতখানি নীরবতা কি তিনি পছন্দ করেন? নিজের কাছেই নিজে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন সুরেনবাবু।

ছাদের ওপর থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। দুপ্ দুপ্ করে পা ফেলে কে যেন হেঁটে চলেছে! ভয় পাবার লোক নয় সুরেনবাবু, তবু কান দুটো খাড়া হয়ে ওঠে। বুঝতে চেষ্টা করেন আওয়াজটাকে, অনেকক্ষণ চিন্তা করে স্থির করলেন, এ নিশ্চয়ই কোনো জন্তুর পায়ের শব্দ। বানর বা ওই জাতীয় কোনো প্রাণী হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাদের ওপর।

সন্ধ্যে তখনও হয়নি। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। অস্তাচলগামী সূর্যের শোভা কতবার মুগ্ধ করেছে তাঁকে, কিন্তু আজ, কেন জানিনে, দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুরেনবাবুর হঠাৎ মনে হলো, ওই লাল সূর্যটা যেন হাঁ করে তাঁকে গিলতে আসছে।

ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার আগেই সুরেনবাবু রাতের খাবার খেয়ে এলেন একটা হোটেল থেকে। তারপর ম্যানেজার মশায়ের সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করে আবার যখন আশ্রয়ে ফিরে এলেন, তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। থম্‌থম্ করছে সমস্ত বাড়ীটা। তাঁর ঘরখানা তিনতলায়। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে মনে হলো কে যেন তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটছে। সুরেনবাবু থমকে দাঁড়ালেন কয়েকবার, কিন্তু অন্ধকারে কাউকে দেখতে পেলেন না।

ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন বেশ ভাল করে। তারপর তক্তাপোসের ওপর বিছানা পেতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। আগের রাত্রে গাড়ীতে ঘুম হয়নি। গাড়ীও 'লেট' ছিল বেশ কয়েক ঘণ্টা। ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল শরীরটা। তাই বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়লেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। মাথার কাছে টিমটিম করে জলতে লাগলো হ্যারিকেনটা।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন খেয়াল নেই। হঠাৎ একটা গোলমালে ঘুম ভেঙ্গে গেল। একি! কান্নার আওয়াজ আসছে কোত্থেকে? অনেকগুলো মেয়ের কান্নার আওয়াজ! এত রাত্রে কাঁদছে কেন মেয়েরা? কী হয়েছে? কাছাকাছি কোনো বাড়ীতে কেউ মারা গেল নাকি?

ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন সুরেনবাবু। বাইরে হু-হু করে হাওয়া বইছে। ঝড় উঠেছে বোধ হয়। হাওয়ার দাপটে জানলাগুলোর কপাটে-কপাটে ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কান্নার আওয়াজটা কান পেতে শুনতে লাগলেন সুরেনবাবু। বাইরে নয়, এই বাড়ীর মধ্যেই কান্নার রোল উঠেছে। কিন্তু কে? কে কাঁদছে জনমানব-হীন এই বাড়ীতে? পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, অনেক নারী-কণ্ঠের আকুলতায় বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাদের বুক ফাটা কান্না এই বাড়ীটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি আত্মগোপন করে আছে যুগ যুগ ধরে? নিশুতি রাতে সেই ব্যথাই বুঝি ঝরে পড়ে এই বিরাট প্রাসাদের পাঁজর ভেদ করে?

কান্নার সুরটা আরো স্পষ্ট করে শোনবার চেষ্টা করেন সুরেনবাবু। এই কান্নার সঙ্গে মাঝে মাঝে একটা গোঙানির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না? পুরুষ-কণ্ঠের ভারি আওয়াজ? মনে হচ্ছে, যেন একটা বাস্তব উপাখ্যানের কোনো নায়ক তার অন্তিম শয্যায় শুয়ে কাতরাচ্ছে, আর তার নায়িকা এবং সখীরা শোকার্ত হয়ে কাঁদছে আসন্ন বিরহ-ব্যথায়। বড় করুণ তাদের বেদনার প্রকাশ! সুরেনবাবু নিজের মনের মধ্যেও একটা ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন।

কিন্তু কে ওই নায়ক আর তার সখীরা? কী তাদের জীবনের ইতিহাস, যার করুণ স্পর্শকাতরতায় যুগ যুগ ধরে এই বাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়ে আছে ওই অশরীরী আত্মাগুলো?

কান্নার আওয়াজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো, যেন আকর্ষণ করতে লাগলো তাঁকে। হয়তো তাদের কোনো ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাস তারা শোনাতে চাইছে একটি জীবন্ত মানুষকে। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সুরেনবাবু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতে লাগলেন হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে। দোতলায় পনেরখানা ঘর—সব ঘরগুলো তিনি খুঁজলেন তন্ন তন্ন করে। কোথাও কিছু দেখতে পেলেন না। শুধু একটানা কান্নার সুর এই বিরাট বাড়ীটার স্তব্ধতাকে যেন চিরে ফেলতে চাইছে খান খান করে।

হ্যারিকেনের আলোটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে দোতলা থেকে একতলায় নামলেন সুরেনবাবু। সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। কোথায় মৃত্যু-যন্ত্রণার গোঙানি আর কোথায় কান্না? সুরেনবাবু সমস্ত ঘরগুলো খুঁজলেন। না, কোনো কিছুরই চিহ্ন পাওয়া গেল না। শুধু হাওয়ার দাপাদাপিতে জানলার কপাটগুলো পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে লাগলো।

সুরেনবাবু ওপরে উঠে এসে নিজের ঘরে ঢুকলেন আবার। বিছানায় বসে চিন্তা করতে লাগলেন ব্যাপারটা নিয়ে। ঠিক এই রকম কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়নি আগে কখনও। আজ এই মুহূর্তে তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছেন। সত্যিই কি প্রেত-জগৎ বলে কিছু আছে? অশরীরী আত্মার কান্না কি সত্যিই শুনতে পাওয়া যায়?

আবার শুরু হলো মৃত্যু-যন্ত্রণার সেই গোঙানি আর নারী-কণ্ঠের সেই বুক-ফাটা কান্না। অত্যন্ত সাহসী হলেও সুরেনবাবু কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। গা ছমছম করতে লাগলো তাঁর। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন সুরেন-বাবু। মন থেকে সমস্ত ভয় দূর করে তিনি উঠে দাঁড়া-লেন আবার। মরীয়া হয়ে উঠেছেন তিনি। এ রহস্যের সন্ধান তাঁকে করতেই হবে। কে ওই প্রেতাত্মারা? কী তাদের পরিচয়? তিনি স্বচক্ষে দেখতে চান তাদের, জানতে চান তাদের ইতিহাস। এ-কাজ করতে গিয়ে তাঁকে যদি মৃত্যু-বরণ করতে হয়, সে-ও ভাল।

সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে সুরেনবাবু আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। পা টিপে টিপে নামতে লাগলেন নীচে, অতি সাবধানে এবং সন্তর্পণে। নিজের পায়ের শব্দ নিজেও যেন শুনতে না পান, এমনভাবে পা ফেলতে লাগলেন। হ্যারিকেনটা এবারে সঙ্গে নেন নি। আগের বারে হয়তো হ্যারিকেনের আলো দেখেই প্রেতাত্মারা পালিয়েছিল। এবার সঙ্গে নিয়েছেন বাঁ হাতে একটা দেশলাই-বাক্স আর ডান হাতে একটা দেশলাই কাঠি। দরকার হলেই কাঠিটা জ্বালবেন। একেবারে প্রস্তুত।

কান্নার আওয়াজটা আসছে একতলা থেকে। পা টিপে

টিপে একতলায় নেমে এলেন সুরেনবাবু। আওয়াজটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যেন একেবারে কানের কাছে শুনতে পাচ্ছেন। কিছুক্ষণ কান পেতে শুনলেন, তারপর যে-ঘর থেকে আওয়াজটা আসছিল সেই দিকে এগিয়ে গেলেন সাবধানে। দরজার একটা কপাট খোলা ছিল, তার ফাঁকে মুখ বাড়াতেই চমকে উঠলেন সুরেনবাবু। একি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ঘরে মধ্যে দেয়ালের গায়ে জোড়া-জোড়া জ্বলন্ত চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে! অন্ততঃ কুড়ি-বাইশটা হবে সংখ্যায়। চোখের আলো সবুজ, ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছে অন্ধকার ঘরের মধ্যে! বীভৎস!

প্রেতাত্মা সম্বন্ধে গল্প শুনেছেন অনেক, কিন্তু তাকে স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ আগে কখনও হয়নি সুরেনবাবুর। আজকের অভিজ্ঞতায় তিনি যেমন বিস্মিত, তেমনি বিমূঢ়। শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ঘরের দেয়ালের দিকে যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে জোড়া-জোড়া অনেকগুলো চোখ, যেন এক-একটি সবুজ আগুনের টুকরো।

নিজের অজান্তেই তাঁর পা-দুটো কখন থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছিল। হঠাৎ খেয়াল হতেই মনে সাহস ফিরে এলো তাঁর। যদি প্রাণ দিতে হয় তো সে-ও ভাল, তবু প্রেতাত্মার মুখোমুখি দাঁড়াবেন তিনি। শুধু জ্বলন্ত চোখ দেখেই তিনি ক্ষান্ত হবেন না, তাদের সত্যিকারের রূপ দেখতে চান তিনি,—সে রূপ যত বীভৎস বা যত ভয়ঙ্কর হোক না কেন।

হাতের দেশলাই-কাঠিটা হঠাৎ জ্বালাতেই যেন মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্যের পট পরিবর্তন হল। কোথায় প্রেতাত্মা, আর কোথায় তাদের জোড়া-জোড়া চোখ? সুরেনবাবু দেখলেন, এক দল বেড়াল পড়ি-মরি হয়ে ছুটে পালাচ্ছে ঘরের জানলা দিয়ে। দেয়ালের গায়ে অনেকগুলো তাক আছে, বেড়ালগুলো ওখানেই বসেছিল এতক্ষণ। অন্ধকারে তাদের জ্বলন্ত চোখগুলোকেই প্রেতাত্মার ভয়ঙ্কর চোখ বলে মনে হয়েছিল তাঁর। আর ওই বেড়ালগুলোর কান্নাকেই প্রেতাত্মার কান্না বলে ভুল করেছিলেন তিনি। আশ্চর্য!

কিন্তু এতগুলো বেড়াল কেনই বা এসেছিল এখানে? কিসের লোভে? একটার পর একটা দেশলাই-কাঠি জেলে সুরেনবাবু তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন ঘরের ভেতরটা। চারদিকে তাকাতে তাকাতে একসময় তাঁর নজরে পড়লো, কড়িকাঠের ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো পায়রা বসে আছে। বুঝলেন, ওই পায়রাগুলোকে ধরবার জন্যে বেড়াল আসে এই ঘরে, আর মানুষের কান্নার সুরে চেঁচামেচি করে। পায়রাগুলোও বেড়ালের ভয়ে বকম্‌ বকম্‌ করে ডাকে, যা এতক্ষণ তাঁর কাছে মনে হচ্ছিলো কোনো পুরুষের মৃত্যু-যন্ত্রণার গোঙানি বলে।

বাইরের একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজলো। প্রেতাত্মাদের খোঁজেই সমস্ত রাতটা প্রায় কেটে গেল। মনে মনে একটু হাসলেন সুরেনবাবু। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা সাড়ে-দশটা। অনেকগুলো লোকের চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ। চোখ খুলতেই দেখলেন, স্বয়ং ম্যানেজার-মশায় তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর সঙ্গে রয়েছে আট-দশজন লোক। ঘরের নড়বড়ে দরজার ছিট-কিনি বাইরে থেকেই খুলে ওরা ঘরে ঢুকেছে।

ম্যানেজার মশায়কে অত্যন্ত ভীত এবং চিন্তিত বলে মনে হল। সুরেনবাবুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছেন দাদা?

—ভাল। সুরেনবাবু বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসে বললেন, কাল রাতে ঘুম হয়নি, তাই এতো দেরীতে ঘুম ভাঙলো আজ।

—তা হোক। ম্যানেজার সাহেব যেন কৃতার্থ হয়ে বললেন, আপনি যে এখনও বেঁচে আছেন, এই যথেষ্ট। আমরা তো ভেবেছিলাম আপনাকে আর দেখতেই পাব না। কিন্তু, কাল রাতে ঘুম হয়নি কেন? কিছু ঘটেছিল নাকি?

—হাঁ, সে-এক সাংঘাতিক ব্যাপার।

—তার মানে? কারো কান্নার আওয়াজ শুনেছেন?

—শুধু কান্নার আওয়াজ নয়, স্বচক্ষে দেখলাম

প্রেতাত্মাদের। সুরেনবাবু বললেন, যেমন বীভৎস, তেমন ভয়ঙ্কর তারা।

—বলেন কী! থরথর করে কাঁপতে লাগলেন ম্যানেজারবাবু, তারা কিছু ক্ষতি করেনি তো আপনার?

—না, সেটুকু ভদ্রতা-জ্ঞান তাদের আছে। তাছাড়া, তারা এখানে মানুষ খেতে আসে না, আসে পায়রার লোভে। —বলে নিজের খেয়ালেই হো হো করে হেসে উঠলেন সুরেনবাবু।

মনিব্যাগ

প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্যাপারটা আমাকে আশ্চর্য করেছিল সত্যিই। ওর হাবভাব চাল-চলন সম্বন্ধে আমার ধারণা যা ছিল তা দিয়ে ওর এই ধরণের আচরণের কোন যুক্তি খুঁজে পাইনি।

'অত পয়সা খরচা করবি কেন?'

যতবারই জিজ্ঞেস করলুম ওর মুখের একটা ক্ষণিক গাম্ভীর্য ছাড়া আর কিছুরই ছায়া দেখলুম না, যেন ওর মনের অভিব্যক্তিটা প্রকাশ হতে গিয়েও চক্ষুলজ্জার ধাক্কায় ফিরে ফিরে যাচ্ছিল ভেতরে।

বড়াই করার স্বভাব ওর সব ব্যাপারেই, মুখে বাঘ মারায় ওর জুড়ি মেলা কত দুষ্কর তা আমার জানা ছিল, তাই বুঝেছিলাম ওর মনের ভেতরের কোমল বস্তুটার প্রকাশ ওর চক্ষুলজ্জার কাছে কত শক্তিহীন। সহজ সত্য সরল অনুভূতির কথা বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করা, বুঝতে পারি, ওর কাছে যেন মনে হয় একটা দৈন্যের প্রকাশ আর পরাজয়ের গ্লানির আমন্ত্রণ, যদি কেউ ঠাট্টা করে।

মনিব্যাগ কিনতে গিয়েছিলুম ধর্মতলায় ওর সঙ্গে! বেচারির সাত বছরের পুরান ব্যাগটি যে কোন মহাপ্রভু সবার অলক্ষ্যে ওর পকেট থেকে তুলে নিয়ে ওর বোঝা হাল্কা করে দিয়েছে ও তার চিন্তাতেই বিভোর। শেষে ওর ধ্যানমগ্ন চিত্তের আদেশ হল এই অধীনের ওপর ওর নতুন ব্যাগ কিনতে যাওয়ার সাথী হতে। আদেশ পেয়ে সন্তুষ্ট হইনি। কারণ জানি ওর সঙ্গে বাজার করতে যাওয়া কি নিদারুণ, বিপজ্জনক। দর কষা-কষির ব্যাপারে ও নিজেকে এত বেশী পটু বলে মনে করে যে সে অবস্থায় ভদ্রবেশধারী কোন ব্যক্তিই দোকানদারের বক্তব্য সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না।

এটা ওটা ঘাঁটতে লাগল, একটা হাত বাড়িয়ে টেনে

নিল। তারপর সেটা ছেড়ে আর একটার দিকে আঙুল দেখিয়ে দোকানদারকে সেটা পাড়তে বললে। বার কয়েক সেটা খোলা আর বন্ধ করার পর নামিয়ে রেখে তাকগুলোর চারদিকে তাকাতে লাগল, যেন দেখা যাক কত রকমের ব্যাগ হতে পারে পৃথিবীতে। তারই সঙ্গে চলল ওর অবিশ্রান্ত দাম জিজ্ঞাসার পালা।

অল্প সময়ের ভেতর মনস্থির করার স্বপক্ষে অনেক উপদেশ শুনেছিলুম ছেলেবেলা থেকে এই বয়স অবধি, আর তার মাধ্যমেই নাকি মানুষের মনজগতের একটা ভাল দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পরখ করে দেখার সুযোগ জীবনে খুব কমই এসেছিল। আজকে যেন তার প্রয়োজনটা বেশ ভাল করেই অনুভব করছিলুম ওকে মনে মনে গালাগালি করতে করতে। পুরো একটাকা কি দু'টাকা পর্যন্ত সব খবরের সীমা তার পক্ষে ওই দামী দামী ব্যাগগুলো দর করার পেছনে কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। হয়ত ও নিজের অভিজ্ঞতা বাড়াচ্ছিল,কিন্তু বেশ বুঝছিলুম এই নব উপার্জ্জিত ওর মুখে বাঘ মারার ইন্ধন জোগান ছাড়া আর কোন কাজেই আসবে না, কিন্তু তবুও ওর কাছে বোধহয় ওটাও একটা প্রয়োজন।

'এটার দাম কত মশাই?'

দেখি ও একটা ব্যাগ খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করছে দোকানদারকে। জিনিষটা দেখেই বুঝলুম পুরোপুরি দেশী হলেও ওর দাম শুনে ওকে নিশ্চয়ই আঁতকে উঠতে হবে, কারণ ওর দাম আমার স্পষ্ট আন্দাজে আসে। কিন্তু আশ্চর্য্য আমার আন্দাজ নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও দেখলুম ও একপাও পেছল না বা চমকে উঠল না, আপন মনে ব্যাগটাকে যেন একটা আবেগ দিয়ে দেখতে লাগল। ওর মুখের ওপর দেখলুম, ওর অজ্ঞাতে একটা বেদনার রেশ যেন ফুটে উঠছে। আমার ওপর চোখ পড়তেই ওর সে ভাবটা চলে গেল।

বললুম—নে নে ওসব রাখ, যেটা নিবি নিয়ে চ তাড়াতাড়ি, আমার কাজ আছে।

এইবার আমাকে ও রীতিমত অবাক করল তার সঙ্গে বিরক্তও। কাছে এগিয়ে এসে বললে—আমাকে টাকা ক'টা ধার দিবি? বাড়ী গিয়েই দিয়ে দেব।

'কেন? এ ব্যাগ নিয়ে তুই কি করবি?'

'তুই দে না, বাড়ী গিয়েই দিয়ে দেব। সঙ্গে আনিনি বলেই বলছি।' ধার দেবার ভয়ে আমি বলিনি। বাড়ী গিয়েই ওকে দিতে হবে এও আমি চাই না, দু'দিন দেরী হলে আমার কিছু এসে যাবে না, কিন্তু আমার আসল বক্তব্য ও কানেই তুলল না।

'তোর এত দাম দিয়ে কেনার দরকার কি? যদি অল্পেতেই কাজ চলে?'

বিনয় করেই বললুম, মিছিমিছি এই অহেতুক বিলাসিতা আমার ভাল লাগছিল না। কিন্তু ও দেখলুম দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

তারপর পথে নেমে বাস-ট্রামের ভিড় দেখে হেঁটে হেঁটেই আসছিলুম। ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে হঠাৎ লক্ষ্য করলুম, ও এতক্ষণ কোন কথাই বলেনি, অথচ ওকে নির্ব্বাক অবস্থায় খুব কমই দেখেছি। ওর দিকে তাকালুম, দেখি ও ব্যাগটার ওপর হাত বোলাচ্ছে আপন মনে, আর মুখেতে ফুটে উঠেছে যেন কোন এক ফিরে আসা স্মৃতির ব্যথা। এবার আর আমার চোখে চোখ পড়তে ওর সে ভাব মিলিয়ে গেল না, বুঝলুম এইবার ও ধরা পড়ে গেছে, আর এই হচ্ছে সময়।

মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলুম—বলত সত্যি করে, এই ব্যাগ দেখে তোর কোন আপনজনের কথা মনে পড়ল, আর তার সঙ্গে তোর আলাপই বা ক' দিনের? সাবধানও করে দিলুম, যদি স্রেফ ধাপ্পা দিবি ত' বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

ও একটু শুকনো হাসি হাসল, বলল—'আপনার জনই বটে।' ও আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

আমি খোঁচা দিলুম—বলেই ফেল না।

ও বললে—'সেদিন পথ হারিয়ে একটা এঁদো গলির ভেতর ঢুকে পড়েছিলুম, একেবারে কানাগলি যাকে বলে। বেলা প্রায় দশটা-এগারটা হবে।' ব্যাপারটার ভেতর গুরুত্ব আছে বুঝে ওকে টানতে টানতে নিয়ে এলুম ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভেতর, তারপর একটু ফাঁকা জায়গা দেখে উদগ্রীব হয়ে বসলুম।

ও তেমনই উদাস ভাবে বললে—দেখি সেই গলির ভেতর একধারে একটা চাতালের মতন, টিনের ছাউনি দেওয়া, আর তার নিচে একদল নানা বয়সী মেয়ে বসে বসে ব্যাগ তৈরী করছে। দলে ওদের অল্পবয়সী থেকে বুড়ি বিধবা পর্য্যন্ত ছিল।

ও একটু থামল, আমি আবার ওকে তাড়া দিলুম। বল বল তারপর।

'দেখলুম ওই টিনের গরমে ওরা বসে বসে কি দারুণ পরিশ্রম করে নিজেদের ভাত-কাপড়ের বন্দোবস্ত করছে। ঘরে ওদের কারও বা পঙ্গু স্বামী আর কারো বা নাবালক ছেলেমেয়ে, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ওদের আর ঘরের মধ্যে মন বসেনি, বেরিয়ে এসেছে।

ওইখানেই এই রকম একটা ব্যাগ পড়েছিল দেখেছিলুম। তাই ভেবেছিলুম যদি আমার এই কটা টাকা ওখানে পৌঁছে ওদের ওই পবিত্র পরিশ্রমের কিছুটা দাম দেয়।

টগর, দিবেন্দু, মিনতি ও আরো অনেকে

গৌরমোহন দাস দে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সবাই যে আজ ভাঙ্গে গড়ে
তুই কেন আজ বসে থাকিস্ ?
দেখ না কিছু ভেঙ্গে রে তুই
গড়তে কেমন এবার পারিস্।
ভবের মাঝে চলছে যে আজ
ওরে শুধুই গড়া ভাঙ্গা
নদীটা দেখ ভাঙ্গছে এদিক
গড়ছে ওদিক আর এক ডাঙ্গা।
জীবন মাঝে সুখ ভেঙ্গে রে
দুঃখ উঠছে গড়ে
তাই বলে কি জীবন ভোর
মানুষ থাকে পড়ে ?
জীবন মাঝে মৃত্যু এসে
গড়ে নতুন করে
ভাঙ্গা গড়া লেগেই আছে
ভবের মাঝে ওরে।

গানটা শেষ হলে মল্লিক সাহেব ওকে জিজ্ঞাসা করেন, "মরণদাস এসব দেহতত্ত্বের গান তোমার মন থেকে আপনা-আপনিই জেগে ওঠে ?"

"হ্যাঁ সাহেব। অনেক কথাই মাঝে মাঝে জেগে ওঠে।

কাকে বলবো সাহেব ? কে আর এই ভিখিরীর কথা শুনতে আসবে ?. আপনি শুনতে ভালবাসেন তাই সবকিছু আপনাকে গড় গড় করে বলতে ইচ্ছা করে।"

"দেখ মরণদাস, জন্মেছি একদিন মরতেই হবে। ঋষিরা বলে গেছেন যে জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করবার মতনই আত্মা জরাজীর্ণ দেহ ত্যাগ করে চলে যায় নতুন দেহের সন্ধানে। একটা নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়েই আমাদের সকলকে যেতে হয়।"

"হ্যাঁ সাহেব, ঠিকই বলেছেন। আমাদের সকলকেই ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরেই যেতে হয়। সেখানে আমরা সকলেই পথচারী। তখন আমাদের সকলেরই এক উদ্দেশ্য—সৃষ্টিকর্ত্তার সম্মুখীন হওয়া। কিন্তু এই পথ চলাটা আমাদের ইচ্ছায় হয় না। এক অদৃশ্য শক্তি নির্দ্দিষ্ট পথে আমাদের চালিয়ে নিয়ে যায়।"

"এ যে দার্শনিকের কথা বলছো মরণদাস। মনে হয় তুমি অনেক বই-টই পড়েছো।"

"না সাহেব, আমার লেখাপড়া খুব বেশী নেই। তবে লিখতে পড়তে পারি। বড় বড় বই পড়ার সুযোগ আমার কখনও হয়নি। তবে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক কথা মনের মধ্যে এসে পড়ে। ঐ সব নিয়েই তো আমি গান বাঁধি আর ভাবি পৃথিবীটা বড় না ভাবটা বড়।"

"জীবনটা বড়ই অদ্ভুত মরণদাস। তুমি যে অদৃশ্য শক্তির কথা বললে ঐ শক্তিই যে লোক বেঁকে রয়েছে, তাকে সোজা করছেন। ঐ শক্তিই আবার গর্ব্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দেন আর অন্যায়কারীদের ন্যায়ের পথ দেখিয়ে দেন। ঐ অদ্ভুত শক্তি হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর।"

"এই পৃথিবীর কামনা-বাসনা থেকে আমি মুক্ত হতে চাইছি কিন্তু পারছি না সাহেব। তাই আমি শান্তি পাচ্ছি না। আমি সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করছি।"

"তা কি করে হবে বলো ? বাজনদাররা যে যার বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলে কিন্তু তাদের সকলের মিলিত বাদ্যের ফলেই যে তান-লয় যুক্ত সুমধুর সঙ্গীতের সুর-ধারার সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে তারা সচেতন মোটেই হয় না। তারা তবু নিজেদের কাজ করে চলে যায়। তবে তাদের এই নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্যেই তারা জানে যে জনসাধারণকে তারা মুগ্ধ করতে পারবে। পৃথিবীর মানুষও ঠিক এইসব বাজনাদারদের মতনই। তারা যে যার কাজ করে চলেছে আর তাদের মিলিত কাজের জন্যে পৃথিবীটা সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলছে। তুমি তো কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে পারো না মরণদাস। ঈশ্বরের উপর সব নির্ভর করবে, তাহলে শান্তি পাবে।"

"আপনার এই উপদেশে মনে হয় আমি শান্তি পাবো।"

মরণদাস ওখানে দিন দুই থেকে নিজের জায়গায় চলে গেল।

আরো কয়েকটা মাস পার হয়ে গেল। বড় সাহেব তাঁর বন্ধুদের স্ত্রীরা এলে প্রায়ই টগরকে ভদ্রভাবে জামা-কাপড় পরে তার কাজ করতে বলে যান। তাই তাকে বাধ্য হয়েই ব্লাউস পরে থাকতে হয়। বড় সাহেবও তাকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকতে বলে দেন। নিজেকে পরিষ্কার না রাখলে বাড়ীঘরদোর পরিষ্কার রাখা যায় না। ঠাকুর-দেবতারাও অপরিচ্ছন্নের মধ্যে আসেন না। তিনি পড়ানো ছাড়াও ওকে নানা বিষয়ের উপদেশ দেন। আবার অন্যায় কিছু করে ফেললে বকুনিও দেন। তিনি ওকে নিজের মেয়ের মতনই স্নেহ করেন।

এদিকে বি. ডি. ও-র কাছ থেকে মল্লিক সাহেবের কাছে খবর এল যে মরণদাসকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে। সে যক্ষ্মা রোগে ভুগছে। তাকে হাসপাতালে দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। শোনামাত্রই মল্লিক সাহেব টগরকে কোন কিছু না জানিয়েই বাঁকুড়ায় চলে যান। সেখানে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও এক্সরে রিপোর্ট নিয়ে ফিরে এলেন। তার-পর রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ভর্ত্তির চিঠি নিয়ে মরণদাসকে ধুবুলিয়া হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। ওখানে তার ভালভাবে চিকিৎসা সুরু হয়ে গেল। মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে তিনি মরণদাসকে দেখে আসেন। সঙ্গে নিয়ে যান কিছু পথ্য আর দামী ঔষধ। টগর এই সংবাদ জানে না। তবে মাঝে মাঝে মরণদাসের খোঁজ সে করে। অফিসে

অনেক কাজ পড়েছে তাই সে আসতে পারে না, এই কথা বলে তাকে তিনি শান্ত করেন। আরো মাস-ছয়েক পার হয়ে গেল। টগর এখন বেশ কয়েকখানা বই শেষ করে ফেললে। রাত্রে খাওয়ার শেষে সে সাহেবের সঙ্গে বসে বসে বই পড়ে। পড়া শেষ হয়ে গেলে বড় সাহেব তাকে মহাভারত ও রামায়ণের গল্প পড়ে শোনান। রমাপতিও গল্প শুনতে আসে। রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগুলো টগর এখন আর মোটেই বিশ্বাস করে না। একদিন সে বড় সাহেবকে মুখ ফুটে বলেই ফেললে যে ওগুলো সব মনগড়া আর আজগুবি বানানো গল্প। রমাপতি ওর কথা শুনে রাগে গজগজ করতে থাকে। মল্লিক সাহেব কিন্তু গল্প বলেই যান। ঠাকুর-দেবতার গল্প বলার সময় রমাপতি গরুড় পক্ষীর মত দুটো হাত জোড় করে বসে বসে গল্প শোনে। গল্প বলা শেষ হয়ে গেলে রমাপতি বইটিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তার ঘরে চলে যায়। টগর ওর ঐ রকম সাষ্টাঙ্গ হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করা দেখে হেসে ফেলে।

মরণদাস টগরকে বেশ কয়েক মাস দেখতে আসে না বলে টগর খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে মনে মনে ভাবে যে অফিসের এত কি কাজ থাকে যে তাকে সে একবারও দেখতে আসতে পারে না। মল্লিক সাহেবকে মাঝে মাঝে কথাটা সে মনে করিয়ে দেয়। মল্লিক সাহেব একমাত্র তার কাজের অজুহাত দিয়ে তাকে বোঝান। এদিকে বেশ কয়েক মাস চিকিৎসার পর যখন মরণদাস অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলে। তখন মল্লিক সাহেব টগরকে সব কথা খুলে বলে তাকে দেখাতে একদিন হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। তার স্বামীকে দেখে টগরের চোখে জল এল। সে তার স্বামীর চেহারা দেখে প্রথমে চিনতেই পারে নি। ওখানকার ডাক্তার আর নার্সেরা তাকে আশ্বাস দিলেন যে মরণদাস বছর দুয়েকের মধ্যে ভাল হয়ে ঘরে ফিরে যাবে। টগর দেখেছিল ওর গ্রামের বাড়ীতে একজনের এই অসুখ করেছিল, কিন্তু অনেক চিকিৎসার পরেও তাকে বাঁচানো যায় নি। আজকাল চিকিৎসা করলে যে যক্ষ্মা রোগীর সেরে ওঠে তা তার জানা ছিল না। তাই মরণদাসের জীবনের আশা সে একেবারেই ত্যাগ করলো।

ধীরে ধীরে দেড়টা বছর কেটে গেল। এই সময়ে টগর অনেক কিছুই শিখে ফেললে। আগে টেলিফোনের কাছে যেতে তার ভয় হতো, এখন কিন্তু সে নিজেই টেলিফোন ধরে কথা বলে। দরকারী কোন সংবাদ থাকলে সে খাতার মধ্যে লিখে রেখে দেয়। কখনও কোথাও দরকার পড়লে নিজেই ডায়াল করে তাদের সঙ্গে সে কথা বলে। আগে ফ্রিজের জিনিষ মুখে তুলত না। এখন সে নিজেই ফ্রিজে সব জিনিষপত্র সাজিয়ে রেখে দেয়। রান্নার সময় সেখান থেকে জিনিষপত্র বের করে রান্না করে। এখন আর মুর্গির মাংস রাঁধতে তার বাধে না। বাড়ীর সকলে যা খায় সেও এখন সবই খেতে শিখেছে। দুপুরে কাজের শেষে সকলে কাজে চলে গেলে সে বসবার ঘরের সিলিং ফ্যানটা পুরোদমে খুলে দিয়ে রেডিও চালিয়ে সোফায় শুয়ে পড়ে। কখনও এইভাবে রেডিও শুনতে শুনতে সে ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ে। রমাপতি এসে ওকে উঠিয়ে দেয়। বাড়ীতে গ্রামোফোন আছে। সেখান থেকে সে অনেক গানও তুলেছে। ধীরে ধীরে সে এখন সব কিছুই জানতে ও বুঝতে শিখেছে। আগেকার সেই ছোট্ট অবুঝ বোকা মেয়েটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। টগর মাঝে মাঝে তার অতীতের কথা ভাবে। পৃথিবীর মধ্যে কত কিছু যে রয়েছে, কত কিছু যে তার অজানা ছিল সে কথা মনে করে এখন সে ভারি অবাক হয়ে যায়। জীবনের অনেক বছর যে তার বৃথাই নষ্ট হ'ল তার জন্য সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মরণদাসের সঙ্গে তার জীবনটা যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল তা এখন সে বেশ বুঝতে পারে।

মল্লিক সাহেব প্রায় রোজই পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে টগরকে জানান। টগরও আজকাল বাংলা সংবাদপত্র রোজই পড়ে। দিব্যেন্দুও ওর লেখাপড়ায় খুব খুশী। সেও ওর জন্য নানা রকমের পত্রিকা এনে দেয়। ওর সঙ্গে আজকাল সে মাঝে মাঝে ঠাট্টা-তামাসাও পর্যন্ত করে। টগর আজকাল আর ওর সামনে ঘোমটা দেয় না। দিব্যেন্দুকে সে ছোট সাহেব বলে ডাকতে সুরু করে দেয়। মল্লিক সাহেব এটাই চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর অধঃস্তন কর্ম্মচারীদের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করেন। সকলের

আত্মাই সমান। তাই তিনি সকলকেই সম্মান দিয়ে যান। কিন্তু ওঁর বন্ধু-বান্ধবেরা এই ভাল ব্যবহারটা ভাল চোখে দেখেন না। তাঁরা তাকে সময় পেলেই সতর্ক করে দেন। কিন্তু তিনি তাঁদের কথায় কান দেন না।

আজকাল টগর স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে ঘোরাফেরা করে। তারপর সে সাবান-পাউডার রমাপতিকে দিয়ে বাজার থেকে কিনিয়ে এনে ব্যবহার করে। কেউ বাড়ীতে এলে গৃহকর্ত্তার মত তাঁদের দেখাশোনা করে। মল্লিক সাহেব বাজারের খরচ তার হাতে মাসের প্রথমেই ধরে দেন। দরকার পড়লে বা কেউ এলে ঐ টাকা থেকেই তাকে খরচ করতে হয়। তারপর সে সাহেবের কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে নেয়। এখন সে সংসারের সবকিছুই দেখাশোনা করে। বলতে গেলে এখন সংসারের সব কর্ত্তৃত্বই তার হাতের মধ্যে।

দিব্যেন্দু সত্যিই একজন প্রাণখোলা সুপুরুষ যুবক। তাকে দেখে যে কোন মেয়ের মাথা ঘুরে যায়। বিলেত থেকে আসার আগেও সে যেমন ছিল এখনও সেই ভাবেই সে রয়ে গেছে। সেও চায় না যে সে ঝি-চাকরের স্বাধীনতা নষ্ট করে। তারা যে তার এক পরিবারেরই লোক সেটাই সে বিশ্বাস করে। টগরও নিজেকে এখন আর রাঁধুনীর পর্য্যায়ে নিজেকে ফেলে না। সে এই পরিবারেরই যে একজন লোক সেটাই সে ভাবে। দিব্যেন্দুর ওপর ওর একটা আকর্ষণ যে ধীরে ধীরে জন্মাচ্ছে সে সেটা বুঝতে পারে। দিব্যেন্দুর আসতে একটু দেরী হলে সে ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। সে না আসা পর্য্যন্ত টগর আজকাল আর খায় না। ওর জন্যে সে বসে থাকে। দিব্যেন্দু কিন্তু ওর এই আকর্ষণটা কোনদিনই বুঝতে পারে নি। এক একদিন দিব্যেন্দু বাইরে থেকে রাত করে খেয়ে এসে ওকে এইভাবে না খেয়ে বসে থাকতে দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যায়। সে যখন বাড়ীতে থাকে টগর তখন ওর ছায়ার মতন ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। ওর খাবার সময়ে তো টগর ওর কাছ থেকে জোর করে এটা ওটা পাতে ফেলে দেবেই, তাছাড়া দিব্যেন্দু না খেলে সে রাগে আগুন হয়ে যায়। টগর এর জন্যে ওর সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটিও করে। কথায় কথায় ওর ওপর টগরের রাগ হয়। মাঝে মাঝে এমন হয় যে দিব্যেন্দুর উপর রাগ করে সে সেদিন রাত্রে হয়তো কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়ে। দিব্যেন্দু সব দেখে, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে সে ভাবে যে টগরের মাথার ঠিক নেই। সে একটা বদ্ধ পাগল।

আগে আগে হাসপাতালে মরণদাসকে দেখতে টগর দু-তিনবার গিয়েছিল। টগরের চোখের জল ওরা সকলেই তখন দেখেছে। কিন্তু আজকাল সংসারের নানা রকম কাজ দেখিয়ে আর সে যেতে চায় না। মল্লিক সাহেব ওকে এক রকম জোর করে নিয়ে যেতে চাইলেও সে আর সেখানে যেতে চায় না। ওর যে ভেতর ভেতরে একটা বেশ পরিবর্ত্তন সুরু হয়ে গেছে সেটা মল্লিক সাহেবের চোখ এড়ায় না। তাহলে কি তিনি তাকে শিক্ষা দিয়ে ভুল করেছেন! এ কথাটা তিনি ভাবতে থাকেন।

মরণদাস ভাল হয়ে বাঁকুড়াতে চলে গেছে। এখন সে অফিসের কাজে যায় না। আরো কয়েক মাস তার ছুটী। এখন আর সে মাইনে পায় না তবে সরকারী কোয়ার্টারে সে থাকতে পায়। সেখানে সে একলাই থাকে। নিজেই এখন সে রেঁধে-বেড়ে খেয়ে নেয়। মাঝে মাঝে তার টগরের কথা মনে পড়ে। তাকে তার দেখার খুব ইচ্ছে হয়। অনেক দিন তাকে সে দেখেনি। তাকে এখন সে নিজের কাছে নিয়ে আসার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করতে থাকে। আর একলা তার থাকতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু হাস-পাতালের ডাক্তার তাকে বার বার করে বারণ করে দিয়েছেন যেন সে কয়েকমাস স্ত্রীলোকের সংসর্গে না আসে। তাই তাকে নিয়ে আসার আশা সে ছেড়ে দিয়েছে। টগর প্রতিমাসে তার মাইনের সব টাকাটাই ওকে পাঠিয়ে দেয়। সে নিজের স্ত্রীর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। টগরের জন্যেই মল্লিক সাহেব ওকে এযাত্রা বাঁচিয়ে দিলেন। তবে সবই ঈশ্বরের দয়া। তাঁর ইচ্ছা না হলে একটা পাতাও গাছ থেকে খসে পড়ে না। তার আর কাজকর্ম্ম করতে ইচ্ছা করে না। যেমন করে সে গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষে করে সংসার চালাতো সেই রকমের জীবনই এখন সে চায়। সে যে আর বাঁধা-ধরার মধ্যে থাকতে চায় না সেটা একদিন সে মল্লিক সাহেবকে

স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল। মল্লিক সাহেবও বুঝেছিলেন যে এই সব ভগবত প্রেমে বিভোর নির্লোভ লোকদের সংসারে বাঁধা যায় না। তিনি ওর কথা শুনে ওকে আর কিছু বলেন নি।

মল্লিক সাহেবের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনেরা মাঝে মাঝে ওঁর বাড়ীতে এসে দু-একদিন থেকে যেতেন। টগরের ব্যবহার আর তার অতিথি সেবায় তাঁরা সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু টগরের হাবভাব আর দিবেন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা লক্ষ্য করে তাঁরা মাঝে মাঝে মল্লিক সাহেবকে সাবধান করে দিয়ে যেতেন। মল্লিক সাহেব সে সব কথা হেসেই উড়িয়ে দিতেন। টগর মোটেই ও ধরণের মেয়ে নয়। অমন সরলমনা মেয়ে আর হয় না। তাছাড়া ও না থাকলে ওঁর ঘর-সংসার যে একেবারে অচল হয়ে পড়বে সে কথাটাও তিনি তাঁদের বলে দিতেন। আর টগর এসেই ওঁদের এই শ্রীহীন সংসারে শ্রী ফিরিয়ে এনেছে সে কথাও তিনি তাদের বলতে ভুলতেন না। ওঁর সব কথা শুনেও তাঁরা তাকে সতর্ক করে চলে যেতেন।

টগর বাইরে থেকে সবই শুনতে পায়। কেন না বাইরের লোকের কথাবার্ত্তা আড়ি পেতে তার শুনতে ভাল লাগে। ওঁদের কথা শুনে টগর খুব ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। ওঁদের কাছে সে ধরা পড়ে গেছে সেটা সে এখন জানতে পারে।

টগর প্রথম থেকেই দেখতে সুন্দরী ছিল। অভাব-অনটনে তার শরীরটা কঙ্কালসার হয়ে পড়েছিল। এখানে আসার পর থেকেই টগরের স্বাস্থ্য ভাল হতে লাগল। আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এক পূর্ণ যুবতী হয়ে উঠলো। কুঁড়ি ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যেমন ফুলগাছের সৌন্দর্য্য ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে টগরেরও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে আরও সুন্দরী হতে থাকে। আগে ওর মনে একটা শিশু-সুলভ চঞ্চলতা ছিল। এখন আর তা নেই। এখন সে দিন দিন বেশ গম্ভীর হয়ে উঠছে। মাঝে মাঝে এখন আয়নাতে নিজেকে দেখতে তার ভাল লাগে। ও এখন বুঝতে পারছে যে ওর দেহে ও মনে একটা প্রবল ঘূর্ণিঝড় এসে দোলা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে ওর মন উদাস হয়ে ওঠে। দিবেন্দু যদি কোন দিন ওর বাবার সঙ্গে বসে কোন মেয়ের সম্বন্ধে কথা বলে তখন সে মনে মনে বেশ রেগে ওঠে। দিবেন্দুর ওপর ওর যে একটা ভালবাসা ধীরে ধীরে জাগছে সেটা ও এখন বেশ বুঝতে পারে। কিন্তু নিজেকে সে সব সময়ে সরিয়ে রাখে। তার এই ভালবাসাটা যে কত অন্যায় সে তা বোঝে। সে বোঝে যে সে বিবাহিতা, তার স্বামী আছে, সে এ বাড়ীর রাঁধুনী। দিবেন্দুর ওপর লোভ করাটাই তার অন্যায়। কিন্তু তবুও সে এই অন্যায়ের কাছে তাকে মাথা নত করে থাকতে হয়। এই অন্যায়টা তাকে যে মাঝে মাঝে দুঃখ দেয় তাও সে অনুভব করে। তার এক একবার মনে হয় যে সে এ বাড়ী ছেড়ে যেখানে তার দুচোখ যায় সেখানে চলে যাবে। কিন্তু সে যেতে পারে না। তাকে যেন কে শেকল দিয়ে তার হাত-পাগুলো বেঁধে এখানে ফেলে রেখেছে।

মল্লিক সাহেব টগরকে একদিন হাসতে হাসতে বললেন, "টগর, পয়সা কড়ি একটু রাখতে শেখো। সব টাকাই যদি তুমি খরচ করে ফেল তাহলে তোমার ভবিষ্যতে কি হবে? কে তোমায় দেখবে? তোমার স্বামী তো এখন বেশ ভাল হয়ে গেছে। আগে মনে হয়েছিল ছুটির পরে সে কাজে যোগ দেবে। কিন্তু এখন মনে হয় সে আর কাজ করবে না। ওর মত লোককে সংসারে বাঁধা যায় না দেখলাম।"

টগর হাসতে হাসতে বললে, "আপনারা তো রয়েছেন। আমাকে কি আপনারা দুবেলা দুমুঠো ভাত দিতে পারবেন না?"

"বলা যায় না। আমার তো চাকরীর মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি হয়তো কোন আশ্রমে চলে যেতে পারি। সংসার আর আমার ভাল লাগছে না। দিবেন্দুর বউ কেমন হবে কে জানে। তার সঙ্গে হয়তো তুমি মানিয়ে নাও থাকতে পারো। তখন হয়ত সে তোমায় নাও রাখতে পারে।"

"আমাকে এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে কার এত সাহস হবে? ছোট সাহেব বিয়ে করে বৌ আনলেই বা। আমি যেমন ভাবে সংসার চালাচ্ছি সেই ভাবেই চালিয়ে যাবো। তাড়াতে চাইলেও আমি এ সংসার ছাড়বো না। আপনি তো এখনই সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছেন না। যখন যাবেন

তখন দেখা যাবে। ছোট সাহেবের ছেলেমেয়ে নিয়েই আমি এখানে আমার শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেব।" টগর হেসে হেসে কথাগুলো তাঁকে বলে ছোট সাহেবের স্নানের জোগাড় করতে চলে গেল।

মল্লিক সাহেব ওর এই রকম ভাবে চলে যাওয়াটা খুব পছন্দ করলেন না। তিনি বসে বসে ভাবতে থাকেন। লোকে এখন ওদের দুজনকে নিয়ে যা তা বলতে সুরু করে দিয়েছে। তাদের মুখে হাত চাপা তো দেওয়া যায় না। টগরের সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর মনে হল যে সে এখন বেপরোয়া হয়ে গেছে। সে এখন কাকেও ভয় বা গ্রাহ্য করে না। সংসারের কর্তৃত্ব সে ছাড়তে কিছুতেই রাজী নয়। দিব্যেন্দুর বিয়ে না দিলে আর চলে না। টগর তাকে কি ভাবে নেবে সেটা তিনি এখন ভালভাবে বুঝতে পারছেন না।

মাস দুয়েক পরে একদিন সকালবেলায় মল্লিক সাহেবের দরজার কলিং বেলটা দু-তিনবার বেজে ওঠে। সাহেবদের অফিস যাবার সময়ে কেউ একটা আসে না। রমাপতি দরজা খুলে মরণদাসকে দরজার পাশে বসে থাকতে দেখতে পেল। এখনও ওর শরীরের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। মরণদাস তখন বসে বসে খুব হাঁপাচ্ছিল। মল্লিক সাহেবের গাড়ী তখন দরজার ধারে দাঁড়িয়েছিল। রমাপতি ভেতরে গিয়ে বড় সাহেবকে জানালো। তিনি তখন টগরকে ডেকে বললেন, "টগর, মরণদাস এসেছে। মনে হচ্ছে ওর কিছু টাকার দরকার পড়েছে। বাজার খরচের টাকা থেকে ওকে কুড়ি টাকা দেবে। আর ও যেন না খেয়ে ফিরে না যায় দেখবে। আজ আমি খুব ব্যস্ত। তাই তাড়াতাড়ি আমাকে চলে যেতে হচ্ছে," বলেই তিনি বাইরে বেরিয়ে মরণদাসকে ভেতরে যেতে বলে চলে গেলেন।

মরণদাস বাড়ীর ভেতরে ঢুকে দাওয়াতে বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে। টগর তখন ছোট সাহেবের অফিসের যোগাড় করতেই ব্যস্ত। তাকে খাইয়ে তারপর তার সমস্ত কিছু গুছিয়ে রেখে তবে সে মরণদাসের সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু মরণদাস যখন রমাপতিকে এক গ্লাস জল চাইলো তখন টগরকে বাধ্য হয়ে বাইরে আসতে হল। কারণ টিবি রুগীকে গ্লাসে করে জল দেওয়াটা যুক্তি সঙ্গত নয়। ছোট সাহেব তখন খেতে বসেছিল। টগর বাইরে এসে মরণদাসকে দেখেই তার সারা দেহটা যেন জ্বলে ওঠে। সে রুক্ষস্বরে বললে, "তুমি রোগ নিয়ে আবার এ বাড়ীতে কেন এলে? আমার মাইনের টাকাগুলো সবই তো তোমাকে মাস মাস পাঠিয়ে দিচ্ছি। এবার কি তাহলে টাকা পাওনি?"

মরণদাস শান্তভাবে বললে, "না সেজন্যে নয়, তোমাকে অনেক দিন দেখিনি। তোমার জন্যে বড় মন খারাপ করছিল। তাই তোমাকে একবার দেখতে এলাম।"

"তা তুমি তো এখনও সারোনি দেখছি।"

"না, আমি সেরে গেছি। এতটা পথ হেঁটে বাস ধরতে হয়েছিল তো তাই কষ্ট হচ্ছে। এখন একটু কষ্ট হলেই হাঁপিয়ে উঠি।"

"না এলেই পারতে। এত কষ্ট করে আসারই বা দরকার কি ছিল?"

"তুমি আগে আমায় এক গ্লাস জল দিতে পারো? তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে।"

টগর মরণদাসকে কলতলাটা দেখিয়ে বললে, "ঐ কল থেকে জল খেয়ে এসো। তোমার যা রোগ তাতে বাড়ীর গেলাস দেওয়া চলবে না।"

"হ্যাঁ তাতো ঠিকই। আমি একেবারে ভুলে গেছলাম যে আমার রোগটা খুব খারাপ।" মরণদাস কথাগুলো বলে কলতলায় গিয়ে বেশ খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে দাওয়ায় বসে হাঁপাতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে সে বললো, "ডাক্তার বাবু বলছেন যে এখন আমি ভাল হয়ে গেছি। তবে একটু পরিচর্য্যার দরকার। তাহলে তাড়াতাড়ি আমি সেরে উঠবো। ভাবছি মাসখানেক পরে ওখানে তোমায় নিয়ে যাব।"

"নিজের খাওয়া জোটাতে পারছো না আবার আমায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি? যাক্‌গে সে কথা। বড় সাহেব তোমাকে খেয়ে যেতে বলেছেন। খেয়ে যাবে। আর যাবার সময় এই দুটো নোট দিচ্ছি নিয়ে যাবে। আমার যাওয়া হবে না। আমাকে এখানেই থাকতে হবে।"

মরণদাস হাত বাড়িয়ে নোট দুটো নিতে পারলো না। সে টগরের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। সে টগরের দেহটার

দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। টগর একটা রঙিন নাইলনের শাড়ী ঘুরিয়ে পরেছে। চুলের খোঁপাটা বেশ বড় করে বাঁধা। তার ওপর একটা বেলফুলের মালা জড়ানো। পায়ে চটি জুতো, কানে দুটো ছোট্ট সোনার দুল, গলায় একছড়া সোনার হার। চুলের সিঁথিটা বাঁদিকে রয়েছে। আগে ও সোজা সিঁথি কাটতো। সিঁথিতে সিঁদুর বোধহয় দেয় নি। হয়তো এ বাড়ীতে দেবার রীতি নেই। শরীরটা খুবই ভাল হয়েছে। কুমারী মেয়ের মতন এখানে রয়েছে বলে তার মনে হল।

টগর এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েছিল। সে আর সহ্য করতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলো, "আমায় অত করে কি দেখছো?"

"তুমি খুব সুন্দর হয়ে উঠেছ টগর।"

"আমার সময় নেই, ছোট সাহেবকে খাইয়ে তাকে অফিসে পাঠিয়ে তবে আমার ছুটি। হ্যাঁ শোন, এদিকে আর কোন দিন এই চেহারা নিয়ে এসো না। তোমার চেহারা দেখে রমাপতি পর্য্যন্ত হেসে চলে গেল। একটু ভদ্রভাবে আসতে পারো না? তোমায় বা কি দোষ দেবো। লেখাপড়া না শিখলে সকলেরই এইরকম বুদ্ধি গজায়। তোমার মত লোককে বিয়ে করেছি শুনলে লোকে হাসাহাসি করবে। কাজকর্ম্ম নাকি করবে না বলে শুনছি?"

"না, কাজ করতে আর ভাল লাগে না। আমরা দুজনে এবার ঠাকুরের নাম-গান করে জীবনটা কাটিয়ে দেব ঠিক করেছি।" মরণদাস শান্তভাবে বললে।

"না আমার যাওয়া হবে না। আমার আশা তোমায় ত্যাগ করতে হবে। যদি তোমার কোন অসুবিধা হয় তাহলে আর একটা বিয়ে করতে পার। আমি বাধা দেব না। এদিকে আর কোনদিন আসবে না। উঠোনের ওধারে গিয়ে বসগে যাও। ওখানেই ভাত দেব। আর এই দুটো নোট রেখে দাও। আমি ভাত নিয়ে আসছি" বলে দুখানা দশটাকার নোট ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে ভেতরে চলে গেল।

মরণদাস নোট দুখানা আর কুড়োলো না। অনেক পরিশ্রম করে তাকে একবার সে দেখতে এসেছিল। এখানে এসে সে বুঝতে পারলো যে তার আগেকার টগর আর নেই। এ এক অন্য কোন টগর। ওর টগর আজ সহরের আবহাওয়ায় হারিয়ে গেছে। ওর চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। চোখ দুটো জলে ভরে যায়। হাত দিয়ে চোখ দুটো মুছে সে ধীরে ধীরে বাড়ীর বার হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে টগর কলাপাতায় করে ভাত-তরকারী নিয়ে এসে দেখলে যে মরণদাস ওখানে নেই। ওর ছুঁড়ে দেওয়া নোট দুখানা উঠোনের এক কোণে হাওয়ার সঙ্গে মাতামাতি করছে। এইসব দেখেশুনে ওর মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। মরণদাস ভাত না খেয়ে নোট দুটো না নিয়ে চলে গেল! বেইমান কোথাকার! যাকে মাস মাস টাকা না পাঠালে কবে না খেয়ে শুকিয়ে মরে পড়ে থাকতো আর সেই লোকের টাকার ওপর, ভাতের ওপর এত দেমাক! দাঁড়াও এবার টগর তাকে মজা দেখাবে! লেখাপড়া না শিখলে যে মানুষের অশেষ দোষ থাকে এখন সে তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। আসছে মাস থেকে সে আর এক পয়সাও মরণদাসকে পাঠাবে না। এবার না খেয়ে শুকিয়ে মরে পড়ে থাকুক। সে ভাত-তরকারী গুলো রাস্তার একটা কুকুরকে ডেকে দিয়ে এলো। কুকুরটা গোগ্রাসে খেতে লাগলো।

মরণদাস যে না খেয়ে এতটা পরিশ্রম করে ওকে একবার দেখতে এসেছিল সে কথা যে বুঝলো না। নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে সে রাগে ফুলতে থাকে। দিব্যেন্দু যে খেতে বসেছিল সে খেয়ালও তার ছিল না। একটু পরে যখন তার খেয়াল হল সে তাড়াতাড়ি উঠে তার কাছে গেল। সেখানে গিয়ে দেখলে যে তার খাওয়া হয়ে গেছে। তখন টগর খুব মর্ম্মাহত হয়ে পড়লো। তার বোধহয় ভালভাবে খাওয়া হয়নি। ওর সামনে দাঁড়িয়ে না খাওয়ালে সে যে পেটভরে খেতে পারে না টগর একথা জানতো। টগরের আফশোষের সীমা রইলো না। দিব্যেন্দু তখন ওপরে নিজের ঘরে জামা পরছিল। সে ওর ঘরে গিয়ে তার ওপর রাগারাগি করতে থাকে। দিব্যেন্দু একটুখানিও তার জন্য অপেক্ষা করতে পরেলো না? মুখ ফুটে কথাগুলো সে তাকে বলেই ফেললে।

দিব্যেন্দু হাসতে হাসতে বললে, "আমার জন্যে আর ক্ষোভ করো না। আমি ঠিক ভালভাবে পেটপুরে খেয়েছি।

আমার পেটে ধরতো না। যাক্‌গে, কার সঙ্গে এতক্ষণ যুদ্ধ করে এলে বলতো?"

"কারো সঙ্গে নয়', বলে সে ব্যাগ, কলম, চশমা দিব্যেন্দুর সামনে ধরে দেয়।

দিব্যেন্দু হাসতে হাসতে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায়। একটু পরে রমাপতি এসে দেখে মরণদাস চলে গেছে আর টগর রাগে নিজের মনে গজগজ করছে। সে ভয়ে তাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলো না। সে নিজে গিয়ে তেল মাখতে থাকে আর ভাবে টগরের হঠাৎ রাগ হবার কারণ কি? মরণদাস তাহলে কি না খেয়ে চলে গেছে?

সন্ধ্যের একটু পরেই মল্লিক সাহেব বাড়ীতে এসে টগরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মরণদাস কখন গেল?"

টগর নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর দিলে, "তক্ষুনি চলে গেছে।"

অবাক হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাত খেয়ে যায় নি? এতো দূর থেকে কষ্ট করে সে এসে না খেয়েই চলে গেল?"

"বাসে-ট্রেনে এসেছিল আবার কষ্ট কোথায়?" টগর বললে।

"ট্রেন-বাস ধরতে হলে তাকে অন্ততঃ মাইল চারেক হাঁটতে হয়। সে যে অনেকটা দূরে থাকে। তোমাকে তো সেখানে একদিন নিয়ে যাব বলেছিলাম। তা তুমি তো গেলে না।"

"চার মাইল হাঁটতে গাঁয়ের লোকেদের কোন কষ্ট হয় না। ওদের মত লোকেরা দিনে চার মাইল আসা যাওয়া করে।"

"ওর মত অসুস্থ লোক সেটা পারে না। তা খেয়ে যেতে কোথায় দোষ ছিল? আর তুমি তাকে না খাইয়েই বা ছাড়লে কেন?"

"না খেলে আমি কি করে খাওয়াবো?

"যাক্‌গে, ওকে আবার সময় পেলে আসতে বলেছ তো?"

"না, তাকে আমি এখানে আসতে একেবারে বারণ করে দিয়েছি। ঐ রকম করে বেশভূষা করে এখানে আসতে দেখে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল।"

"টাকা দিয়েছিলে? খেয়ে যাবার কথা বলোনি?"

"নোট দুটো দিয়ে উঠোনের এক ধারে বসতে বলে আমি ভাত আনতে গিয়েছিলাম। এসে দেখি নোট দুটো উঠোনে হাওয়াতে উড়ছে আর উনি চলে গেছেন। বয়েই গেল আমার। ভাতের ওপর, টাকার ওপর রাগ! আসছে মাস থেকে ওখানে আর টাকা পাঠাবেন না।"

"তা না হয় পাঠালাম না। কিন্তু উঠোনে একটা লোক কি করে বসে খাবে?"

"ও রকম খারাপ অসুখের রোগীদের ঘরে বসিয়ে থালা-গেলাস দিয়ে কি করে খাওয়াবো? আপনিই বলুন। তার জল তেষ্টা পেয়েছিল। কল থেকে খেয়ে নিতে বললাম। সে তো সব জানে তাই কল থেকেই জল খেয়ে এলো। আপনি তো সব সময় বলেন যে ঐ সব ছোঁয়াচে রোগীর কাছ থেকে সকলের দূরে থাকা উচিত।" টগর কথাগুলো বললে।

মল্লিক সাহেব টগরের কথা শুনে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, "তুমি তো ওর বিবাহিতা স্ত্রী। একদিন তুমিই ওকে ছেড়ে এখানে থাকতে চাওনি। তখন তুমি কত কান্নাকাটি করেছিলে। আজ তুমি একেবারে বদলে গেছো। একটা রুগ্ন মানুষ অভুক্ত অবস্থায় কত কষ্ট করে তোমায় দেখতে এল আর তুমি তার সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করে তার মনে দুঃখ দিলে সে খেয়াল তোমার হ'ল না?"

"খেতে-পরতে দেবার শক্তি নেই। আমাকে নিয়ে গিয়ে ওর ওখানে তুলতে চায়। আপনি জানেন না সাহেব ও আমার ওপর এখনও স্বামীগিরি ফলাতে চায়। আমি তার সঙ্গে যাব না বলেছি। সেটাই ওর রাগের প্রধান কারণ। তার জন্যে তো আমি ভাত আনতে ভেতরে ঢুকেছিলাম। সেই ফাঁকে সে চলে গেছে। সে খেল কি খেল না তাতে আমার একটুও যায়-আসে না।"

"ঠিকই করেছ। তুমি তোমার কাজে যাও। আমি একটু বিশ্রাম নেব," বলে মল্লিক সাহেব খবরের কাগজখানা হাতে নিলেন।

"আপনি আজ কি খাবেন?"

"আজ আর আমি কিছু খাব না। দিব্যেন্দুও খেয়ে

আসবে। তোমরা দুজনে খেয়ে নিও।"

"আপনি কি খেয়ে এসেছেন!" টগর জিজ্ঞাসা করলো।

ওঁর কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে সে আবার বললে, "একটু কিছু করে দিই তা না হলে রাত্রিরে আপনার কষ্ট হবে। পেটের ব্যথাটা আবার বেড়ে যাবে।"

মল্লিক সাহেব মাথা নেড়ে জানালেন যে তিনি খাবেন না।

"শোবার সময় অন্ততঃ এক গ্লাস দুধ খেয়ে নেবেন।" টগর আবার বললো।

মল্লিক সাহেব ওর কথা শুনে হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না। শুধু একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে হাত নেড়ে ওকে ওখান থেকে চলে যেতে বললেন।

ওঁর এই রকম অবস্থায় কেউ ওঁর সামনে কথা বলতে যে সাহস করে না, টগর সে কথা জানতো বলেই সে সেখান থেকে চলে গেল। সে বুঝতে পারলো যে কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। তাই তিনি আজ খুব রেগে আছেন। মরণদাসকে অবহেলা করার জন্যে যে তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন সে কথা টগর বুঝতে পারলো না।

রান্নাবান্না শেষ করার পর সে একবার বড় সাহেবের ঘরে উঁকি মেরে দেখলে তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন রয়েছেন। সে তখন রমাপতিকে খাবার দিয়ে নিজে খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো শুয়ে শুয়ে সে একটা উপন্যাস নিয়ে পড়তে লাগলো। উপন্যাসের নায়ক নায়িকাকে পেল না বলে সে উপন্যাসটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। মল্লিক সাহেব মুখে কিছু দেননি বলে সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। কিন্তু মরণদাস যে না খেয়ে সকালে চলে গেল তার জন্যে তার একটুও দুঃখ হল না।

ঘণ্টাখানেক পরে কলিং বেলের আওয়াজ হতেই টগর ধড়পড় উঠে করে দরজা খুলে দেয়। দিব্যেন্দু গুন গুন করে গানের একটা কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকলো। টগর ওর গান শুনে ওকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলো, "কি ব্যাপার আজ, ছোট সাহেবের মুখে যে এত রাত্রিতেও গান?"

ক্রমশঃ

গানের ভুবনে

শান্তনু দে সরকার

হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষে হিমালয়ের স্বর্গরাজ্য। মহাকবির অলকা, কিন্নর ও সিদ্ধ বালাদের উৎসব ভূমি। প্রকৃতির উন্মুক্ত উদার পরিবেশে মানুষ এখানে অভাব ও দুঃখ ভুলে দিব্যলোক সৃষ্টি করেছে। মুক্ত নীল আকাশের নীচে অনন্ত বিস্তার তুষার ধবল হিমালয়; তার কোল জুড়ে উপত্যকার নয়ন মন জুড়ানো নিভাঁজ সবুজের সমারোহ। জল বাহিনী অসংখ্য পার্বত্য ঝর্নায় পরিপুষ্ট,—হিমালয়ের আদরিনী কন্যা,—চন্দ্রভাগা (চেনাব), ইরাবতী (রাবি), বিপাসা (বিয়াস) বেষ্টন করে আছে এই অঞ্চলটি। ধৌলাধার, লাসকার, পাংগী ও পিরপাঞ্জাল পর্বতমালার অন্তর ভেদ করে গিরি-রন্ধ্রগুলি যেন ইসারায় ডাকতে থাকে পরিব্রাজকদের,...এসো ...এগিয়ে এসো যদি রূপ দেখতে চাও, গান শুনতে চাও, এসো এই গানের ভুবনে,...কিন্নর লোকে।

এ ছবি ভারমোর উপত্যকার মনিমহেশ কৈলাস যাত্রার পাদপীঠতলের। জন্মাষ্টমীর সময় এখানে সমাগম হয় মনিমহেশ তীর্থযাত্রীদের। পর্যটক, গৃহস্থ, সাধু-সন্ন্যাসী দলে দলে চলে পায়ে হেঁটে। সুন্দর ভুবনে যেন অসীম সুন্দরের ছড়াছড়ি। বসন্ত থেকে শরৎ এ অঞ্চল অর্দ্ধ যাযাবর পার্বত্য গার্দ্দি ও গুর্জর সম্প্রদায়ের আবাসভূমি। দৃষ্টির সীমানা ছাড়ানো বিস্তীর্ন তৃণময় ক্ষেত্র জুড়ে বিচরণ করে ওদের মহিষ ও মেষের পাল। শীতের শুরুতে নামে ওরা আরো নীচের উপত্যকা ভূমিতে। এই আবাস পরিবর্ত্তনের সাড়া পড়ে ঠিক মনি মহেশ দর্শন উৎসবের পর থেকে। দলে দলে ফেরে তীর্থযাত্রী, সাথে সাথে নামে চলমান সংসার নিয়ে পথ-উপনিবেশী পর্বতে বিচরণকারী পরিবারগুলি।

মনি মহেশ কৈলাস দর্শন করে ফিরছে দুই সন্ন্যাসী লাহুল ও স্পিটি উপত্যকা অভিমুখে। ওরা পরিব্রাজক, শত তীর্থ পায়ে হেঁটে শেষ করা ওদের ব্রত। ব্রত সমাপ্তির আগে কামিনী-কাঞ্চন স্পর্শ করা গুরুর নিষেধ। রমনীর ছায়া এড়িয়ে ওদের পথ চলতে হয়, তাই সহজ সাধারণ পথ ছেড়ে ওরা চলেছে দুর্গম অরণ্যময় পার্বত্য পথ ধরে। সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন যৌবন অতিক্রান্ত অপরজন ভরা যৌবন।

পূর্ব দিগন্তে নবারুণ উন্মেষে দৈব মহিমায় ওদের অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠল। ওরা পথ চলতে চলতে যুগ্ম কণ্ঠে বেদ সঙ্গীতের সুরে পার্বত্য প্রকৃতিকে প্রতিধ্বনি মুখর করে গাইতে লাগলো।

সত্যশিবসুন্দর, পৃথ্বী পবন অম্বর,
জ্যোতি জল জীবন প্রবাহ।
নগনীরোদ হীম, সিন্ধু অতল অসীম,
দিনোরাত্রি ঋতু চক্রবাহ।
অনন্ত অনাদি আদি, জন্ম মৃত্যু সম্বোধি,
তোমার ত্রিগুণ রসধারা।
অনুত্তর অদর্শন, অব্যক্ত অনুভাবন,
বিমুগ্ধ বিস্ময় রূপে ভরা।
অলখ শাসনে তব, শাসিছ হে অভিনব,
সোম সূর্য যত গ্রহ-তারা।
জ্ঞানের অতীত তুমি, বিজ্ঞানের কর্মভূমি,
ঋষির তপস্যা তৃষ্ণাহরা।
তুমি ঝঞ্ঝা মরু ঝড়, প্লাবন প্রলয়ংকর,
ভূমিকম্প ঘূর্নি দাবদাহ।

গান গাইতে গাইতে ওরা উপনীত হল ছোট্ট একটি পাহাড়ী নদীর তীরে। নদী সল্পসলিলা, কিন্তু খরস্রোতা। নদীগর্ভে বিক্ষিপ্ত খণ্ড খণ্ড পাথর। এই প্রতিবন্ধকে

ঘুরপাক খেয়ে কোথাও কোথাও চক্রাকারে জলস্রোত প্রখরতর হয়ে উঠেছে। নিরন্তর জলের তলায় থেকে পাথরগুলো পিছল হয়ে আছে। এর ভেতর দিয়ে অতি সন্তর্পনে পা ফেলে পার হতে হবে। নদী পারাপারের এ আনাড় পথে কোনো ব্যবস্থা নেই। থমকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো সন্ন্যাসীরা কোনখান দিয়ে নিরাপদে নদী পার হওয়া যায়। ওদের কানে মেয়েলী গলায় প্রার্থনা এলো, ওগো সন্ন্যাসীরা, পড়ে গিয়ে চোট লেগে আমার পা দুর্বল আর যখম হয়ে গেছে; আমি নদীর খরস্রোতে চলতে পারবো না। দয়া করে নদীর ওপারে পৌঁছে দিন।

সন্ন্যাসীরা চোখ ফিরিয়ে দেখলে, নদীর ধারে এক সুন্দরী তরুণী বসে আছে। পরণে আপাদলম্বিত ঘাগরা, নাভিনিম্ন ঢাকা পুরো হাতা জামা, মাথায় ছোট্ট শালের ওড়না ভেদ করে লম্বা বেণী ঝুলে পড়েছে পিঠের ওপর; অনাবৃত পায়ের আঙুল-আধারে চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে। বয়স্ক সন্ন্যাসী মেয়েটিকে দেখার পর মুখ ফিরিয়ে নিলে; অল্প বয়সী সঙ্গীকে ওদিকে চাইতে ইসারায় নিষেধ করে তাড়াতাড়ি নদীতে নেমে দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো। তরুণ সন্ন্যাসী তখন সাহায্য-প্রার্থিনী অসহায় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিল, সঙ্গীর ইসারা বুঝতে পারেনি।

মেয়েটি আবার মিনতি জানালে,—আমার পায়ে খুব ব্যাথা, আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। সারারাত এই নদীর ধারে বসে আছি। দয়া করে আমাকে হাত ধরে নদী পার করে দিলে, বাকি পথ লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে পারবো। সন্ন্যাসী মেয়েটির কথার কোনো জবাব না দিয়ে ওকে পাঁজা-কোলা করে বুকের কাছে তুলে আস্তে আস্তে পা ফেলে নদী পার হল। ওকে এপারে নামিয়ে দিয়ে আপন মনে চলতে লাগলো, পিছন ফিরে তাকালো না। বড় সন্ন্যাসী তখন নদী পার হয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে। ও সঙ্গীকে ধরবার জন্যে দ্রুত পায়ে চলতে শুরু করে দিলে।

একি! বড় সন্ন্যাসী যেন দূরত্বের ব্যবধান বাড়াবার জন্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটছে। পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে ছোট সন্ন্যাসী বড় সন্ন্যাসীর কাছাকাছি এলো। সূর্য তখন আকাশের মাঝখানে এসে পড়েছে। ক্লান্তি আর জল পিপাসায় কাতর হয়ে ছোট সন্ন্যাসী বললে,—মহারাজ, বেলা দুপুর হয়ে গেছে; আসুন একটু বিশ্রাম আর আহারের ব্যবস্থা করা যাক। বড় সন্ন্যাসী ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বললে,—তুমি মহাপাপী। আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগ করেছি।

ছোট সন্ন্যাসী আশ্চর্য হয়ে বললে—সে কি মহারাজ। দুবছর আপনার সঙ্গে আছি, মনি মহেশ কৈলাস দর্শনের পর আমার দ্বাদশ তীর্থ ভ্রমণ হ'ল। হঠাৎ কি অন্যায় করলাম আজ?

বড় সন্ন্যাসী জবাব দিলে—স্ত্রী অঙ্গ স্পর্শ করে তুমি ব্রতচ্যুত হয়েছো।

ছোট সন্ন্যাসী বললে—মহারাজ আমাকে মাপ করুন। আমি এক অসহায় খঞ্জকে নদী পার হতে সাহায্য করেছি মাত্র। সাহায্য-প্রার্থী নারী কি পুরুষ এ কথা ভাববার তখন অবকাশ পাইনি। তীর্থ দর্শনের আনন্দে বিভোর হয়েছিলাম।

বড় সন্ন্যাসী রাগে চাপা গর্জন করে বললে— তুমি ভণ্ড, মিথ্যাবাদী! আমি পেছন ফিরে লক্ষ্য করেছি তোমার কীর্তি-কলাপ! তুমি নারী অঙ্গের স্পর্শসুখ অনুভব করবার জন্যে ধীরে ধীরে অনেক সময় নিয়েছ মেয়েটিকে এপারে আনতে, আমি তার সিকি ভাগ সময়ের মধ্যে নদী পার হয়েছি। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার মন এখনো মোহমুক্ত হয়নি। তোমার মত অনাচারীর ছায়া মাড়ানো পাপ। তুমি আমার সঙ্গ ছেড়ে যেখানে খুশী চলে যাও।

তরুণ সন্ন্যাসী ম্লান হেসে বললে—মহারাজ, আপনার আদেশ মাথা পেতে নিলাম। অদ্ভুত আপনার অনুধাবন শক্তি; তার চেয়েও অদ্ভুত আপনার বিচার ও দণ্ডাদেশ। মেয়েটির ভার নিয়ে জলে যাতে পা পিছলে পড়ে না যাই এই কারণেই আস্তে আস্তে নদী পার হলাম। মেয়েটিকে নদীর এপারে নামিয়ে দেওয়া মাত্র আমি তার ভার ও স্পর্শমুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি যে দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ধরে ছ-ক্রোশ পথ বুকে করে বয়ে চলেছেন তার চিন্তা, এখনো ভোলেননি তার মুখ,...আপনার কথায় এটাই প্রমাণ হল। আমি এপারে এসেই ভুলে গেছি তার কথা। আপনি

কল্পনায় তার স্পর্শসুখ অনুভব করেছেন।

বড় সন্ন্যাসী কোনো জবাব না দিয়ে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে গেল। গুরুর নিষেধ, অর্বাচীনের সঙ্গে তর্ক করা।

ছোট সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলো দু-বছরের এক সঙ্গে পথ চলার সঙ্গীর গমন পথের দিকে। কিছুক্ষণ পরে ম্লান হেসে বসলো এক গাছতলায়। ঝোলা থেকে আপেল বার করে বালকের মত কামড়ে খেতে লগালো। ধীরে ধীরে সূর্য পশ্চিম আকাশে চলে পড়লো, ওর দু-চোখ জুড়ে এলো অবসাদে। যখন চোখের পাতা খুললো সূর্য পাহাড়ী জঙ্গলের শীর্ষদেশ রাঙিয়ে পশ্চিম পর্বতমালা ডিঙিয়ে গেছে। ধূসর ছায়া নামা আকাশের নীচে দিয়ে ডানা মেলে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা ফিরে আসছে বাসায়। এই দিগন্তহারা পার্বত্য প্রদেশে ও আজ নিঃসঙ্গ, একা! পথের কোনো প্রেরণা নেই, নিশানা নেই, ...শুধু শূন্য-পানে চেয়ে থাকা। যে পথের সন্ধানে ও ঘর ছেড়েছিল সে পথও গেল হারিয়ে। না, আবার ও যাবে মনি-মহেশে। সন্ন্যাসী উজান পথে চলতে লাগলো। ঘণ্টা খানেক চলার পর অন্ধকার ঘন হয়ে এলো। দূর প্রান্তর ছাড়িয়ে মানুষের বসবাস আছে, মিট্‌ মিট্‌ করে দেখা যাচ্ছে আলো। কিন্তু দূরত্ব অনুমান করা মুস্কিল। দূর ছাই, সন্ন্যাসীর আবার ভাবনা কিসের? পথের যদি শেষ না থাকে, চলারও শেষ থাকবে না। চলতে চলতে শুনতে পেলে সামনের বনের আড়াল থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি গানের সুর ঃ—

গানের ভুবনে এসো মোর প্রিয়,
জানাই প্রাণের নিমন্ত্রণ।

ভারী মিষ্টি গলা তো! ও আজ বিধি-নিষেধের বাঁধন-মুক্ত সন্ন্যাসী। পায়ের তলায় পথ, মাথার ওপর আকাশ, অন্তরে কৌতূহল। এগিয়ে গেল দূরাগত সুরের শব্দ ধরে, সামনে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সন্ন্যাসী। সকালে নদী পার করে দেওয়া সেই মেয়েটা অন্ধকারে এক পাহাড়ী ঝর্নার ধারে বসে গান গাইছে দূর-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে। সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়েই মেয়েটি গান থামিয়ে চেয়ে রইলো ওর মুখের পানে। সন্ন্যাসী জিগ্যেস করলে—রাত্রে একলা জঙ্গলে বসে কাকে তুমি গান শোনাচ্ছিলে?

মেয়েটি জবাব দিলে—ভগবানকে।

প্রশ্ন—ভগবান কি তোমার গান শোনেন?

জবাব—মানুষ যখন শোনে; ভগবান নিশ্চয় শোনেন।

প্রশ্ন—তার প্রমাণ কোথায়?

জবাব—রাত্রে জঙ্গলে একলা ছিলাম বলেই-তো ভগবানকে গান শোনাচ্ছিলাম। উনি গান না শুনলে তোমাকে গান শোনার সঙ্গী হবার জন্যে পাঠালেন কেন?

প্রশ্ন—তার মানে?

উত্তর—তুমি চলে যাচ্ছিলে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে, ভগবান না পাঠালে পথ বদলে এদিকে এলে কেন? সন্ন্যাসীর ভগবান তীর্থে তীর্থে, তাই তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় ভগবানের সন্ধানে। ভক্তের ভগবান বিশ্বাসে, তাই সে নিজের জায়গায় বসেই ভগবানের করুণা লাভ করে। ভালোবাসার ভগবানের খোঁজ করতে হয় না।

সন্ন্যাসী বললে—তোমাকে স্পর্শ করে আমি ব্রত-ভঙ্গ করেছি, এই দোষে বড় সন্ন্যাসী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে; তাই চলেছিলাম মনি মহেশ—কৈলাসে। গান শুনতে আসিনি।

মেয়েটি বললে—বেশ তো! একলা যাবে কেন? আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো।

সন্ন্যাসী বললে—তোমার মত একজন খোঁড়াকে কোলে করে নদী পার করা যত সহজ, মনি মহেশ পর্বতে ওঠা তত সহজ নয়।

মেয়েটি বললে—কোলে আমাকে করতে হবে না, আমার হাত ধরলেই চলতে পারবো। ধরো আমার হাত, পরীক্ষা করে দেখো।

সন্ন্যাসী বললে—তুমি খোঁড়া অসহায় জেনে নদী পার করে সন্ন্যাসী সঙ্গীকে হারালাম। তোমার পরিচয় না জেনে সঙ্গে নিয়ে নতুন বিপদে পড়বো নাকি?

মেয়েটি বললে—সন্ন্যাসী তো চোর-ডাকাত নয়, তার আবার বিপদের ভয় কি!

সন্ন্যাসী জিগ্যেস করলে—তুমি অল্প বয়েসী মেয়ে, পা খোঁড়া। ঘর ছেড়ে পথে বেরুলে কেন?

মেয়েটি শোনালে ঃ—ঐ ভারমোর উপত্যকার অনেক ওপরে, হিমালয়ের বুকের ভেতর আমার দেশ,...লোকে বলে কিন্নর দেশ। গান আমাদের প্রাণ। উৎসবময় আমাদের জীবন। এই শ্রাবণের তৃতীয় রবিবারে ছিল আমাদের মিঞ্জার উৎসব। সেই মেলায় আমার গান শুনে সমস্ত ছেলেরা পাগলের মত আমাকে ঘিরে ধরে নাচ-গান করছিল, সমবয়েসী মেয়েরা সহ্য করতে না পেরে দল বেঁধে আমাকে নীচে ফেলে দিলে। প্রাণ বাঁচলেও একটা পা খোঁড়া হয়ে গেল। আর আমি নাচতে পারবো না, তাই লাঠি ধরে এতদূর নেমে এসেছি।

সন্ন্যাসী বললে—আমি যাচ্ছি মনি মহেশ। খোঁড়া-পায়ে তুমি অতো খাড়া পর্বতে উঠবে কি করে?

ও জবাব দিলে—পাহাড়ের কোলে আমার জন্ম। পায়ের দরকার নেই, হামাগুড়ি দিয়ে আমি তোমার চেয়ে অনেক আগে ওখানে পৌঁছে যাবো। ধরো,...আমার হাত ধরো।

সন্ন্যাসী একটা হাত বাড়াতেই, কিন্নরকন্যা ওর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চলো।

সন্ন্যাসী জিগ্যেস করলে—এই রাত্রে কোথায় যাবো?

যেদিকে দু-চোখ যায়—বলে মেয়েটি হাতের লাঠি দূরে ফেলে দিয়ে সন্ন্যাসীর হাত ধরে চলতে শুরু করে দিলে। শুক্লা তৃতীয়ার একফালী চাঁদ তখন আলো ছড়িয়ে পাহাড়ী অন্ধকারকে পাতলা করে দিয়েছে। এই স্তব্ধ রাত্রে এগিয়ে চলেছে দুজন ভারমোর উপত্যকা থেকে চম্বার দিকে, বাতাসে ভেসে আসছে কিন্নরবালার গানের প্রতিধ্বনি।

গানের ভুবনে এসো মোর প্রিয়,
জানাই প্রাণের নিমন্ত্রণ।
ভূপালী শুনিয়ে বানাবো উদাসী,
সাহানার রাগে রাঙাবো মন।
শ্রাবণের রাতে হারা হলে চাঁদ,
মনে মেঘ জমে ঘটালে বিষাদ,
বিদ্যুৎ রাগে জ্বালাবো প্রদীপ,
মল্লারে পেতে ফুল শয়ন।
ভৈরবী সুরে আরোহন করে,
ভাসাবো গানের তরণী।
ছায়ানটে নেমে হাওয়ায় হাওয়ায়
রচিব সুরের সরণী।
স্বপন জড়ানো ললিতা-লহরে
তোড়ীও সোহিনী, বেহাগে বাহারে;
মূর্ছনা তুলে মধু ঝংকারে,
বীণায় করিব আলাপন।

মনি-মহেশ তীর্থ দেখে ফেরা তরুণ সন্ন্যাসী আলো-ছায়া ঢাকা হিমালয়ের পার্বত্য পথে চলেছে সঙ্গীত মুখর নতুন সঙ্গীর হাত ধরে। পাশ দিয়ে কলকল শব্দে বয়ে যাচ্ছে সমতলগামিনী ইরাবতী, ঝুরঝুরিয়ে শুরু হয়েছে হীমঝরা। হিমালয়ের বুকে নেমে এসেছে গানের ভুবন। মন বন্দী হয়েছে সুরের ইন্দ্রজালে।

শ্রীধাম বৃন্দাবন কথা

কানাইলাল দত্ত

ঠাকুর অচিরেই নিজের ব্যবস্থা করে নিলেন। সুলতান থেকে আগ্রা যাবার পথে রামদাস নামে জনৈক বণিকের পণ্যভর্তি নৌকা মদনমোহন তলার নিটক যমুনার চড়ায় আটকে যায়। তিনদিন ধরে বিস্তর চেষ্টা চরিত্র করেও নৌকা উদ্ধার করা সম্ভবপর হল না। তখন রামদাসের মনে হল বোধ হয় দৈব প্রভাবে এমনটা হচ্ছে। দেবতা বা সন্ত জনের সাহায্য ছাড়া বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। নিকটেই সনাতনের কুটীর এবং মদনমোহনের স্থান। রামদাস এসে তার বিপদের কথা সনাতনকে নিবেদন করে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সনাতন বললেন —প্রার্থনা আমাকে নয় মদনমোহনকে জানান। বণিক তাই করলেন। নৌকা মুক্ত হল।

কৃতজ্ঞ বণিক মদনমোহন সেবার জন্য প্রচুর অর্থ দান করেন এবং একটি মন্দির নির্মাণ করে দেন। কালক্রমে সেই মন্দিরটি জীর্ণ হলে ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে চব্বিশ পরগণা জেলার বহুড়ুর জমিদার নন্দকিশোর বসু নিকটেই নতুন মন্দির করে দিয়েছেন। সেখানেই এখন বিগ্রহ সেবা-পূজা হয়। সনাতন সেবিত বিগ্রহটি অবশ্য এই মন্দিরে নেই। প্রতিনিধি বিগ্রহ রয়েছেন। আসল বিগ্রহটি নিরাপত্তার প্রয়োজনে জয়পুরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তখন জয়পুরের রাজা সেটি তার ভগ্নিপতি গোপাল সিংকে দেন। তিনি করাউলিতে নতুন মন্দির নির্মাণ করে সেই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। আসল মদনমোহন সেই থেকে সেখানেই রয়ে গেছেন। এই মদনমোহনকে সামনে রেখেই সনাতন শ্রী হরিভক্তি বিলাস, ভাগবতামৃত, দশম চরিত, রসময় কলিকা, বৈষ্ণব তোষিণী টীকা, দিক প্রদর্শনী টীকা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন ৮২ বৎসর বয়সে সনাতন দেহরক্ষা করেন।

মদনমোহন মন্দিরের প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামটি স্বতঃই মনে আসে। চৈতন্যলীলার প্রামাণ্য গ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃতের রচয়িতা হিসাবে কৃষ্ণদাস অমর হয়ে আছেন। তিনি মহাপ্রভুকে কখনও দেখেন নি।

নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষালাভ করে তাঁরই নির্দেশে বৃন্দাবন যান। সেখানে স্বভাবতঃই রূপ ও সনাতনাদির সাহচর্য্য ও সাহায্য লাভ করেন। সনাতনের মত তিনিও মদনমোহন সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। মদনমোহন স্বপ্নে তাঁকে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনায় ব্রতী হতে নির্দেশ দেন। তিনি নিজেই এ কথা লিখে গেছেন—'যা লিখায় মোরে মদনমোহন, তাই লিখি।, কৃষ্ণদাস রাধাকুণ্ডে রঘুনাথ দাসের সঙ্গেও দীর্ঘকাল বাস করেন। এদের সকলের নিকট থেকেই তিনি গ্রন্থ রচনার প্রচুর উপকরণ ও তথ্যাদি পেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ভক্ত ও কবির ধ্যান দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই বহু তথ্য উদ্ভাসিত হয়েছিল। প্রায় বিশ বছর ব্যাপী নিরলস প্রয়াসের দ্বারা তিনি চৈতন্য-চরিতামৃত সম্পূর্ণ করেন। গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত —আদি, মধ্য ও অন্তলীলা। বৈষ্ণব মহাজনেরা বলেন— এই গ্রন্থের যথার্থ রসাস্বাদনের জন্য গ্রন্থাকারের প্রতিও শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। বইখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর কিছু না পড়ে, একমাত্র এই বইখানি পাঠ করলে মহাপ্রভুর লীলা সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। কৃষ্ণদাস ৯২ বৎসর বয়সে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাধাকুণ্ডে দেহরক্ষা করেন। সেখানেই শ্রীরাধিকার চরণ তলে তার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ রয়েছে।

রূপ গোস্বামী বয়সে সনাতনের ছোট। অথচ বৈষ্ণব জগতে রূপের নাম প্রথমে উল্লিখিত হয়, রূপ-সনাতন।

মহাপ্রভুর কৃপাও তিনি প্রথমে পান এবং তিনিই প্রথম বৃন্দাবনে আসেন। বৃন্দাবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির গোবিন্দ মন্দির তারই কীর্তি। সংসার জীবনে তার নাম ছিল সন্তোষ রায়। বৃন্দাবনে এসে তিনি রূপ মঞ্জরী নাম গ্রহণ করেন।

নবদ্বীপের শ্রীল বিদ্যা বাচস্পতি ছিলেন রূপের দীক্ষা-গুরু। কিন্তু তিনি প্রকৃত শক্তি লাভ করেন প্রয়াগে স্বয়ং মহাপ্রভুর নিকট থেকে। মহাপ্রভুর নির্দেশেই তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং সেখানেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করে বৈষ্ণব সাধন-ভজনের ধারাটিকে সুস্পষ্ট করে তোলেন। সেগুলি তিনি নানা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। উজ্জল নীলমণি, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু, লঘু ভাগবতামৃত, শ্রীকৃষ্ণ গণোদ্দেশ দীপিকা, ললিত মাধব, বিদগ্ধ মাধব, দান কেলি কৌমুদি, হরিভক্তি রসামৃত সিন্ধু, শ্রীরূপ চিন্তামণি, প্রেমেন্দু সাগর, প্রেমেন্দ্র কারিকা, স্তব-মালা, উদ্ধব দূত প্রভৃতি সুবিখ্যাত গ্রন্থরাজি রূপের অক্ষয় কীর্তি হয়ে আছে।

রূপ স্থাপিত গোবিন্দ বা গোবিন্দদের মন্দিরের ইতিহাসেও বিশেষ ভগবদ করুণার অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি এটিই সর্বাধিক শিল্প সমৃদ্ধ ও সুন্দর। বিখ্যাত স্থাপত্যশিল্প-বিশারদ ফার্গুসন তার Indian Architecture-এ এই মন্দিরটি সম্পর্কে বলেছেন—'One of the most interesting and elegant in India and the only one perhaps from which European architect might borrow a few hints"

মন্দিরটি জয়পুর মহারাজার বদান্যতার ফল। তিনি ভক্ত রঘুনাথকে গুরু বলে মানতেন। রঘুনাথ বৃন্দাবনে এসে রূপ ও সনাতনকে প্রধানতঃ গোবিন্দদেবে বসে ভাগবত পড়ে শোনাতেন। জয়পুর মহারাজা মানসিংহ ১৯৫০ খ্রীঃ মূল মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দির নির্মাণ বিষয়ে রঘুনাথ কিছু বলেন নি। রূপ ও সনাতনের নির্দেশেই মন্দিরের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। চল্লিশ বৎসর পরে দক্ষিণ দিকের ছত্রী নির্মিত হয়। সেটাও মূল মন্দিরের মত লাল বেলে পাথরে গড়া এবং কারুকার্যময় ও শিল্পশ্রী যুক্ত। চারশ' বছর হয়ে গেল এবং এর মধ্যে মন্দিরের উপর হামলাও হয়েছে অনেক, তথাপি এর সৌন্দর্য অটুট। বৃন্দাবনের মন্দিরগুলির উপর দিয়ে সাম্প্রদায়িক মুসলমান রাজশক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে' এক সময় অমানুষিক অত্যাচার করেছে। কত মন্দির ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, কত মন্দির মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। সহস্র সহস্র নিরপরাধ ভক্ত মানুষের রক্তে মথুরা-বৃন্দাবনের মাটি রঞ্জিত হয়েছে। সে সব কলঙ্ক কাহিনীর মধ্যে আশ্বাসের বাণীও অনেক আছে। মুঘল সম্রাট আকবর স্বয়ং বৃন্দাবন পর্যন্ত এসে সনাতনের কুটীরে গিয়ে তাকে দর্শন করেন, তাঁর অমৃতবাণী শুনে পরম তৃপ্তিলাভ করেন। শ্রদ্ধায় প্রণামী স্বরূপ তিনিই প্রথম যমুনার ঘাটটি বাঁধিয়ে দেন। এ বড় কম কথা নয়। আওরঙ্গজেবের কামানের গোলায় গোবিন্দ দেব মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে পড়েছিল।

ভারতবাসী সে জন্য ক্ষুব্ধ। কিন্তু সে ক্ষোভের প্রকাশ কখনই ভারতধর্মকে কলুষিত করতে পারে নি। নন্দকিশোর বসু ভগ্ন মন্দিরটির সংস্কার করে দেন। মন্দিরস্থ বিগ্রহটি অপূর্ব দর্শন। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শ্রীরূপ গোমাটিলায় মাটি খুঁড়ে গোবিন্দদেবকে পান। মন্দিরের বর্তমান স্থানে একটি পর্ণকুটীর নির্মাণ করে রূপ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যাত্রীরা বৃন্দাবন দর্শনে এলে সর্বপ্রথম এই গোবিন্দদেবের চরণে দণ্ডবৎ হন। এই মন্দিরে ভেট করার বিধান আছে। সর্বনিম্ন মূল্য ৬১ পয়সা। মন্দিরের নাট মণ্ডপটিও খুব বড়। আমরা ঝুলনে গিয়েছিলাম। সমগ্র মন্দির চত্তরে তখন বৈষ্ণব জনের ভিড়। কীর্তনে-ভজনে মুখরিত।

এবার আমরা গোপীনাথ মন্দিরের কথা বলব। মধু পণ্ডিত এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। মদনমোহন-মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরের কিছু সাদৃশ্য আছে। রাজপুতনার রেসিলজি ঠাকুর মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। মন্দিরটির উত্তর দিকে বাংলার নন্দকিশোর বসু ১৮২১ খ্রীঃ একটি নতুন মন্দির করে দেন। নতুন মন্দিরেই এখন সেবা-পূজাদি হয়। এখানে বিগ্রহের কিছু বৈচিত্র্য আছে।

কৃষ্ণের দক্ষিণ দিকে রাধারাণী, বাম দিকে জাহ্নবী দেবী। কেউ কেউ বলেন—জাহ্নবী দেবী প্রেমে বিহ্বল হয়ে শ্রীরাধিকার কথা বিস্মৃত হয়ে নিজেই ঐ আসনে বসে পড়েন। অন্য ভাষ্যে বলা হয়, পরম বৈষ্ণবী জাহ্নবী দেবীকে রাধারাণী স্বয়ং নিজের আসনে বসিয়ে সম্মানিতা করেছেন। ব্যাপার যাই হোক না কেন, ঘটনাটির মাধুর্য্য অনস্বীকার্য। জাহ্নবীদেবী ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া স্ত্রী। এ মন্দিরেও ভেটের নিয়ম, সর্বনিম্ন মূল্য ষাট পয়সা। বৃন্দাবনে বহু মন্দির থেকে প্রসাদ দেবার ব্যবস্থা আছে। সে জন্য পৃথক মূল্য পূর্বাহ্নে জমা করতে হয়।

শ্রীজীব গোস্বামীও বৃন্দাবনে একটি পৃথক মন্দির স্থাপন করেন। রাধা দামোদর মন্দির। এই মন্দির প্রাঙ্গনে রূপ, সনাতন ও জীবের সমাধি আছে। তাদের ইচ্ছানুসারে তিনজনকে একই অঙ্গনে সমাধিস্থ করা হয়েছে। সেখানেই শ্রাবণ মাসে যুগ্মভাবে তাদের আবির্ভাব মহোৎসব পালিত হয়। রূপ ছিলেন রূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভের পুত্র। ব্রজলীলায় তাঁর নাম হয় বিলাস মঞ্জরী। অসাধারণ ধীমান এই যুবক মাত্র বিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন এবং মহাপ্রভুর নির্দেশে কাশীধামে মধুসূদন বাচস্পতির নিকট চার বৎসরকাল বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। তৎপর বৃন্দাবনে আসেন। নিজ কৃতীবলে বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও বৃন্দাবনে গোষ্ঠীপতি রূপে গৃহীত হন। বৃন্দাবনে বসে সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র-গ্রন্থ রচনা করেন। বৈষ্ণব জগতে জীব-ভাষ্য আজও প্রামাণিক বলে গৃহীত হয়। তাঁর রচিত শাস্ত্র-গ্রন্থাদির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকখানি এই ঃ ভক্তি সন্দর্ভ, পরমার্থ সন্দর্ভ; প্রীতি সন্দর্ভ; কৃষ্ণার্জুন দীপিকা; শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, গোপাল বিরুদাবলী প্রভৃতি।

শ্রীজীব এত সব কাজের মধ্যেও রাধা দামোদরের নিয়মিত সেবা-পূজার আয়োজন নিজের হাতেই করতেন। আজও বৈষ্ণব মহান্ত নিয়ম সেবার মাস পালন এবং পরিক্রমার পর যে দামোদর স্তোত্র পাঠ করেন তার মধ্যে শ্রীজীবের রাধা দামোদর-এর বন্দনা আছে।

লালা বাবুর মন্দির বৃন্দাবনে বাঙালির আর এক গৌরব কীর্তি। অনেকটা দূরে থেকে সাদা পাথরের সুদৃশ্য মন্দির শিখরগুলি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লালা বাবু ১৮১০ খৃীষ্টাব্দে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সুদৃশ্য মন্দিরটি নির্মাণ করেন। একদিন জনৈকা রজক কন্যা বেলা শেষ হয়ে আসায় তার পিতাকে ঘরে ফেরার জন্য তাগিদ দিতে বলে-ছিলেন—'বাবা বেলা গেল, চল ঘরে ফিরি।' সুবিখ্যাত জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ সেই সময় ঐ পথ দিয়ে পাল্কী চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। কথাটা তার কানে কায়। 'বেলা গেল' কথাটা শোনা মাত্রই তার ভাবান্তর ঘটে গেল। জীবনের বেলা চলে যাচ্ছে অথচ পরকালের কোন কাজ করা হোল না। আর নয়, ফেরাও পালকি, চল বৃন্দাবন। সে পালকি আর রাজবাড়িতে ঢোকেনি। কৃষ্ণচন্দ্র সোজা চলে এলেন বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদাশ্রয়ে, নাম হল লালা বাবু। সর্বস্ব তিনি কৃষ্ণপদে সমর্পন করেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির ছাড়া রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডের সংস্কার ও উন্নয়ন সহ অন্যান্য বহু কাজে এবং দুঃখী ভক্তের সেবায় তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন।

ঈশ্বরের আহ্বান হৃদয়ে ধ্বনিত হলে বিশ্বের আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। সচ্চিদানন্দের বিন্দুমাত্র আস্বাদনের অবকাশ হলে ধন-সম্পত্তি, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-বিরাম কোনটারই আর কোন মূল্য থাকে না। সনাতন গোস্বামী এই বৃন্দাবনে স্পর্শমণি পেয়েও তা সংগ্রহ করতে আকর্ষণবোধ করেন নি। রাজপুত্র ভগবান বুদ্ধ, তারও আগে রাজভ্রাতা ভর্তৃহরি, ইদানীংকালে রাজকুলবধূ মীরাবাঈ—ঈশ্বরের আহ্বান শুনেই সব ছেড়ে, সব সম্পদ খুইয়ে মহাসম্পদ লাভে ব্রতী হয়েছিলেন। এমন শত শত সহস্র সহস্র ঘটনায় ভারত-জীবন উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বৃন্দাবন অঞ্চলে কিশোরদের লালা এবং কিশোরীদের লালী বলে সম্বোধন করা হয়। সেই অর্থে লালাবাবুর নামের একটা সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। লালাবাবুর মন্দিরের মূল বিগ্রহের নাম 'কৃষ্ণচন্দ্র'। কারো কারো মতে বৃন্দাবনে অর্চিত বিগ্রহগুলির মধ্যে এটিই সুন্দরতম। মন্দিরে পাশাপাশি অন্য যে সব বিগ্রহ পূজিত হচ্ছে তারা হলেন ললিতা ও বিশাখা। আমি এর কাউকে বিশিষ্ট রূপে

চিনতে পারি না। সবই এক রকম মনে হয়। রাধাকৃষ্ণাদি বিগ্রহ নিয়ে মনে হয় পূর্বেও এমন সমস্যা ছিল। শান্তিপুর-নবদ্বীপ অঞ্চলের গোস্বামীদের বিগ্রহগুলি মালিকের নামানুসারে চিহ্নিত হয়। যেমন, বড় গোঁসাই, ছোট গোঁসাই, পাগলা গোঁসাই প্রভৃতি।

বড় গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভক্তের সেবিত বিগ্রহ ছিল শালগ্রাম শিলা। নেপালের গণ্ডক নদী থেকে তিনি এটি সংগ্রহ করেন। জনৈক ধনী ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি বিগ্রহ সেবার জন্য একদিন নানাবিধ পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি দিয়ে যান। শালগ্রাম শিলাকে মনের মত সাজাবার কোন উপায় নেই দেখে গোপালজী খুবই বিষন্ন হলেন। দুঃখে তিনি কাঁদতে থাকেন। ভক্তের ঐকান্তিক বাসনা পূর্ণ করবার জন্য রাতারাতি শালগ্রাম শিলা হস্তপদাদি সমন্বিত পূর্নায়ব বিগ্রহ হয়ে ওঠেন। গোপালজী এই বিগ্রহের নামকরণ করলেন রাধারমণ। তিনি যে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তা আর এখন নেই। বিগ্রহটি আছে।

বিহারীলাল নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি গত শতকের গোড়ার দিকে একটি নতুন মন্দির করে দিয়েছেন। এই মন্দিরের প্রাঙ্গনে গোপাল ভট্টের সমাধি আছে। তাঁর বাড়ি ছিল মাদ্রাজের (অন্ধ্রের) শ্রীরঙ্গ পত্তনে। মহাপ্রভু স্বীয় দ্বিতীয় কলেবর রূপে কীর্তিত শ্রীনিবাস আচার্যের দীক্ষাদাতারূপে গোপালজীকে মনোনীত করেন। গোপাল ভট্টজী খুব পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। তন্মধ্যে হরিভক্তি বিলাস এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের টীকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

বৃন্দাবনের প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে কেশি ঘাটের নিকট যুগল কিশোরের মন্দিরকেও ধরা হয়। রাধাবল্লভের বিখ্যাত মন্দিরটি আওরঙ্গজেব ধ্বংস করে দেন। এখন দক্ষিণ দিকে একটি নতুন মন্দির নির্মিত হয়েছে। বিহারীজী কিম্বা বাঁকা বিহারী মন্দিরটিও যথেষ্ট আকর্ষণীয়। এই মন্দিরের সঙ্গে তানসেনের গুরু হরিদাস গোস্বামীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানকার বিগ্রহ দর্শনে বিশেষত্ব আছে। বিগ্রহের সামনে পর্দা ঝোলান আছে। মধ্যে মধ্যে পর্দা সরিয়ে সামান্য সময়ের জন্য দর্শন দেওয়া হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চরণ দর্শন পাওয়া যায়। চীরবিহারী মন্দিরও বেশ পুরানো। এই মন্দিরে মারাঠা বীর হিম্মৎ বাহাদুর গিরির ছবি আছে। তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধে নিহত মারাঠা বীরদের শবগুলি হিন্দুমতে সৎকারের অধিকার অর্জন করতে আহম্মদ শা আবদালি তার কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা আদায় করেন। শা বিহারীর শ্বেত পাথরের মন্দিরটি নির্মাণ করেন লক্ষ্ণৌ-এর কুন্দনলাল শা। বিচিত্র এর গঠন-শৈলী। সামনের থামগুলির বৈচিত্র সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লতা যে ভাবে গাছে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে থাকে ঠিক তেমনি আকৃতি দেওয়া হয়েছে থামগুলিকে। গয়ার রাণী প্রতিষ্ঠিত রাধা ইন্দ্রকিশোর মন্দিরটিও উল্লেখযোগ্য।

বৃন্দাবনের পবিত্র ভূমিতে নিত্য নতুন মন্দির তৈরি হচ্ছে। পুরাতন সহস্রাধিক মন্দির তো আছেই। এই ধারায় সর্বশেষ সংযুক্তি সাহেব মন্দির। অর্থাৎ ইউরোপীয় বিশেষ করে কৃষ্ণভক্ত সাহেবরা প্রভূত অর্থব্যয়ে একটি সুদৃশ্য রাধাকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ করেছেন। তারই চলতি নাম সাহেব মন্দির। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের বাহুল্য থাকলেও অন্য দেবদেবীও কিছু আছেন। এই প্রসঙ্গে রাম, সীতা, হনুমান, মহাদেব, কাত্যায়নী, এবং রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। অল্প কিছুকাল হল রামকৃষ্ণ দেবের মন্দিরটি সম্পূর্ণ হয়েছে। পাশেই রামকৃষ্ণ মিশনের বিশাল সেবাশ্রম। এই পথে সামান্য এগোলে বিড়লার গীতা মন্দির। গীতা মন্দিরে একটি গোলাকার স্তম্ভে মাপূর্ব গীতা উৎকীর্ণ রয়েছে।

বৃন্দাবনে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরও একটি মন্দির আছে। গৌরাঙ্গ সুন্দর এখন রাধা বেশে পূজিত। নিমাই রাধাভাবে কৃষ্ণ অবতার। নিতাই একদিন প্রশ্ন তুলেছিলেন---নিমাই যদি কৃষ্ণ হবেন তো চূড়া বাঁশরী কই? উত্তরে নিমাই বলেছিলেন—

ব্রজের খেলা দৌড়াদৌড়ি।
এবার নদের খেলা (ধূলায়) গড়াগড়ি॥
ব্রজের খেলা বাঁশীর তান।
নদের খেলা হরিগান॥
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া।
নদের বেশ কৌপীন পরা॥

গড়াগড়ির ব্যাপারে চূড়া থাকলে তো অসুবিধা। তা সত্ত্বেও নদীয়া চাঁদ বৃন্দাবনে রাজ রাজেশ্বরী বেশে বৃন্দাবনের অন্তঃরাজ্যে রাজত্ব করছেন।

বাঙালীর অসংখ্য মন্দির ও প্রতিষ্ঠান বৃন্দাবনে বাঙালীকে শ্রদ্ধা এবং গৌরবের আসন দিয়েছে। রূপ সনাতনাদির ন্যায় বৈষ্ণব কুলতিলকের সঙ্গে লালাবাবু, নন্দকিশোর বসু, প্রিয়লাল পালের ন্যায় ধনাঢ্য ভক্তের মণিকাঞ্চন যোগের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। লালাবাবুর মন্দিরের কথা এবং নন্দকিশোরের কিছু কাজের পরিচয় আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। নন্দকিশোরবাবু বহু মন্দির সংস্কার করে দেন এবং নিজেও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরকে হাড়াবাড়ী কুঞ্জ বলে। ঢাকার প্রিয়লাল পাল সেবা কুঞ্জের নিকট গিরিধারীজির মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইদানীংকালে কাঠিয়াবাবার মন্দির, গৌড়ীয় মঠ, পাগলা বাবার মন্দিরাদি বাঙালীর কৃতির মধ্যে ধর্তব্য। বাঙালীর স্মৃতি ও কৃতি জড়িয়ে আছে আরও বহু ক্ষেত্রে। ইমলিতলার কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে। শ্রীনিবাস স্থাপিত আচার্য প্রভুর কুঞ্জ, কৃষ্ণদাস স্মৃতি প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ ছাড়া বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ বহু বিদগ্ধ বাঙালী বৈষ্ণব পণ্ডিতজন বৃন্দাবনে বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

কৃষ্ণদাসকে সনাতন নিকুঞ্জ মন্দিরে ঝাড়ু সেবার কাজ দেন। রাধারাণী সখীদের নিয়ে কুঞ্জ বিলাসে লীলা করেন—এই বিশ্বাসে তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে ঝাড়ু সেবা করেন আর ভাবেন এই সেবার দ্বারাই তিনি শ্রীরাধিকার দর্শন পাবেন। ভগবান যে ভক্তের ইচ্ছাধীন তা আর একবার প্রমাণিত হল। রাধারাণী ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। একদিন তিনি এখানে একখানি নূপুর ফেলে যান। কৃষ্ণদাস সে নূপুর দেখেই বিহ্বল হয়ে পড়েন। এ যে রাধারাণীর অপরিসীম ও অহৈতুকী করুণা তা অনুমান করতে তাঁর বিলম্ব হল না। তখন একমাত্র আক্ষেপ—এতই যখন করুণা করলেন—তখন একবার দেখা দেবেন না কেন? এমন সময় রাধারাণী ললিতা সখীকে পাঠালেন হারানো নূপুর খুঁজে আনতে। এটাও একটা ছলনা মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণদাস সহজে ভুলবার পাত্র নন। তিনি বললেন, যা বল তা বল বাপু, নূপুরের মালিককে হাজির হতে হবে, নইলে এ নূপুর পাওয়া যাবে না। এবার বালিকা বধূর বেশে রাধারাণী স্বয়ং এলেন। এক পা তার নূপুর হীন কৃষ্ণদাস তার হাতের নূপুরের সঙ্গে অন্য পায়ের নূপুর মিলিয়ে দেখলেন। দুটো নূপুরই হুবহু মিলে গেল। কৃষ্ণদাস নূপুরের কথা ছেড়ে প্রার্থনা করলেন—এত কৃপাই যখন করেছ, একবার স্বরূপ দর্শন দাও। রাধারাণী এবার কথা বললেন— চর্ম চক্ষে তো স্বরূপ দর্শন হতে পারে না। কৃষ্ণদাসও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি বললেন—তা হলে আমার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে দাও, তোমার ভুবনমোহিনী রূপ একবার দেখে জন্ম সার্থক করি। রাধারাণী স্বরূপে দেখা দিয়ে কৃষ্ণদাসের জন্ম সার্থক করলেন। অধিকন্তু নূপুর দিয়ে তার কপালে অক্ষয় তিলক এঁকে দিলেন। বৃন্দাবনের আকাশে-বাতাসে এমন শতশত কাহিনী ভেসে বেড়াচ্ছে। রেডিওতে এখানে সহস্র ক্রোশ দূরের খবর যদি শোনা যায় তবে মনকে রেডিও করে তুললে সহস্র সহস্র বৎসর আগেকার ছবি ও কথা শোনা সম্ভব হবে না কেন? কৃষ্ণদাসের ঝাড়ুসেবার প্রসঙ্গ এলেই আমার নরোত্তম ঠাকুরের শৌচ সেবার কথা মনে পড়ে। স্বয়ং নিযুক্ত মেথরের কাজ করে তিনি গুরু লোকনাথ গোস্বামীর কৃপালাভ করেছিলেন। লোকনাথ স্বামী ছিলেন যশোর জেলার মানুষ। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বেই তিনি এবং ভূগর্ভ গোস্বামী বৃন্দাবনে আসেন।

বাঙালীর মতই জয়পুরেরও বৃন্দাবনে একটা গৌরবের স্থান আছে। জয়পুরের রাজাদের বদান্যতার ফলে বৃন্দাবনের বিগ্রহগুলি রক্ষা পেয়েছিল। ব্রজমণ্ডলের বহু মন্দির তাদের অর্থে নির্মিত। গোবিন্দদেবের কথা আমরা আগেই জেনেছি। বুন্দেলখণ্ডের জয় সিংহদেব নির্মিত বনবিহারী মন্দির এবং বৃন্দাবন স্টেশনের নিকট এই শতাব্দীতে গড়া জয়পুর মন্দিরের কথা প্রসঙ্গতঃ সর্বাগ্রে মনে আসে। গোয়ালিয়রের মহারাজা তদীয় গুরু ব্রহ্মচারী গিরিধারী দাসের নির্দেশে ব্রহ্মচারীজির মন্দির নামে খ্যাত-রাধা গোপাল মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগটি ইটালীয় চার্চের অনুকরণে নির্মিত।

জয়সিংহ ঘেরার কথাটা জয়পুর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। সোয়াই জয়সিংহ আগ্রার গভর্ণর (১৭২১-২৮) থাকার সময় এটি নির্মাণ করেন। শেঠের মন্দিরটিও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। গোবিন্দদাস ও রাধাকৃষ্ণ দাস, স্বামী রঙ্গাচার্যের নির্দেশে দক্ষিণ-ভারতীয় শিল্প-রীতি ও মন্দির বিন্যাস পদ্ধতিতে এই আধুনিক মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। চৈত্রমাসে ব্রহ্মোৎসবের সময় একমাস ধরে নানা আনন্দকর অনুষ্ঠান ও মেলাদি হয়। ঐ সময় কিংহে রথযাত্রা অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার ব্যবস্থা থাকে। মন্দিরের গঠনশৈলী ভাস্কর্য এবং বিন্যাসে দক্ষিণ-ভারতীয় রীতি অনুসৃত।

বৃন্দাবনের মন্দিরের কথা বলে শেষ করা যায় না। সুতরাং যেটুকু বলা গেল তার চেয়ে মনে হয়, অবলাই রইল বেশী। যে গুলি সম্পর্কে কিছু বলা হল না তার গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। আগ্রহী পাঠকের জন্য আরও কয়েকটি মন্দিরের নাম মাত্র উল্লেখ করে আমরা প্রসঙ্গান্তরে প্রবেশ করব।

শাজাহানপুরওয়ালার রাধা গোপাল মন্দির, পুরানো শহরে অষ্ট সখী মন্দির, মুঙ্গের মন্দির নামে পরিচিত রাধামোহন, আনন্দ দেবীর রং বিহারী, কাশ্মীরের আনন্দ বাঈয়ের রাধাবল্লভ, কলকাতাওয়ালার রাধাবল্লভ, স্বামী অখণ্ডানন্দের শিষ্যা মাজি সিংহানিয়ার জোড়া মন্দির,কাচের মন্দির। বনমালী রায় প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটির নামটি বিচিত্র —জামাই বিনোদ। বনমালীবাবুর কন্যা কৃষ্ণকে পতিরূপে সেবা করতেন, তাই এই নাম।

বৃন্দাবনে দর্শনীয় স্থানের অতি-প্রাচুর্য হেতু অল্প সময়ে ঠিক মত দেখে ওঠা যায় না। আর শুধু চোখ দিয়ে দেখে তেমন কিছু উপলব্ধি করাও শক্ত। মন্দিরগুলি মত এখানকার কুঞ্জগুলিও রাধাকৃষ্ণ স্মৃতিতে বাঙ্ময় ও চঞ্চল। ঐ সব স্থানে নীরবে শান্ত হয়ে সামান্য সময়ও বসতে পারলে কিছু অনুভূতি হতে পারে। এই রকম দু-চারটি স্থানের কথাই মাত্র বলব।

সর্বাগ্রে মনে পড়ছে সেবাকুঞ্জ বা নিকুঞ্জ বনের কথা। এখানে ব্রজেশ্বরী রাধিকার মন্দির আছে। এটি পুলিন কুঞ্জ নামেও অভিহিত হয়। লাল পাথরের প্রাচীর বেষ্টিত স্থানটি শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম বিহার ভূমি এবং রাধাবল্লভ সম্প্রদায় কর্তৃক রক্ষিত শৃঙ্গার বট। যমুনা তীরে শ্রীরাধার প্রসাধন স্থান। নিত্যানন্দ প্রভু এই স্থানটিতে অবস্থান করেছিলেন।

বংশীবট। এর শীতল ছায়ায় বসে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন।

রাধাবাগ। এখানে কেশবানন্দ প্রতিষ্ঠিত কাত্যায়নী মন্দির আছে। প্রচুর ময়ূরের অবস্থান স্থানটির অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল।

বড় বা বড়ি কুঞ্জ। ধীর সমীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ভরতপুরের রাজা এই কুঞ্জের নির্মাতা। আয়তন বিচারে এটি বড় কুঞ্জ নামে পরিচিত হয়েছে। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর সমাধি আছে এখানে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বৃন্দাবনে রচিত এবং সংগৃহীত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রন্থাদি অনেক কষ্ট করে তিনি গৌড়ে নিয়ে যান। যাবার সময় পথিমধ্যে বিষ্ণুপুরে পুস্তক পেটিকাগুলি লুণ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের নির্দেশে লুঠেরা রাজা হাম্বীর গ্রন্থগুলি শ্রীনিবাসকে প্রত্যার্পণ করেন। স্বয়ং কৃষ্ণের করুণায় বৈষ্ণব জগৎ এক মহা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

গঙ্গামোহন কুঞ্জ। যমুনার তীরে রাণী গঙ্গাদেবী প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতার নামের সঙ্গে মদনমোহনের মোহন যোগে গঙ্গামোহন হয়েছে।

ক্রমশঃ

কংসাবতী

—নন্দলাল পড়িয়া

ধরিত্রীর বক্ষ ভেদি পীযূষ নির্ঝর
অমৃত সিঞ্চন দানি শস্পে তৃণে পুষ্পে ফলে
শ্যামল সরস ক'রে অহল্যা ভূমি
ছুটিয়াছ সাগর সঙ্গমে, অয়ি কংসাবতি !
পর্ব্বত দুহিতে ! অরণ্যের জটাজাল ভেদি
বনফুল পরাগ মাখি সুবাসিত ও দেহ বল্লরী
শাল্মলী বীথি পথে চলিয়াছে
কোন্ অভিসারে, হে অভিসারিকে !
বনৌষধি, আকন্দ ধুতুরা ভরা অঙ্গের সুষমা
মহুয়া মদিরা ভরা নীল নয়ন দুটী ঢুলুঢুলু ;
হে অনন্যে ! চন্দ্রহাসিত রাত্রে মাদলের
দ্রিমি দ্রিমি তালে আর নূপুর নিক্কনে
তোমার দুচোখ ভরে স্বপ্নের মায়াঞ্জন।

* * * *

বৈশাখের ঘনঝঞ্ঝা উষ্ণশ্বাসে উগারি
বিদ্যুৎবহ্নি হানে যবে শালবনে
তোমার গভীর নীল নয়নে তার দেখিয়াছি
ছায়া। তোমার নিটোল কালো বুকে
জাগায়েছ সর্বনাশা বাসনা উদ্দাম
তরঙ্গে তরঙ্গে তার স্পর্ধিত প্রকাশ।
এলো বর্ষা নামে ঢল পূর্ণতোয়া তুমি
দুকূল ভাসায়ে চল উদ্দাম উত্তাল
উড়াইয়া গৈরিক অঞ্চল।
শোন নাই কারো কান্না কারও তরে নাহি মায়া
হে কুলত্যাগিনি।

ভয়াল করাল মূরতি ধরি মত্ত ধ্বংস কাজে
তোমার নয়ন ঘেরি ভ্রূকুটি কুটিল।
শরতের ছোঁয়া যবে লাগে তব স্বর্ণ বেলাভূমে
কাশের শুভ্রগুচ্ছ বলাকার
ছায়া নামে তোমার অঞ্চল খানি ঘেরি
আকাশ মুকুরে হেরি তোমার মাধুরী
গরবিনী আত্মমগনা হে মুগ্ধনয়না।

হেমন্তের কুয়াসা ঘেরা বালু তটে
এলাইয়া শ্রান্ত তনুখানি
স্বর্ণাভ অপরাহ্নে সোনালী ধানের ক্ষেত
ছুঁয়ে ছুঁয়ে পূর্ণ গর্ভা অলস মন্থর গতি
নবান্নের সুরভিত পল্লীর আঙ্গিনা ঘেরি
নেচে চল বাজাইয়া চরণ মঞ্জীর।
তোমার মেখলা ঘেরি বেজে উঠে
সায়াহ্নের মঙ্গল শঙ্খ—
মন্দিরে মন্দিরে বাজে কাঁসর ঘণ্টা
মসজিদে আজান
পৌষের পোষালী নিয়ে তোমার তীরে
বসে পৌষের মেলা নূতন ধানের খৈ
নূতন আখের গুড় সুবাসিত ক'রে তোলে
শীতের মিঠে কড়া রোদে ভরা উত্তুরে বাতাস।
গাঁয়ের কৃষাণী ফেরে ঘরে
মাটির হাঁড়ি সরা কলসী মাথে
হাতে ধরা ভ্রমর কালো ছোট্ট ন্যাংটো ছেলে
ঢোলক কাঁধে—চলে তোমার তীরে তীরে
মেটো পথ ধরে।

বসন্ত যখন আনে দখিনে বাতাস
শালবকুলের গন্ধ ব'য়ে, ফোটে ফুল
কৃষ্ণচূড়া পলাশ শিমুল।
তোমার সকল অঙ্গে আবীর গুলাল মেখে
তুমি হও রঙ্গিল নাগরী।
মাদলের বোলে বাজে সাঁওতাল রমনীর নৃত্যছন্দ
রাখালিয়া বাঁশি বাজে দূর বনান্তরে
তখন তোমার আঁখি পিপাসিত পিয়া সন্নিধানে।
তুমি চল ছুটে পল্লী নগরী ছাড়ি
সাগর সঙ্গমে, হে অভিসারিকে!
তোমার এ লীলাকুঞ্জে মল্লভূমে
ঘুরে ঘুরে এসেছি অনেক বার জন্ম জন্মান্তরে।
মাতৃসমা স্নেহাঞ্চলে রাখিয়াছ ঘিরে
কতকাল। তারপর ভঙ্গুর জীবন শেষে
ভস্মরাশি নিয়ে ধুয়ে মুছে চলে গেছে
শোকাতুরা মাতা আছাড়ি আছাড়ি
কত কাঁদিয়াছ ব্যর্থ আক্রোশে।
আবার এসেছি ফিরে তোমার আঁচল ভরে বারেবারে
তোমার মাথায় বাঁধা এ জীবন আবর্তিত
তোমার সজল দিঠি ঘেরি
আবার আসিব ফিরে গাহিব গান
ভাসিব নয়ন নীরে।
তোমার মায়ার টানে বন্ধ আমি
মুক্তি কোথা পাব?
মুক্তি চাহি নাকো॥

আজব দেশ

ভোলানাথ মুখার্জী

আজব দেশে জন্ম আমার, আজব দেশে জন্ম ভাই,
যা কিছু চাও এই দেশেতে শুনবে কেবল নাই আর নাই।
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, মাথার ওপর ছাদ নাই
আলো বাতাস তাও নাই, আদর্শেরতো কথাই নাই।
পেটের খোরাক নাইবা জুটুক, দেহের খাওয়ার ক্ষমতি নাই
(আর) রক্তবীজের ঝাড়ের মতন জন্ম দিতে আপত্তি নাই।
সস্তাদরের নেশার ঘোরে ফূর্ত্তি করে দিন কাটাই
'বেল বটম' আর 'বাবরী' চুলে হিন্দী ফিল্ম দেখাই চাই।
পেছন থেকে ছেলে-মেয়ের বিশেষ কোনো তফাৎ নাই
পাড়ার হীরোর বে-কায়দাতে বনতে ছুঁচো দোষটি নাই।
দুর্ব্বলকে পেলে সবল বাহাদুরী করাই চাই
অন্যথাতে দলটি বেঁধে রাম-গোবেড়ন দেওয়াই চাই।
সবাই নেতা বনতে চাই, আদেশ শোনার কেহই নাই
আদেশ যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের আদেশে সঙ্গতি নাই।
নিজের ঘরের সুখ কিনতে পরের ছিদ্র খোঁজাই চাই
স্বল্প দোষে আর লোককে জব্দ করা চাইই চাই।
লেখাপড়া শিখেও কিন্তু ভদ্রতাজ্ঞান আদৌ নাই
একটু ধাক্কা লাগল যদি ফোঁস করতে বাধা নাই।

আমার বিদ্যে-বুদ্ধির ঠিক একটুও তুলনা নাই
আর সকলে বোকার হদ্দ, মাথাতে পদার্থ নাই।
তোমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে কাজ গুছোনো আমার চাই
তুমি ব্যাটা যাওনা ডুবে, আমার তাতে দুঃখ কী ভাই।
ভালো মানুষির সুযোগটুকু পূর্ণরূপে নেওয়াই চাই
হাত বুলিয়ে মাথায় টাকা ধার নিয়ে শোধ দিতে নাই।
বিষ মনেতে যত্রতত্র দেঁতো হাসির অভাব নাই
প্যাঁচ কষা আর ল্যাং মারতে সাহেব সুবো ধরাই চাই।
দেবতাদেরও বিবেকবিহীন ক্রিয়াকর্মে ক্লান্তি নাই
চামচে আমার থাক্ না ভরে, এর চেয়ে সুখ আর
কী চাই?
ছল-চাতুরী আরও আছে প্রাণের যখন ভয়টি নাই
পড়ব পায়ে সড়াৎ করে যদি বুঝি আর উপায় নাই।
মেয়েরা সব বাহিরমুখো লাজলজ্জার বালাই নাই
বেকার ছেলে বাড়ছে শুধু ছিনতায়ের তাই কমতি
নাই।
বিচার টিচার শিকেয় তোলা, সমাজপতির লজ্জা নাই
হাতের চেটো তারও খোলা যা পাওয়া যায় লাভই ভাই।
অরাজকতায় ভ'রছে এ দেশ ডিসিপ্লিনের বালাই নাই
মনুষ্যত্ব! সেটা কী চীজ? কারুর মনেই শান্তি নাই
ভিখিরীতে ভরে গেল দেশ-নেতাদের হুঁশটি নাই
আসল ব্যাপার, সৎ সাহসের ছিঁটে ফোঁটা তাও নাই।
আমারটুকু পেলেই হোল যাক্ না রসাতলে দেশ।
দেশের লোককে ভুজুং ভাজুং দিয়ে আমি আছি বেশ
হেথা মুড়িমিছরির দরের মাঝে, দেখি কোনোই তফাত
নাই
এমন দেশটি কোথাও তুমি খুঁজে পাবে না'ক ভাই
এই হতাশার মাঝে দেশের সত্যিই কী মুক্তি নাই?
সত্যিকারের মুক্তি পেতে হাজার রবীনহুডের জন্ম
চাই।

আমি

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

আমি আছি
তাই তো ভুবন আছে
তাই তো জ্বলে চন্দ্র সূর্য তারা
তাই তো শিশির তৃণের শিরে মুক্তো হয়ে ঝরে।
আমি আছি
তাই তো ফুলে মধু
তাই তো জমে চক্রচক্রে মধু
আমায় যদি করবে অবহেলা
মধু চক্র কোথায় পাবে তুমি?
আমি আছি
তাই তো গৃহ আছে—
আছে সমাজ, আছে রাজ্য রাজা।
আমায় বিনে সংঘ কোথায় পাবে,
সংঘ বিনে শরণ কোথায় নেবে?
আমায় যখন করবে অবহেলা
তোমার ভুবন বিনাশ হয়ে যাবে।

উৎসর্গ

আঁখির সামনে হইতে দেবতা
গিয়াছ বিদায় লইয়া
হৃদয় আসনে বোসেছ এবার
সারাটি জীবন ধরিয়া
সব অপরাধ ক্ষমিবে বলিয়ে
মম করে ধরি সংসারে লইলে
এবে তাহা স্মরি রোষ পরিহরি
লহ গো দাসীরে ডাকিয়া
গিয়াছ চলিয়া চির শান্তি ধাম
নাহি হিংসা দ্বেষ পবিত্র সে স্থান
চির বসন্ত বিরাজে সেথায়
মুনি ঋষি সদা স্তব-স্তুতি গায়
শুনেছি সেখানে আছেন বিশ্বপতি
একলা সেবিতে ক্লেশ হবে অতি
দয়া করে মোরে কর তব সাথী
দেব গো পূজার ডালাটি রচিয়া।

সুনয়নী

কাজী শাহাদাৎ আলী

সুনয়নী, তোমার নয়নের ফাঁকে,
লাট খেয়েছিল আমার নয়ন।
সময় সীমায় এসে বার বার ডাকে;
উন্মত্ত আগুন ছিল এই ভরা মন॥
সুনয়নী, তোমার পেয়ে কেশ বাস।
পাড় ভাঙ্গা নদীর মত দিক চিহ্ন হীন,
মধ্য রাতে ঘুম ভাঙ্গে নূতন আভাস
যেটুকু পেয়েছি তাহা কর্তব্য বিহীন॥
সুনয়নী, তুমি মন্থন সিন্ধ সাপ।
যা কিছু দিয়েছ ঢেলে কেবল আগুন
অন্তহীন সাজিতে ভরা অফুরন্ত অভিশাপ
মনে হয় পুনর্বার হয়ে যাই ভ্রূণ॥

জয়-পরাজয়

শান্তিপদ ভট্টাচার্য্য

আজ সকাল থেকে কিশলয়ের মনটা বিগড়ে আছে। লালবাজারে ট্রাম থেকে নেমে দোকানটা খুঁজতে ওকে বেগ পেতে হল। পরপর একই মাপের দোকান। ট্রানজিস্টারের কেস থেকে আরম্ভ করে কুকুরের গলার বগ্‌লেস অবধি হরেক রকমের চামড়ার জিনিষ। প্রত্যেকটা দোকান ঘরের মাপও প্রায় এক রকম। কিশলয় একবার দেখতে দেখতে এগিয়ে যায় আবার দেখতে দেখতে পেছিয়ে আসে। বার-কয়েক চেষ্টার পর লোকটার দেখা পায়। প্যাকেটটা লোক-টার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কিশলয় বলে, কাল আপনার দোকান থেকে এইটা কিনেছিলাম। যে জন্যে কিনেছিলাম তার আর প্রয়োজন নেই। এটা ফেরত নিন।

লোকটা হাত বাড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কিশলয় ওর হাতে প্যাকেটটা গুঁজে দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে কিন্তু অফিসে ঢোকার মুখে বাধা।

—ও মশাই দাঁড়ান। আপনি আচ্ছা লোক তো মশাই। টাকা ফেরৎ নেবেন না?

কিশলয় লোকটার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়িয়ে হাতটা শুধু বাড়িয়ে দেয়। দোকানদার ওর হাতে বারটা টাকা গুঁজে দিয়ে বলে, দরকার পড়লে আমার দোকানে আসবেন কিন্তু।

অফিসে ফাইল খুলে কিশলয় চুপচাপ বসে রইল। কাজে একদম মন বসছে না। টমের কথা মনে পড়ছে। ওদের পাড়ায় এক ভাড়াটে এসেছিল। মাস-ছয়েক ছিল। তারপর অন্য কোথাও উঠে যায়। যাবার সময় টমকে ফেলে রেখে যায়।

কিশলয়ের দাদার ছেলে লুচি বলেছিল, জান ছোটকা, হাবুলরা টমকে ফেলে চলে গেছে। টম ভীষণ কাঁদছে।

কিশলয় ধমকে ওঠে, এই লুচি, পড়ার সময় যত আজ-গুবি কথা বলে সময় নষ্ট করবি? শীগগীর বই খোল।

লুচি কাঁকিয়ে ওঠে, তুমি দেখবে চল ছোটকা, টম কী ভীষণ কাঁদছে।

কিশলয় লুচির গালে ঠাস করে চড় মেরে বলে, টম কাঁদছে তো তোর কি? কাল যে অঙ্কগুলো দিয়েছিলাম করেছিস? আধঘণ্টা সময় দিলাম, এর মধ্যে অঙ্কগুলো আমার চাই, বুঝলি?

লুচি অঙ্ক কষতে লাগল আর কিশলয় পায়ে চটি গলিয়ে টুকটাকি কয়েকটা জিনিষ কিনতে দোকানে গেল। বাস্ত-বিকই কুকুরটা কাঁদছে। হাবুলরা যে ঘরটায় থাকত ওর বন্ধ দরজায় দুটো সামনের পা তুলে দিয়ে কুকুরটা কিঁউ কিঁউ করে ডাকছে আর দরজাটা নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। দেখে কিশলয়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবল, হাবুলরা তুচ্ছ জীব বলে ওকে ভুলে যেতে পারল, কিন্তু ও হাবুলদের ভুলতে পারছে না। তাই কেঁদে কেঁদে মরছে।

কয়েক দিনের মধ্যে লুচির সংগে টমের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। লুচি ওকে বিস্কুট, পাউরুটি এমনকি বাড়ী থেকে ভাত নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়। ওর মা আবার কুকুর দেখতে পারে না। ইদানিং পড়ার পর লুচিকে ওদের বাড়ী অবধি এগিয়ে দিতে হয়। কিশলয়ের দাদাই বলে দিয়েছেন। নাহলে লুচি নাকি পড়তে আসবে না। ফেরার পথে টম নাকি লুচিকে ভয় দেখায়। কাজেই রাত ন'টায় লুচিকে আড়াল করে দাদার বাড়ীতে যেতে হয়। লুচি কিশলয়ের হাত ধরে পাশে পাশে চলে। টম সমানে কিশলয়ের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ে। কখনও বা পথ আগলে রাস্তায় শুয়ে পড়ে। কিশলয় ভাবে, টম কি ভালবাসতে আরম্ভ করেছে? রাস্তায় ঘুরতে কি আর ওর মন চাইছে না? ওকি নিরাপদ আশ্রয় চায়!

ফেরার সময় লুচি বলে, ছোটকা, আমাকে বকবে না

বল।

কিশলয় বলে, বকার মত কথা না হলে বকব না।

লুচি বলে, কাল একটা বকলেস্ কিনে আনবে? আমি একটা চেন জোগাড় করেছি।

পরেরদিন লুচি বারকয়েক কিশলয়ের সামনে দিয়ে ঘুর ঘুর করে গেল। কিন্তু ভয়ে কিছু আর বলতে পারল না।

কিশলয় ভাবছিল ওর জীবনটা 'কী অদ্ভুত। ধরতে গেলে ফসকে যায়। বকলেস্ কিনে টমকে বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঁধা আর গেল না। পাড়ার ছেলেরা রক্তে ভেজা দলা-পাকান টমকে গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। চাপচাপ রক্তের চারধারে বারকয়েক প্রদক্ষিণ করে বগলেস হাতে চুপিচুপি বাড়ী ফিরেছে কিশলয়।

কিশলয় মনকে কাজে টানতে চাইল। তাই বেয়ারাকে দিয়ে অসময়ে এককাপ চা আনাল। চা খেল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে ফাইল খুলল। পাঁচটা টেনডারের acceptence letter লিখল। লাস্ট ডেট আজ। এগুলোর আজই ইস্যু হওয়া দরকার। আনসাকসেসফুল টেনডারারদের কয়েক হাজার টাকার জি পি নোট রিলিজ করল। আর গত টেনডার মরশুমের দুজন টেনডারার কনট্রাক্ট ব্রিচ করায় তাদের মোট বিশ হাজার টাকার earnest money বাজেয়াপ্ত করে চিঠি ছাড়ল।

ঘড়িতে ঢং ঢং কার দুটো বাজল। টিফিনের সময়। কিশলয়ের সামনে এখন শ্মশানের স্তব্ধতা। টাইপ মেশিনগুলো এতক্ষণ খট খটাং করে কাঁকিয়ে কাঁকিয়ে উঠছিল। এখন ছাড়া পেয়ে বিকট বেসুরো আওয়াজ থেকে কিশলয়কে মুক্তি দিয়েছে। কিশলয় জানে এবার মলয়কে নিয়ে সমীর শ্যামল উঠে পড়ে লাগবে আর মিসেস বোস্ হুইশিল বাজিয়ে রেফারির কাজ করবে। মলয় বড় ভাল ছেলে। কতই বা বয়স ওর। বড় শান্ত, সহজ সরল। রবীন্দ্র সংগীত শেখে। আবার সময় পেলে নাকি গল্প কবিতাও লেখে।

সমীর বলে, কিরে মলয়, তোর কি যেন হারিয়ে গেছে! —কবিতার খাতা।

— তাহলে সব শেষ বল! শ্যামল হাসতে হাসতে বলে।

মিসেস বোস্ মলয়কে আড়াল করে। শ্যামলকে বলে, কোনটা সুরু আর কোনটা শেষ তা তুমি জান?

শ্যামল হেসে ওঠে—এ আর কি কঠিন কথা দিদি! শুরু মানে begianing আর শেষ মানে end.

সমীর শ্যামলকে ধমকে উঠে বলে, তুই বড্ড ফাজিল দেখছি। না, আশাদি, শুরু মানে সূচনা আর শেষ মানে সমাপ্তি।

কিশলয় টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোবার ভান করে থাকে। নাহলে ওকেও অব্যাহতি দেবে না। কিশলয় ওদের মজলিসের একজন। মাঝে মাঝে দুচারটে টীকা-টীপ্পনী যে না কাটে তা নয়।

কোথায় শুরু, কোথায় শেষ। ভাল প্রশ্ন। শেষের পরে কী? শুরু, না একেবারেই শেষ। জীবনের পরে মৃত্যু এত স্বাভাবিক এবং নিয়মমাফিক। কিন্তু তারপর কি? পুনর্জন্ম না অন্যকিছু? শুরু, তাও বা কোথা থেকে? আমাদের যাত্রা হোল সুরু। সে ত একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে। সুতরাং শুরুর আগে একটা কিছু আছে, নয়কি? তাহলে মৃত্যুর পরেও কিছু নেই? পলায়ন, অব্যাহতি না মুক্তি? এ জন্মে তোমাতে আমাতে মিলনে বাধা। সমাজ সংসার চায় না। এস, তোমাতে আমাতে একসাথে মরি। কিন্তু কেন? কিসের আশায়? মৃত্যুর পর কি ওরা অন্য কোথাও অন্য কোনখানে মিলনের ইঙ্গিত পেয়েছে?

কিশলয়ের বন্ধু সদানন্দ একদিন বলেছিল, পাহাড়ের পরও পাহাড় থাকে। সমুদ্রে যতদূর তাকাও খালি জল। কিন্তু আকাশ আর জল যেখানে মিশে যায় সেখানেই দৃষ্টি যায় হারিয়ে। কিন্তু তারপরও তো সমুদ্র আছে। কাজেই পর্বতশ্রেণী তা যত বিস্তৃতই হোক না কেন এরপরে কোথায় না কোথাও সমতল ক্ষেত্র। সমুদ্র যত বিশাল এবং দীর্ঘই হোক না কেন, এর পরেই মাটি। সব কিছুর এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। জীবন মৃত্যু চক্রাকারে চলেছে। এর বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

কিশলয় উত্তর দিয়েছিল, Nothing lasts for ever. All things are liable to decay and destruction.

কাজেই জীবনের চরম পরিণতি মৃত্যু। তারপর জানি না।

কাকলি একটু স্বতন্ত্রভাবে বলেছিল, না মশাই, তুমি ভুল বলছ। আমার কথা হচ্ছে—Nothing is destructible. It only changes its form. It's just a pause for switch over.

কিশলয়ের পাশের সিটের ছোকরাটি ঝোলা নিয়ে সেই সাত-সকালে উধাও। ওর ঝোলার মধ্যে দুটো বোতল ছিল থ্রি-এক্স রামের। বড় জোগাড়ে ছেলে। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে কোন হোমরা-ছোমরার থ্রু দিয়ে জলের দরে কিনেছে। কাকে যেন প্রেজেণ্ট করবে বলছিল।

কতদিন পর কিশলয় মদের বোতলে হাত দিল। লাল পানীয়টা চলকাচ্ছিল। আর ওর টাকরাটা শুকিয়ে যাচ্ছিল। বিদ্যুতে হাত দিলে যেমন তার শিহরণ সারা অঙ্গে অনুভব করা যায়, বোতলটায় হাত দিতেই কিশলয়ের মধ্যে ওই রকম তাৎক্ষণিক একটা শিহরণ বয়ে গিয়েছিল। বোতল দুটো একরকম ছুঁড়েই ঝোলার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

কিশলয়ের মনটা আবার আনচান করছে। পুরনো ক্ষতটা আবার যেন দগ-দগিয়ে উঠছে। তা পাঁচবছর হবে। পাঁচবছর আর ও জিনিষ স্পর্শ করেনি কিশলয়। অথচ তার আগে এমন দিন গেছে ওর যখন সকাল থেকে রাত অবধি ঘরে বসে একটার পর একটা বোতল খুলেছে আর যতক্ষন না চেতনা হারিয়ে খাটে লুটিয়ে পড়েছে ততক্ষণ চালিয়ে গেছে।

মদের চাইতে stimulant কিছু পেয়েছিল কিশলয়। আজ এই মুহূর্তে ওর হাসি পাচ্ছে। কাকলি সান্যাল। ওইরকম সফিস্‌টিকেটেড্ লেডি আজ অবধি একটাও ওর নজরে পড়েনি। অসামান্য রূপ আর যৌবন নিয়ে একটা বর্ষার দিনে কাকলি অফিসে জয়েন করেছিল। শাড়ীর পেছনে কাদা লেগেছিল। কিশলয় দেখে চুপ করে থাকতে পারেনি। তাই বলে ফেলেছিল, এমন দামী শাড়ীটা বর্ষার দিনে পরে মাটি করলেন?

কাকলি কয়েক সেকেণ্ড কটমট করে তাকিয়েছিল। তারপর উত্তর দিয়েছিল, মেয়েদের সাজ-পোষাকের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করা সভ্য মনের পরিচয় নয়।

কিশলয়ের মুখ বেঁধে দিয়েছিল। কাজেই দু-তিনদিন ওকে লুকিয়ে চুরিয়ে দেখেছে। কথা বলতে বা ধারে-কাছে যেতে সাহস পায়নি।

দিন মাস গড়িয়ে গেল। কিশলয়ও ধীরে ধীরে প্রেমের পিচ্ছিল পথে সাবধানে গড়িয়ে গড়িয়ে কাকলির কাছাকাছি এল। ও কি চায়, কি পছন্দ করে, ওর মনের গতি-প্রকৃতি, ওর ভাল মন্দর মাপকাঠি, কি ধরণের আচার-আচরণ ওর মনের মত—সব কিছু বোঝার চেষ্টা করে কিশলয় নিজেকে প্রস্তুত করছিল।

দু-একবার মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল—চল কাকলি, তোমাদের বাড়ী যাই।

কাকলি বলে উঠেছে—না, এখনও সময় হয়নি।

কিশলয়ের পাল্টা প্রশ্ন ঃ তবে আমাদের বাড়ীতে চল।

ওর নিরুত্তাপ উত্তর ঃ কি হবে গিয়ে?

কিশলয়ের রাগ হোত। কিন্তু মুখ বুজে কাকলির কঠিন মনোভাব সহ্য করত।

এমনিতে ছুটির পর ওরা দুজন গল্প করতে করতে হাঁটত। রেঁস্তোরায় চা বা খাবার খেত। মাঝে মাঝে সিনেমাও দেখত। কিন্তু ছুটির দিন কাকলি বেরুতে চাইত না। আর কিশলয় সপ্তাহের ঐ একটা দিন বাড়ী বসে মদ গিলত।

কিশলয়ের বাল্যবন্ধু সদানন্দ কিশলয়ের অফিসে যাতায়াত করত। টেনডার, কোটেশন দিত। কিশলয়ের সংগে চা খেত, গল্প করত। কাকলির সংগেও আলাপ হোল। কিশলয় আড়ালে বলত, সদা, কাকলির দিকে কখনও হাত বাড়াস না, ভাই।

সদানন্দ হাসত। কালো, রোগা চেহারা। তবে ওর দাঁতগুলো অদ্ভুত সাদা। মুক্তোর মত ঝকঝকে। কিশলয়কে বলত, কবে নেমন্তন্ন খাওয়াবি বল।

—সময় হলে চিঠি পাবি।

—কত দেরী?

—জানি না।

—আমি কি তোকে সাহায্য করতে পারি?

—মানে?

—এর আর কোন মানে আছে নাকি? তুই আমার বন্ধু। তুই সুখ শান্তি পাস এক্কি আমি চাইতে পারি না?

কিশলয় সদানন্দকে জাপটে ধরে বলেছিল, তুই-ই আমার প্রকৃত বন্ধু।

এরপর আরও ছ'টা মাস কেটে গেল। কাকলি আরও সুন্দরী হয়েছে। ও আজকাল কথায় কথায় হাসে। মাঝে মাঝে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। নিজেই একদিন সিনেমা দেখতে চাইল।

সেদিন শনিবার ছিল, কিশলয়ের মনে পড়ছে। লাইট-হাউসে কিশলয়, সদানন্দ আর কাকলি। কাকলি মাঝখানে বসেছে। পাশে কিশলয় আর সদানন্দ। খলনায়ক জোর করে নায়িকাকে বিবস্ত্র করে রেপ করতে উদ্যত। কাকলি উঠে পড়ল। অন্ধকারে কোন এক দর্শক বলে উঠল, কি Madam; উঠলেন কেন, অস্বস্তি হচ্ছে নাকি?

কাকলি বাইরে চলে গেল। সদানন্দ পেছন পেছন বেরল। অগত্যা কিশলয়ও উঠল।

কাকলি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সদানন্দ জিজ্ঞেস করে—কি হোল আবার তোমার? উঠে এলে কেন?

—ভাল লাগল না বলে।

—ও, বাড়ী যাবে তো? চল, বাসে তুলে দি।

তিনজনে হাঁটছিল। এমন সময় একটা প্রাইভেট কার ওদের পাশে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে এক সুদর্শন যুবক কাকলির সামনে নেমে আচমকা প্রশ্ন করল—কাকলি না! কি, আমাকে চিনতে পারছ?

—না।

—চিনছ ঠিকই, না চেনার ভান করছ। ভাল করে দেখ না।

সদানন্দ এগিয়ে গিয়ে বলে—পথ ছাড়ুন। আমাদের যেতে দিন।

—দাঁড়ান। আপনারা কে জানতে পারি কি?

—আমাদের পরিচয় থাক। আপনি ভদ্রমহিলাকে কেন বিরক্ত করছেন যখন উনি আপনাকে চেনেন না বলছেন?

ভদ্রলোক এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর নিজেই বললেন Sorry, তুমি আবার জোরে হাসা পছন্দ কর না। ও হো, আমি কে জানতে চেয়েছেন, তাই না? শুনুন তাহলে, আমি কাকলির husband.

কাকলি এবার মুখ খোলে, husband! তা একদিন ছিলেন বৈকি। সে ত বছর দুই আগে চুকে-বুকে গেছে।

কাকলি হাঁটতে থাকে। কিশলয় ও সদানন্দ ওর পেছন পেছন চলে।

তিনটে প্রাণী এগিয়ে চলেছে। সামনে কাকলি, তারপর সদানন্দ। তারপর কিশলয়। কখনও সদানন্দকে পেছনে ফেলে কিশলয় এগিয়ে যায়। কখনও বা কিশলয় নিজেই পিছিয়ে পড়ে। ওরা হাঁটছে তো হাঁটছেই। থামার নাম নেই। মনে হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক যুগকে মাড়িয়ে প্রস্তর, তাম্র যুগকে পেছনে ফেলে বর্ত্তমান সভ্যতাকে দলে মুচড়ে নিঃশেষ করে আগত ভবিষ্যতের তোরণ দ্বারের অন্বেষণে কখনও একই সরলরেখায় আবার কখনও বা এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলেছে। তারপর সদানন্দর গায়ে যখন কিশলয় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তখন চমকে কিশলয় জিজ্ঞেস করল—কাকলি, কাকলি কোথায় পালাল?

সদানন্দ কনুইয়ে ধাক্কা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল—চুপ কর, রাস্কেল।

এরপর কাকলির গলা পাওয়া গেল, তোমরা পেছন ছাড়। Please, আমাকে একা থাকতে দাও। তোমাদের কী কোন কাজ নেই, বাড়ীঘর নেই! কেন আমাকে জ্বালাতন করছ?

সদানন্দ আর কিশলয় পলকে দৃষ্টি বিনিময় করে। অবস্থা বোঝার জন্যে কিশলয় পকেট থেকে সিগারেট বার করে একটা নিজের ঠোঁটে নিয়ে অপরটা সদানন্দর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে কাকলির দিকে তাকিয়ে থাকে। কী অন্ধকার এখানটা। দূরে দূরে কয়েকটা আলোর ফুটকি চলে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে। ফস্ করে সদানন্দ দেশলাই জ্বালিয়ে কাঠিটা কিশলয়ের মুখের দিকে দেয় তারপর নিজেরটা ধরিয়ে কাঠিটা মাঠে ফেলে দেয়। কয়েক সেকেণ্ড, হ্যাঁ, কয়েক সেকেণ্ড কিশলয় কাকলির মুখটা দেখতে পেয়েছিল। ওর রক্তিম গাল বেয়ে জলের ধারা নামছিল।

দুজনে একই সংগে সিগারেটে ঘনঘন টান দিচ্ছিল আর দুজনেই সেই আলোয় কাকলির দিকে তাকাচ্ছিল। কাকলি অন্ধকারে দৃষ্টি চালিয়ে কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তার-

পর হাতে যখন ছ্যাঁকা লাগল তখন সিগারেটের শেষ অংশটা কিশলয় ছুঁড়ে ফেলে দিল। দেখাদেখি সদানন্দও দুটো নখের টোকা দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু সিগারেটটা অবহেলায় দূরে নিক্ষেপ করল। অন্ধকার আবার তিনজনকে টেনে নিল। এবং তখনই কাকলি শান্ত কিন্তু অতি ক্ষীণ স্বরে বলল—তোমরা দাঁড়িয়ে কেন, বোস না! ওরা দুজনে ধুপ করে কাকলির পাশে বসে পড়ল।

সদানন্দ বলল—কাকলি, চল, তোমাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দি।

—কেন, আমাকে আর ভাল লাগছে না বুঝি? কিগো কিশলয়, তোমার কি মত?

কিশলয় আমতা আমতা করে বলে—না, মানে আজকের একটা বিশ্রি পরিস্থিতির জন্যে আমরাই দায়ী। সদানন্দ ঠিকই বলেছে তোমার বাড়ী যাওয়া উচিত। আর, তাছাড়া রাত হচ্ছে, জায়গাও সুবিধের নয়। বদমাইশ লোকের জন্যে নয়, পুলিশে হুজ্জতি করতে পারে।

এরপর কয়েক সেকেণ্ড নীরবতা। তারপর কাকলি দুম করে বলে বসল—আমার প্রাক্তন স্বামীকে দেখলে? কিছু জানতে ইচ্ছে করছে না তোমাদের?

সদানন্দ বলল—না, কি হবে জেনে? যা গেছে, তাকে যেতে দাও। কবরেই শান্তি। তাকে বাইরে আলো-বাতাসে টেনে এনে কি লাভ। বিশুদ্ধ হাওয়া দুর্গন্ধ বয়ে বেড়িয়ে কলুষিত হয়ে যাবে যে।

সদানন্দর কথায় কিশলয়ের রাগে গাটা রি রি করে জ্বলে যায়। কাকলি কোনদিন মুখ খোলেনি। আজ নিজে থেকেই মুখ খুলে হাল্কা হতে চাইছে হয়ত। বাধা দিলে ওর না-বলা কথা আরও বেশী ওকে কষ্ট দেবে। এই ভেবে কিশলয় বলে ওঠে—কাকলি, তোমাদের এককালে বিয়ে হয়েছিল, এখন ছাড়াছাড়ি, এইতো? যদিও কিশলয় দেখতে পাচ্ছিল না তবুও কেন জানি ওর মনে হল কাকলি বড় করুণ করে হাসল।

—হ্যাঁ, সুমনের সংগে আমার বিয়ে হয়েছিল। বছর-তিন ঘরও করেছিলাম। কিন্তু আমিই আলিপুর কোর্টে ম্যাট্রিমনিয়াল সুট আনলাম—ডিভোর্স চাইলাম। আমার উকিল অ্যালিমনি বা মেইন্টিন্যান্সের জন্যে আমাকে বলেছিল। আমি রাজি হইনি।

—কারণ কি দেখালে?

—দেখালাম মানে? তুমি কি বলতে চাও আমি সাজান মামলা করেছিলাম?

—না, মানে আমার ওরকমভাবে বলা ঠিক হয়নি। আসলে আমার বক্তব্য, কি কারণে এরকম হোল।

—মদ খেয়ে অত্যাচার।

—মদ খেয়েতো অনেকেই স্ত্রীর ওপর নিপীড়ন করে শুনেছি। পাশের লোক কিছু বলতে এলে সেইসব স্ত্রীরা ঝাঁঝিয়ে ওঠে—আপনাদের কি মশাই। আমার স্বামী এখন অস্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছেন, তাই মারছেন।

কাকলি এবার বড় অদ্ভুত কথা শোনায়—সুমনের চাপে আমিও মদ ধরেছিলাম। অবশ্য বাড়ীতে মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প খেতাম।

—কি আশ্চর্য, তুমি নিজে মদ খেতে, আর মদের জন্যে সুমনকে ডিভোর্স করলে? ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে, একটু খুলে বলবে?

—না, এর বেশী এখন কিছু বলা সম্ভব নয়। চল, ওঠা যাক। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

সোম থেকে শুক্রবার মনের সংগে অহরহ যুদ্ধ করেছে কিশলয়। এ পাঁচটা দিন কাকলির সংগে অফিস ছুটির পর ও কোথাও যায়নি। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে খালি ভেবেছে ওর কি করা উচিত। কাকলির তাহলে একদিন বিয়ে হয়েছিল। তিনটে বছর একখাটে দুজনে রাত কাটিয়েছে। তাই বলি, পুরুষে ওর এত অনাসক্তি কেন। সব চাওয়া-পাওয়া যে হয়ে গেছে। নতুন জীবনের থিলে তাই আজ আর ওর মধ্যে নেই। থাকতে পারে না। কাজেই ওর সংগে জীবন জড়ালে নতুনত্বের সুখ বা আনন্দ ওকি কিশলয়-কে দিতে পারবে? ওর অভিজ্ঞতায় কিশলয়ের অনভিজ্ঞ মন মাথা খুঁড়ে মরবে। অথচ এওতো চলতে দিতে পারা যায় না। কি কুক্ষণে যে সদানন্দর সংগে ওর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল কিশলয়। সদানন্দ যে ওকে জয় করে কিশলয়ের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে—তাই-বা কি সহ্য করা

যায়? এ হবে যে কিশলয়ের বিরাট পরাজয়। মন বলে, এসব চিন্তা ঠিক নয়। তুমিতো ওকে এড়াতে চাইছ। সদানন্দ যদি কাকলিকে নিয়ে ঘর বাঁধে তোমার তাতে কি? তুমিতো কাকলিকে ভালবাস না। কে বলল, কিশলয় কাকলিকে ভালবাসে না। ভালবাসে বলেই না সদানন্দ-কাকলিতে মিলনে এত আপত্তি। ভালবাসা কি শুধু দুটো দেহের বন্ধনে না দেহাতীত কোন কিছুর উত্তরণে? কিশলয় কাকলিকে হারাতে চায় না। হারালে, ওর ভেতরটা ভীষণ ফাঁকা হয়ে যাবে।

শনিবার পে-ডে ছিল। মাইনে পেতে পাঁচটা বেজে গেল। কিশলয় আর কাকলি দুজনে একসাথে বেরুল। সদানন্দ বাইরে অপেক্ষা করছিল। ওদের সংগ নিল। সারা ডালহৌসি পাড়াটা ফাঁকা। কিছুদূরে ধোঁয়ার একটা স্তর বাতাসে ডানা মেলে থমকে শূন্যে ভাসছে। একটা প্যাঁচা ডানা ঝাপটে বিকট চিৎকার করতে করতে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

কাকলি বলল - আজ থাক কিশলয়, অন্যদিন কেনাকাটা করা যাবে।

কিশলয় বলেছিল—আজ নয় কেন?

—প্যাঁচাটা কেমন বিশ্রী ডেকে উঠল, দেখলে না? কালো বেড়াল আর প্যাঁচার ডাক বড় অলুক্ষণে। আজ থাক কিশলয়।

—তোমার বড্ড সেকেলে মনোভাব। লক্ষ্মী প্যাঁচা আর সাদা বেড়ালের ডাক অশুভ বলতে চাও?

—জানি না, যাও।

সদানন্দ এবার বলে—বলছ যখন, আজ থাক। চল, ওকে বাসে তুলে দিয়ে আমরাও বাড়ী যাই।

কাকলি বলে—ঠিক আছে, চল। তবে তাড়াতাড়ি কেনাকাটা করে বাড়ী ফিরব।

কাকলি একটা কাশ্মিরি শাল কিনল। কিশলয় কিনল একটা সোয়েটার। কাকলির জন্যে একটা শাড়ীও পছন্দ করে দাম দিতে গেল। কাকলি কিছুতেই নিতে চাইল না।

—না, না, শুধু শুধু পয়সা কেন নষ্ট করছ?

—তোমাকে যতবার কিছু দিতে গেছি, ততবার না করেছ। আমার যদি কিছু দিতে ইচ্ছে করে, তুমি নেবে না কেন?

সদানন্দ বলে—কাকলির যখন আপত্তি তখন জোর না করাই ভাল।

কিশলয় ধমকে ওঠে—তুই চুপ কর। তোর পাকামো ভাল লাগে না।

ওরা গল্প করতে করতে 'রাতদিনে' ঢুকল। তিনটে চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

মেনুচার্ট টেবিলে রয়েছে। চার্টটা কাকলির দিকে ঠেলে দিয়ে কিশলয় বলল—বল, কি খাবে।

কাকলি চার্টটায় চোখ বুলিয়ে বলল—স্যুপ আর চিলি চিকেন।

বলতে হল না। ওয়েটার কাছেই ছিল। কয়েক মিনিট পর টেবিলে খাবার দিয়ে গেল।

খাওয়া হয়ে গেল। বয় টেবিল পরিষ্কার করল। ওয়েটার এসে জিজ্ঞেস করল, কি ড্রিঙ্কস দেব বলুন।

সদানন্দ চোখ কপালে তুলে বলল—ড্রিঙ্কস কি হবে? কে খাবে?

কিশলয়ের পিত্তি জ্বলে গেল ওর ন্যাকা-ন্যাকা কথা শুনে। সাধু সেজে জয় করতে চাও, তাই নয়?

কিশলয় বলে, সদা, তুই যেন ড্রিঙ্কস বলে কোন পদার্থ আছে তা এইমাত্র জানলি?

—না, ওসব আমার চলে না।

—সদা, ন্যাকামি করিস না। তোর চলে না, আমাদের চলে, তাই নয়? তুই তো বেশ বড় ব্যবসাদার। ব্যবসার খাতিরে কত পার্টিতে যাস, কত পার্টি দিস। আর তুই শুধু লেবুর-রস খাস, তাই না?

—না, মানে—

—থাক। কাকলির কাছে আর নিজের ইমেজ বাড়াতে হবে না।

—কি বললি, রাস্কেল, নিজের ইমেজ বাড়াবার জন্যে আমি অনাসক্তি দেখাচ্ছি? ঠিক আছে, দেখি, কত খাওয়াতে পারিস।

ওয়েটারকে একটা হুইস্কি আর দুটো লাইম জুস দিতে

বলল কিশলয়। কিশলয় সদানন্দর হাতে হুইস্কি তুলে দিল। নিজেরা নিল লাইম জুস। তারপর চিয়ার্স বলে তিনজনেই গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াল।

ঐ দিন সদানন্দর কি হয়েছিল কে জানে। চার-পাঁচ পেগ টেনে নিল। দাম দিয়ে যখন কিশলয় উঠে পড়ল, তখন সদা উঠতে চায় না। ও আরও খাবে। ওর গলা জড়িয়ে যাচ্ছে, পা টলছে, তবুও জড়ান গলায় বলছে—কিরে যাওয়া, মাল ফুরিয়ে গেল নাকি?

বাইরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। কাকলি সদাকে তুলল, তারপর নিজে উঠে বলল, সদানন্দকে বাড়ী পৌঁছে দি। তুমি অন্য ট্যাক্সি ধরে বাড়ী যাও।

ওদের ট্যাক্সি কিশলয়ের চোখেমুখে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ছ ছ করে বেরিয়ে গেল।

সোম, মঙ্গল, বুধ কাকলি অফিসে এল না। বৃহস্পতিবার কিশলয় ভাবল, সদার বাড়ী একবার যেতে হবে। কিন্তু যেতে আর হোল না। কাকলির একটা চিঠি পেল। চিঠিটা কতদিন কতবার পড়েছে কিশলয়। পড়তে পড়তে চিঠিটা মুখস্থ হয়ে গেছে। চিঠির অক্ষরগুলো এই মুহূর্তে কিশলয়ের চোখের সামনে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে ঃ

প্রিয় কিশলয়

তোমার চালাকি ধরে ফেলেছি। ছি! তুমি এত নীচ! তুমি জানতে মদকে আমি ঘৃণা করি। তাই প্ল্যান করে সদানন্দকে মদ-খাওয়ার challenge জানালে। ভাবলে, সদানন্দ ব্যবসাদার, ও যে পার্টিতে যায় এবং মদ খায় তা প্রমাণ করে দেবে। এবং আমার কাছ থেকে ওকে সরিয়ে নেবে। ভুল, এসব তোমার ভুল। তুমি কি মদ খাও না? ভাবছ, আমি জানলাম কি করে। প্রতি রবিবার তুমি চুড়ান্তভাবে মদ খাও। তাইতো সোমবার কাজ করতে তোমার ভাল লাগে না। সারাদিন আচ্ছন্ন ভাবটা তোমার থাকে। তোমার hanged অবস্থাটা আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। অতিরিক্ত মদ্যপানের পর পরের দিন সুমনের ঐ ভাবটা আমি দেখতাম। আর তাছাড়া আমিও যখন সুমনের পাল্লায় অতিরিক্ত খেতাম, পরের দিন আলস্যে গা জড়িয়ে সময় কাটাতাম।

সে রাত সদানন্দকে আমার বাড়ীতে এনেছিলাম। তার পরের দিন বাইরে ওকে বাড়ী পাঠিয়েছি। অফিসে resignation পাঠালাম। সদানন্দর সংগে ঘর ছাড়লাম। ওকে আমার ভাল লাগে। আর ও আমাকে একান্তভাবে চায়। বিয়ে করে এবার হয়ত শান্তি পাব।

আর ভাল কথা, সদানন্দকে সব বলেছি। মীরচান্দানির কথাও বাদ দিইনি। দীঘায় সুমন Import license quota বাড়াবার জন্যে মীরচান্দানির কাছে একটা রাত আমার অজান্তে আমাকে ভেট দিয়েছিল। সদানন্দ কিছু শুনতে চায় না, জানতে চায় না। শুধু বলে, অতীতের জানায় চড়ে বর্তমান পাড়ি দিয়ে ভবিষ্যতে যেতে চাই না। তোমার এই স্বীকারোক্তিই তোমার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়, অবিচার আর পাপকে (অবশ্য সদা এটাকে পাপ বলে না) ধুয়ে, মুছে সাফ করে দিয়েছে।

যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, ক্ষমা কোরো।

কে যেন হাত দিয়ে কিশলয়ের পিঠে নাড়া দিচ্ছে। কিশলয় টেবিল থেকে আস্তে আস্তে মাথাটা তুলে দেখে মলয়।

কিশলয় বলে, কিছু বলবে?

—আপনাকে ডাকছে।

—কে ডাকছে?

ততক্ষণে ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে পড়েছেন। কিশলয় একি দেখছে। ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কাকলি, স্যরি, বৌদি তুমি? কী ব্যাপার?

—একটু বাইরে আসতে পারবে?

কিশলয় চটি গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বাইরে একটা ফুটফুটে বছর দশ-বারোর ছেলে দাঁড়িয়ে।

কাকলি বলে, প্রণাম কর, অনু।

কিশলয় বাধা দিয়ে বলে—থাক, থাক। কি নাম তোমার?

—অনুতোষ চ্যাটার্জি।

কিশলয় হাসতে হাসতে বলে, কি খবর বৌদি? কেমন আছো? এতদিন পরে কি মনে করে? সদানন্দ কেমন আছে?

কাকলি এবার ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। ওর মুখটা থম থম করছে। কিশলয়ের ভয় ধরে গেল। আবার কি হোল?

কাকলি ব্যাগ খুলে একটা কার্ড কিশলয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সামনের শনিবার অনুর পৈতে। তোমাকে যেতে হবে। কেনাকাটা, জোগাড় সব তোমায় করতে হবে। আমার আর কে আছে বল!

কিশলয়ের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কেন, সদা কোথায়?

কাকলি ব্যাগ হাতড়াতে লাগল। তারপর ব্যাগ থেকে একটা খাম বার করে কিশলয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ধর এটা।

কাকলি অনুর হাত ধরে ঝড়ের বেগে চলে গেল।

কিশলয় ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

চেয়ারে বসে খামটা খুলে ফেলল কিশলয়। তারপর চিঠিটা পড়তে লাগল:

প্রিয় কিশলয়—

ভাবছ তের বছর পর হঠাৎ কী এমন হ'ল চিঠি লেখার? তাই না? তা তুমি ভাবতে পার, এটাই স্বাভাবিক? আর আমিও এ কবছর ধরে ভেবেছি তোমাকে চিঠি লিখব কিনা।

সদানন্দ আজ আর নেই। মৃত্যুর দিন কয়েক আগে আমাকে বলেছিল, আমি যাচ্ছি। হয়ত তোমার ওপর, কিশলয়ের ওপর অনেক অন্যায় ও অবিচার করে গেলাম। ও বেচারি আমার জন্যে বিয়েও করল না, ঘরসংসার, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখশান্তি পেল না। আর সেই পাপেই তো আমার এ কালরোগ।

আমি সদাকে বোঝাতে চেষ্টা করতাম, ছি! তোমার কী দোষ, আমিই তো তোমাকে বেছে নিয়েছি। কিশলয়ের সব ক্ষয়ক্ষতির জন্যে আমিই দায়ী।

সদানন্দ কাঁদত আর বলত, তোমাকে ঠিক সুখশান্তি দিতে পারলাম না। দেখ, কত তাড়াতাড়ি তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

সদানন্দর চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলতাম, ও কথা বোল না। এই তের-বছর তুমি আমাকে কত সুখই না দিয়েছ। তুমি আমাকে সন্তান দিয়েছ। আজ আমি মা। আমার আর কি চাই?

সদানন্দ তবু খুঁত খুঁত করত আর বলত, তোমার এবং অনুর বয়স বা কি এমন? তোমাদের দেখবেই বা কে?

কিশলয়, এসব কথা আজ কেন লিখছি তা হয়ত ভাবছ। সদানন্দ আর তোমার মধ্যে যে পত্র বিনিময় ছিল তা আমি জানতাম না। ওর মৃত্যুর কয়েকদিন পর তোমাকে লেখা ওর চিঠির কপিগুলো আর তোমার চিঠির উত্তরগুলো পাই। তোমাকে লেখা ওর শেষ চিঠি পড়ে ভাবনায় পড়েছিলাম। তাতে ও তোমাকে তিনটে প্রশ্ন করেছিল: এক—ও যদি হঠাৎ মারা যায়, তুমি অনু আর আমার ভার নেবে কিনা। দুই—যদি নাও, অনুকে কি নিজের পুত্র স্বরূপ লালন-পালন করতে পারবে? তিন—আমাকে কি মর্যাদায় গ্রহণ করবে। তুমি প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলে। শেষেরটা সম্বন্ধে কিছুই লেখনি।

তোমার লেখা শেষের আগের চিঠিটাও পড়েছি। তাতে তুমি বিয়ে না করার যুক্তি দেখিয়ে লিখেছ—ছায়া আর কায়া নিয়ে ঘর করা যায় নাকি? কায়ার ওপর অবিচার করা হবে কেন না ছায়া সংঘাত বাধাবে। কায়ার ওপর স্বামিত্ব ফলাতে গেলে ছায়ার ওপর বলাৎকার করা হবে—এটা অন্যায় নয় শুধু— অযৌক্তিকও বটে।

যাক, আমি স্বীকার করছি এই ক'বছরে আমি অনেক সুখশান্তি পেয়েছি। কিন্তু তোমার জীবনটা যে ফাঁকা করে দিলাম। সদানন্দর সংগে আলাপ না হলে আমি তোমারই হতাম। কেননা, সুমন আমাকে যে অপমান করেছিল, তা আমি ভুলতে পারছিলাম না এবং একটা নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম খুঁজছিলাম। সুমন মদ্যপ। সুমন আমাকে মাতৃত্ব দিতে অক্ষম ছিল। তাতে কি যায় আসে? কিন্তু ও স্ত্রীরচান্দানিকে দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চেয়েছিল। এক—ইমপোর্ট কোটা বাড়িয়ে নেওয়া, দুই—বন্ধু-বান্ধবদের কাছে নিজের পিতৃত্বের বাহাদুরি জাহির করা। কাজেই সুমন নারিজাতির কাছে একটা কলঙ্ক মাখানো নাম মাত্র। কিন্তু তুমি? তোমাকে হয়ত আমি খানিকটা ঠকিয়েছি। সদানন্দর সংগে তোমাকে আমি compare করেছি আর যে

মুহূর্তে সদানন্দর দিকের পাল্লাটা ভারী মেকেছে সে মুহূর্তে তোমাকে সরিয়ে দিয়েছি।

কিশলয়, তোমার সবে বিয়াল্লিশ বছর বয়স। বিয়ে করে বউ এনে আমাকে শান্তি দাও, লক্ষ্মীটি। তোমার দিক থেকে কোন ভয়ের জন্যে একথা বলছি না। তুমি যে চোর-ডাকাত নও, এ ত আমি এক বছরেই জেনেছি। আর বিয়ে যদি একান্ত না কর, শান্তিনিকেতনে স্বচ্ছন্দে চলে আসবে। যতদিন ইচ্ছে থাকবে। আর কিছু না পারি, তোমার সেবা-যত্ন তো করতে পারব।

কিশলয়ের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল।

মলয় আমতা আমতা করে বলে, আপনি কাঁদছেন, কিশলয়দা।

কিশলয় রুমাল দিয়ে চেখে মুছতে মুছতে বলে—দেখ দেখি, এটা অফিস, ভুলেই গিয়েছিলাম। অনু আর আমার বৌদি সব গোলমাল করে দিল।

যৌতুক

সন্তোষ মিত্র

বিড়াল যেমন মাছের গন্ধে রান্নাঘরের আশেপাশে ঘুর ঘুর করে, কালিপদবাবুও দেখি গল্পের প্লটের খোঁজে যান না এমন জায়গা নেই। সব সময় লেগে আছেন কোথায় কার কি হল। যতটা ওঁর পা-দুটো চলে মাথাটা তত খেলে না।

গতকাল সকালের দিকে বাইরের ঘরে বসে আছি, হাতে তেমন কোন কাজ নেই। হঠাৎ কালিপদবাবু এসে হাজির। আর এসেই "বৌদি এক কাপ চা" বলে হাঁক পাড়লেন ঘর কাঁপিয়ে। আমি বললাম—"বসুন, চা নিশ্চয়ই হবে। তারপর খবর কি?"

"ও দারুণ একটা খবর আছে আজ। আগে বৌদি আসুন, পরে বলছি।"

আমি জানি কালিপদবাবু বৌদির আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না—যদি তেমন কোন ঘটনা থাকে। ভদ্রলোকের এই স্বভাব। কোথায় যান, কি করেন, কেন করেন, কোন্ পত্রিকায় ওঁর লেখা ছাপা হচ্ছে বা হবে বলে

কথা উঠেছে—সব খবর পুঙ্খানুপুঙ্খ আমায় শুনাতে পারলে কেমন যেন তৃপ্তি পান। আমিও ভদ্রলোকের আগ্রহে ও ইচ্ছায় বাধা দিই না কোনদিন। তবে আমি নিজে ঘরকুনো মানুষ। তার উপর আলসেমীও আছে। বিশেষ বাধ্য না হলে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে ইচ্ছা করি না।

তাই বললাম—এবারকার লেখাটা তাহলে এই দারুণ-খবরটা নিয়েই হবে?

কালিপদবাবু বললেন—আচ্ছা দাদা গল্পটা না বলে ঘটনাটা তোমাকে বলছি। দেখত এতে একটা গল্প হয় কি না?

আমি বললাম—সমস্ত ঘটনাই গল্প নয়, কিন্তু সমস্ত গল্প ঘটনাকেন্দ্রিক। কালিপদবাবু, আপনার ঘটনাকে গল্পে উত্তীর্ণ করতে আর্টএর সাহায্য নিতে হবে। তারপর শিল্প সরস্বতীর কৃপা দৃষ্টিতে যদি শিল্প কর্ম্ম সুন্দর হয় তবে সেই ঘটনা গল্পে উত্তীর্ণ হবে। নইলে নয়।

কালিপদবাবু আর বৌদির চা হস্তে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলেন না। তবে বলে নিলেন "আমি ঘটনাটী যথাযথ বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব। এক্ষণে একে আপনি গল্প বলুন আর ঘটনাই বলুন সমস্তই আপনার মতি-মর্জ্জির উপর নির্ভর করছে।

"কি হয়েছে ঠাকুর পো" বলে ততক্ষণে চা হস্তে কালিপদবাবুর বৌদির প্রবেশ ও প্রশ্ন।

কালিপদবাবু বললেন "বৌদি, বসুন এখানে, বলছি।

"হ্যাঁ, এখন আমার বসার সময় কিনা। রান্নাঘরে উনানে রান্না হচ্ছে। আমি যাই। আপনারা বরং গল্প করুন।"

"আমার চা" বলতেই স্ত্রী বলে উঠলেন "সকাল থেকে তিনবার হয়ে গেছে। তোমায় আর চা খেতে হবে না।" ততক্ষণে কালিপদবাবু বলতে আরম্ভ করেছেন—মৃত্যুঞ্জয়-বাবু চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে প্রায় ৩৫।৩৬ হাজার টাকা পান Provident Fund ও gratuity বাবদ। তার থেকে প্রথম মেয়ের বিয়ে দিতে ২০।২১ হাজার টাকা চলে যায়। অবশিষ্ট থাকে হাজার ১৫ টাকা। ওঁর ছেলেটি লেখাপড়ায় তেমন ভাল নয়। ইদানিং একটা কাজ পেয়েছে এক মার্চেণ্ট অফিসে। থাকে উড়িষ্যায়।

এবার ছোট মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। তাকে পার না করলেই নয়। মেয়ে কিন্তু বলে যখন বি. এ. পাশ করেছি তখন বিয়ের চেষ্টা না করে বি. এডটা বরং পড়ে নিই। তারপর না হয় একটা চাকরী-বাকরী যোগাড় করা যাবে। কিন্তু মেয়ের মা মেয়ের বিয়ে দিতেই ব্যস্ত। এবং স্বামীকে সেই ভাবেই দিন রাত ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিলেন। ইদানিং মৃত্যুঞ্জয়বাবুও অনেক খোঁজাখুঁজি ও চেষ্টাচরিত্র করে একটা ছেলের খোঁজ পেয়েছেন শেষকালে।

ছেলেটি ব্যাঙ্কে চাকুরী করে। এম. কম. পাশ। সম্প্রতি ব্যাঙ্কের অফিসার হয়েছে। দুটি বোন ছিল। তাদেরও বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা মা ও ছেলে। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। এই খোঁজ পাওয়ার পিছনে একটু ইতিহাস আছে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখেছেন ঐ ব্যাঙ্কে ছেলেটি কাজ করে। কয়েকবার যাতায়াত ও কথাবার্ত্তায় জেনেছেন ছেলেটি অবিবাহিত ও ওঁদের পাল্টি ঘর। এবং এক্ষনে বিয়ে করতে সম্মত আছে। অবশ্য অধিকাংশ খবরই ছেলেটির সহকর্ম্মীদের কাছ থেকেই পাওয়া।

তাই তিনি যোগাযোগ করে ছেলেটিকে মেয়ে দেখিয়ে-ছেন। অবশ্য তার আগে ছেলের বাবা মা মেয়ে দেখে পছন্দ করে গেছেন। আর পছন্দ হবে নাইবা কেন? কল্যানী সত্যই সুন্দরী ও সুশ্রী, আর শিক্ষিত শুধু নয়, বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। বাড়তি আছে সুন্দর গান জানে মেয়েটি।

সব তো হল, তারপর কি হল? সেইটাই বলুন না বলে কালিপদবাবুকে তাড়া দিতেই কালিপদবাবু বলে চললেন—মেয়ের ছেলে দেখে এবং সবান্ধব ছেলের মেয়ে দেখে পর-স্পরের বেশ পছন্দ হয়েছে বোঝা গেল। এ পর্য্যন্ত সাধারণ আর পাঁচটা বিয়েতে যা হয় তাই হল। এবার আরম্ভ হল এক নূতন ঘটনা।

দাবি-দাওয়া পাত্রপক্ষের বাবা মা প্রায় কিছুই করলেন না-তবুও মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে সবার সামনে বিয়ে দিতে হবে, পাড়ার পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করতে হবে। তার খাওয়া-দাওয়ার খরচ আছে। এ দিকে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর ব্যাঙ্কে তো শেষ সম্বল ঐ ১৫ হাজার টাকা। তার সুদ

ও ঘর ভাড়ায় সংসারের হাল এখনও বজায় আছে। যদি সব টাকা বিয়েতে খরচ হয়ে যায় তবে সংসার চলবে কি করে? প্রথম মেয়ের বিয়েতে লোকের কথায় এবং নিজের আনন্দে কিছু ভাবনা চিন্তা না করেই অত খরচ খরচা করেছিলেন। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু শেষ পর্য্যন্ত গররাজী হলেন। কারণ পাত্রপক্ষের শেষ মেষ দাবী, পাত্র নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন কোন কিছু হৈ চৈ করার দরকার নেই। বিয়ে হবে শাঁখা-সিন্দুর দিয়ে। এমনকি ছেলেকেও কিছু দিতে হবে না তবে নগত ১৫ হাজার টাকা চাই। এবং টাকাটা আগাম দিতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বেঁকে দাঁড়ালেন। কারণ কিছু দান সামগ্রী দেওয়া হবে না, আলো জলবে না। পাড়ায় বন্ধু-বান্ধব যাদের কাজ কর্ম্মে উনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন তাঁদের কাকেও ডাকা চলবে না—এ কি রকম বিয়ে। আর ১৫ হাজার টাকা সবটাই যদি ছেলেকে দিয়ে দিই তবে কিছু না করেও ২।৩ হাজার টাকার সংস্থান হবে কোথা থেকে? আর নিজেদের জন্য হাতেই বা থাকবে কি?

শেষে দু বেলা দু মুঠো ভাত যোগাড় হবে কি করে? কালিপদবাবু বলে চললেন—তারপর অনেক জল গড়াল গঙ্গা দিয়ে। অনেক আলাপ আলোচনা চলল দু'পক্ষের মধ্যে। ছেলে প্রস্তাব দিল—কোন খরচ করা আমি পছন্দ করি না। আমি Register Marriageএ বিয়ে করতে রাজি আছি। তবে আমার ঐ ১৫ হাজার টাকা চাই এবং চাই আগাম।

হতাস হয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবু ও তাঁর স্ত্রী অনেক পরামর্শ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু সুরাহা হল না। শেষে মৃত্যুঞ্জয়বাবু বিয়ে ভেঙে দেওয়া স্থির করলেন কিন্তু ছেলে দেখে এবং তার সাথে কথাবার্তা বলে মেয়ের মা বেঁকে দাঁড়ালেন স্বামীর কথায়। একে তাঁর দেখে খুব পছন্দ হয়েছে। ছেলের মনে কি আছে কে জানে—মেয়ের মা দুদিন অন্ন-জল ত্যাগ করলেন। বললেন মেয়েকে এখানেই বিয়ে দিতে হবে নইলে আর কিছু মুখে তুলব না।

শেষে পর্য্যন্ত তাই হল। আগাম ১৫ হাজার টাকার চেক দিয়ে ছেলেকে আশীর্ব্বাদের পর্ব শেষ করে হতাশায় ভেঙে পড়লেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। বড় স্বাদ করে এই শহর-তলীতে বাড়ী করেছিলেন। শেষ জীবনটা সুখে থাকবেন। তা বোধহয় আর হল না। এবার বাড়ীটা হাত-ছাড়া করতে হবে।

থাক যা হবার হবে। শেষ পর্য্যন্ত শাঁখাসিন্দুর ও লাল পেড়ে সাড়ী দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু। কেউ কেউ বলেন শুভদৃষ্টির সময় মেয়ে ভাল করে মুখ তুলে তাকায় নি ছেলের দিকে। আবার কেউ কেউ বলেন শুভদৃষ্টির সময় দু'জন দুজনকে দেখেছিল কেমন এক কুটনৈতিক ঘোর প্যাঁচে।

কালিপদবাবু তারপর একটু থেমে আবার বলা শুরু করলেন। কিন্তু আমার মনটা কেন যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ছেলেটি কি? মেয়ের বিয়ে দিয়ে লোকে আত্মীয়তা পাতায় না ঘরে সর্ব্বনাশের বীজ বোনে! এই খরচ খরচার বিয়ে বন্ধ করা যায় না?

থাক শোনা যাক শেষ পর্য্যন্ত।

কালিপদবাবুর বলায় এবার কেমন যেন একটু চঞ্চলতা। এতক্ষণ ঢিমে তালে বলছিলেন এবার ওর গলায় জলুদের হাওয়া।

বিয়ের পরদিন মেয়ে জামাইয়ের বিদায় হওয়ার পালা। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। মঙ্গলশঙ্খ বাজছে মুহুর্মুহু। কল্যাণী ও সুব্রত বাবা-মাকে প্রণাম করে গাড়ীতে উঠতে যাবে এমন সময় সুব্রত বলল—তুমি আগে উঠ আমি একটু কাজ সেরে আসি।

কল্যাণী 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়ীতে এক পা বাড়িয়ে সুব্রত 'মা' বলে ডেকে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর স্ত্রীর হাতে একটা খাম দিয়ে বলল "মা এইটা রাখুন। আমরা চলে যাওয়ার পর এটা আপনারা দু'জনে খুলে পড়বেন। তারপর যত্ন করে রেখে দেবেন।"

"কি এটা" শ্বাশুড়ী জানতে চাইলেন। তখনও তাঁর কথাগুলি ভারী ভারী।

"সেটা পরে দেখবেন। আজ আমরা আসি" বলে আর

একবার নমস্কার করে সুব্রত চলে এল গাড়ীতে।

খামটা পেয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর স্ত্রীর কৌতূহল বেড়ে চলল প্রচণ্ড ভাবে। কি আছে এতে? তাড়াতাড়ি স্বামীকে ডেকে ঘরের ভেতর চলে গেলেন দু'জনে। খাম খোলা হল। বেরিয়ে পড়ল একটা চিঠি আর ১৫ হাজার টাকার ব্যাঙ্কের সার্টিফিকেট একটা। এবং সেটা মৃত্যুঞ্জয়বাবু ও তাঁর স্ত্রী কমলাদেবীর নামেই করা।

"আর চিঠিটা এই নাও দাদা। তুমি পড়" কালিপদ-বাবু থামলেন। কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল। পরের চিঠি, তবুও পড়লাম। পড়ার সময় আমার স্ত্রী একবার এই ঘরে এসেছিলেন। আমি একটা চিঠি পড়ছি দেখে বললেন—কি পড়ছ তোমরা!

আমি আবার গোড়া থেকে চিঠিটা পড়লাম—শ্রীচরণেষু মা, এই খামটির মধ্যে ১৫ হাজার টাকার ব্যাঙ্কের ক্যাস সার্টিফিকেটের একটা কাগজ আছে। ওটা আপনাদের দু'জনের নামেই যৌথভাবে করে দিয়েছি। হয়ত ভাবছেন এটা আবার আমার কি মতলব? কোন কিছু মনে করে আমি এটা করি নি। আপনাদের অবর্ত্তমানে আপনাদের ছেলেই যাতে ঐ টাকা পায় তার ব্যবস্থাও করা আছে ওতে। কেন এটা করলাম যদি জানতে চান তবে বলি—আপনাদের সব সংবাদ আমি পূর্ব্ব থেকেই সংগ্রহ করেছি। বড় মেয়ের বিয়েতে আপনারা যে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন তাও আমি জেনেছি। তাই সাধারণ আর পাঁচটা বিয়ে হতে গেলে কিছু না করেও আপনাদের ১০।১২ হাজার টাকা খরচা হয়ে যেত।

আমার বোনদের বেলায় দেখেছি বাবা-মায়ের সেকি করুণ মূর্ত্তি। আজ আমার বাবা সর্ব্বশান্ত, প্রায় নিঃস্ব বললেই চলে। যাক সে সব কথা। এই টাকাটা খরচা হয়ে গেল আপনাদের সংসারে প্রচণ্ড টান পড়ত, তাই শেষ পর্য্যন্ত চিন্তা করে আমি ঐ ১৫ হাজার টাকা দাবি করি। এবং মনে মনে সঙ্কল্প করি যে টাকাটা যদি বাঁচাতে পারি তবে এই ব্যবস্থাই নিই। এতে আমার কোন মহত্ব নেই। আমি আমার বাবাকে দেখে শ্বশুর মহাশয়ের কথা চিন্তা করেছি।

আমি আরও জানি যে উনি বড় সরল মানুষ তাই একজন সরল ও ধর্ম্মভীরু মানুষকে বাঁচাতে আমাকে ঐ রকম করতে হয়েছিল। এটা না হলে আপনাদের আরও অনেক বেশী খরচা হয়ে যেত।

যাক আমি যা ভাল বুঝেছি করেছি। এক্ষণে আপনাদের আশীর্ব্বাদ পেলেই নিজেকে ধন্য মনে করব।

ইতি সুব্রত।

আমার স্ত্রী পত্রটা শোনার পর বললেন আজ কাল এমন ছেলেও আছে? ভগবান ওদের সুখী করুন, কিন্তু ঠাকুরপো, ওদের একবার দেখাতে পার?

সাময়িকী

দীর্ঘ খরার পর রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার কবলে

দীর্ঘ খরার পর এবার বন্যা কাছাড়ের একলক্ষ মানুষের চরম বিপর্যয়ের বার্তা নিয়ে হাজির। লঙ্গাই, সিংলা, কাটাখাল ও কুশিয়ারা নদী বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে এবং বরাক নদীতে প্রচুর জলস্ফীতি ঘটেছে। গত ৩রা জুলাই ভোর বেলা পাথারকান্দির নিকটে করচরঘাটে ৩০ ফুট ফ্লাড ওয়াল বিধ্বস্ত হয় এর ফলে পাথারকান্দি এলাকায় প্রায় ১৫টি গ্রামের অধিবাসী জলবন্দী হয়ে পড়ে এবং গ্রামবাসীরা চরম দুর্গতির সম্মুখীন হন। পাথারকান্দি মটরস্টেন্ড, থানা, ডাকবাংলো, ফরেস্ট অফিস, তহশীল অফিস, বিদ্যালয় সর্ব্বত্রই প্রচুর বন্যার জল প্রবেশ করে। করিমগঞ্জ মহকুমায় প্রায় ৬০ হাজার লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন।

বন্যার ফলে আসাম আগরতলা রোডে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়েছে। বন্যা কবলিত জনতাকে বিপন্মুক্ত স্থানে স্থাপিত ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিকে বন্যা ত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারকে তৈরী থাকতে বলা হয়েছে। হাইলাকান্দি মহকুমার রাজেশ্বরপুর এলাকার বাসিন্দারা সর্ব্বাধিক বিপন্ন হয়েছেন। সেখানে ৪৫ হাজার লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। বন্যা নিয়ন্ত্রন বিভাগের সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, এডিশনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ারের মত দায়িত্বশীল অফিসাররা এখন কাছাড় জেলায় নেই। করিমগঞ্জ মহকুমা শাসক ফ্লাড কনট্রোল রুম খুলেছেন। কাছাড় জিলার নানাস্থানে আউশ ধান্য ও শালি ধান্যের চারা নষ্ট হয়েছে।

লংগাই ও সিংলার বন্যায় চান্দখিরা, পাথারকান্দি, বারৈগ্রাম, আছিমগঞ্জ, নীলামবাজার প্রভৃতি স্থানের আউশ ধান্য ও শালি ধান্যের প্রচুর ক্ষতি করেছে।

বন্যার সময় কাছাড় জেলার খাদ্য পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। মরসুমের প্রথম বন্যা আসামের তিনটি জেলাকে প্লাবিত করেছে। প্রকৃতির এই রুদ্ররোষ বিস্তীর্ণ জনবসতি ভেঙে যাওয়ায় হাজার হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্থ, গৃহহীন হয়েছেন। বন্যার জল রেল লাইন, পুল সহ পথ ঘাটের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করায় বহু এলাকা যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শস্যক্ষেত্র প্লাবিত হওয়ায় ফসল হানি ঘটেছে। অবস্থা মোকাবিলায় সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ উদালগুড়ি। চারি দুয়ার এবং দরং জেলার কর্বলপাড়া অঞ্চলে ইতিমধ্যেই সামরিক বাহিনীকে জলবন্দী মানুষকে উদ্ধারের কাজে লাগানো হয়েছে সরকারী সূত্রে জানানো হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের উত্তাল তরঙ্গে তেজপুর শহরের পার্শ্ববর্তী ধাপার বাটিয়া এলাকায় জনৈক কুড়ি বছরের যুবক ভেসে গেছে বলে জানা গেছে। এই মৃত্যুকে এবারে বন্যায় প্রথম মৃত্যু বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্রহ্মপুত্র, ধানসিড়ি, দৈপম, জিয়াভরালী, সুবনসিড়ি সহ রাজ্যের বুক চিরে প্রবহমান সমস্ত নদীর,জলস্ফীতি অব্যাহত রয়েছে। ডিব্রুগড়, নিমাতিঘাট, তেজপুর এবং শীলঘাট সহ সদিয়া থেকে ধুবড়ী পর্য্যন্ত সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবহমান শাখানদীগুলি বিপদ সীমার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। মঙ্গলদৈ মহকুমায় ধানসিড়ি নদী গতিপথ পরিবর্ত্তন করায় আটটি গ্রাম সম্পূর্ণ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। অজিত নদীর জল রৌহিয়া এবং উদালগুড়ির মধ্যে দীর্ঘ পূর্ত্ত দপ্তরের রাস্তা প্লাবিত করেছে। দৈপম নদীর উপরের পুল ভেঙ্গে গেছে। নানাই নদীর বাঁধ ভেঙ্গে বহু গ্রাম প্লাবিত হওয়ায় আইকাইয়া সহ অন্যান্য গ্রাম থেকে বহু মানুষকে বিপন্মুক্ত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রীগোলাম ওসমানী হাজার হাজার বন্যা

কবলিত মানুষের পাশে গিয়ে ছিন্নমূল জনগণ ও প্রশাসনকে কাজে সাহায্য করেছেন।

এ পর্যন্ত বন্যায় সরকারী মতে ৫ জন ও বেসরকারী মতে ২৬ জনের প্রাণহানী ঘটেছে। দরং জেলায় নয়জন এবং কামরূপ জেলার নলবাড়ী মহকুমায় একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ। বন্যা কবলিত অঞ্চল পরিদর্শন করে এসে রাজস্বমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। ধানসিড়ি গতিপথ পরিবর্ত্তনের পর আরও নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত করেছে। বহু সড়ক, সেতু এবং রেলপথ জলস্রোতে ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় দরং জেলার বহু অঞ্চল চারদিন ধরে যোগাযোগ বিছিন্ন হয়েছে। উদালগুড়ি থেকে রাওতা বাগান পর্যন্ত বদীর্ঘ রেলপথ ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে আছে। বন্যার জলস্রোতে লাইনের পিলারগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

শেষ খবরে প্রকাশ আসামের সর্ব্বত্র নদীগুলির জলস্ফীতি হ্রাস পেলেও সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। সুবনসিড়ি নতুন গতিপথের সামনে যা পাচ্ছে তা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। করচরঘাটের ফ্লাড ওয়াল বিধ্বস্থ হওয়ায় পাথারকান্দি অঞ্চলবাসী বিস্ময় প্রকাশ করেন। অঞ্চলবাসীর ধারণা বাঁধ নির্মাণে কারচুপি হয়েছে। সেজন্য একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি মহকুমার সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করার জন্য সত্তর হাজার টাকা মঞ্জুর করেছেন আসাম সরকার।

—"যুগশক্তি"

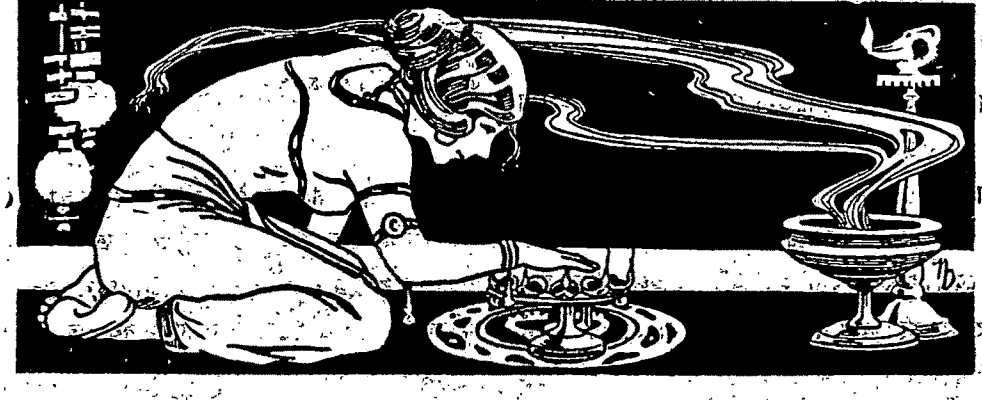

শঙ্খধ্বনি

ধর্মই প্রেম, ঐক্যই শক্তি

দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার কারণ আবার দারিদ্র্যই তার পরিণাম। ভারতবাসীর সামনে এইটিই আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা। এর বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকার সম্ভাবনা নেই।

সমগ্র পৃথিবীতে, ভারত জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় আর আয়তনে সপ্তম। এই বিশাল দেশ বহু জাতির সমষ্টি এ উপলব্ধি গৌরবের। বস্তুতঃ পক্ষে এ দেশে মূল জাতির প্রায় প্রত্যেকটি এবং প্রায় সব ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে।

এই পরম সত্যটিকে আমরা শক্তির উৎস রূপে গ্রহণ করব না আমাদের দুর্বলতার উপলক্ষ্য হতে দেব, এই কথাটি গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার।

সাংবিধানিক রক্ষাকবচ

সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে প্রায় প্রতি মহাদেশেই সংখ্যালঘিষ্ঠ সংক্রান্ত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রতি রাষ্ট্রকেই এই সমস্যার সমাধানকল্পে সংযুক্ত ধরনের সংবিধান গ্রহণ করতে হয়েছে। ভারতের প্রজাতন্ত্রী সংবিধানে স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শগুলি এবং বহু দেশের বহুদিনের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত। ধর্মীয়, ভাষাগত, সাংস্কৃতিক আদি সব ধরনের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক রক্ষাকবচের সংস্থান রয়েছে। রাষ্ট্রনীতির নির্দেশক নিয়মাবলী ছাড়াও, সংবিধানে, ধর্ম পালনের এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার সুরক্ষিত রাখার সুস্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

'ধর্ম পালনের অধিকার' প্রসঙ্গে কয়েকটি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা এখানে প্রয়োজন, যথা, ২৫শং অনুচ্ছেদে আপন বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী ধর্ম পালন, আচরণ ও প্রচারের স্বাধীনতা; ২৬শং অনুচ্ছেদে ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনার স্বাধীনতা, ২৭শং অনুচ্ছেদে যে কোনও বিশেষ ধর্মের বিকাশের জন্য কর প্রদানের স্বাধীনতা এবং ২৮শং অনুচ্ছেদে বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মাচরণ বা ধর্ম উপাসনার বিষয়ে স্বাধীনতা।

'সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার' প্রসঙ্গে উল্লেখ্য হল, ২৯শং অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ রক্ষার এবং ৩০শং অনুচ্ছেদে সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বধর্মাশ্রয়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার স্বাধীনতা প্রতিশ্রুত। সংবিধানে বিবৃত সংস্থানগুলির মূল পাঠের বক্তব্য এই ভাবে উল্লিখিত হয়েছে, যথা :—

বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী ধর্ম পালন, আচরণ ও প্রচারের স্বাধীনতা

২৫। (১) সার্বজনিক ব্যবস্থা, সদাচার ও স্বাস্থ্য এবং এই অংশের অন্যান্য সংস্থান সাপেক্ষে, সকল ব্যক্তির, বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী ধর্ম গ্রহণ, আচরণ ও প্রচারের সমান অধিকার থাকবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত কিছুই বর্তমান বিধি বা আইন প্রবর্তন প্রভাবা স্থগিত করবে

না অথবা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন কোনও বিধি প্রণয়নে প্রতিবন্ধক ঘটাবে না, যার উদ্দেশ্য

(ক) ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কে অর্থনৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক অথবা অন্যান্য সর্বজনীন কার্যকলাপ নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত করা ;

(খ) সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কার সাধনের সংস্থান করা অথবা সর্বজনীন চরিত্রের হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দুদের সব বর্গ ও অংশের জন্য উন্মুক্ত করা।

১ নং ব্যাখ্যা—কৃপণ ধারণ ও বহন শিখ ধর্ম পালনের অঙ্গ বলে গণ্য করতে হবে।

২ নং ব্যাখ্যা—(উক্তি) দ্বিতীয় প্রকরণের 'খ' উপপ্রকরণে হিন্দুদের সম্বন্ধে উল্লেখ শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম অনুসরণকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং হিন্দু ধর্ম সংস্থার উল্লেখও তদনুরূপ গ্রহণ করতে হবে।

ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনার স্বাধীনতা

২৬। সার্বজনিক ব্যবস্থা, সদাচার ও স্বাস্থ্য সাপেক্ষে প্রত্যেক ধার্মিক সম্প্রদায় অথবা তার কোনও শাখার অধিকার থাকবে—

(ক) ধর্মীয় ও দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পোষণ ;

(খ) নিজ ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(গ) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ও তার স্বত্ব অর্জন ; এবং

(ঘ) বিধিমতো এই ধরনের সম্পত্তি প্রশাসন।

কোনও বিশেষ ধর্মের বিকাশের জন্য কর প্রদানের স্বাধীনতা

২৭। কোনও ব্যক্তিকে এমন কোনও কর (অর্থ) দেওয়ার জন্য বাধ্য করা চলবে না যার (করের) আয় বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিকাশ ও পোষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য বিশেষ ভাবে বিনিয়োজিত হবে।

বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মাচরণ ও ধর্ম উপাসনার স্বাধীনতা

২৮। (১) রাজ্যের কোষ দ্বারা পুষ্ট কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনও প্রকার ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে না।

(২) যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজ্য দ্বারা প্রশাসিত কিন্তু এমন কোনও ধর্মস্ব বা অছি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যাঁদের মতে ঐ প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, সেসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উক্ত প্রকরণ (১) প্রযোজ্য নয়।

(৩) রাজ্য কর্তৃক অনুমোদিত ও রাজ্যের অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি ধর্ম শিক্ষা ও উপাসনার ব্যবস্থা থাকেও তথাপি সেই প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনও ব্যক্তিকে সেই প্রতিষ্ঠানে বা তার সংলগ্ন কোনও স্থানে, ঐ ধরনের সমাবেশে যোগ দেবার জন্য বাধ্য করা চলবে না, যদি না, সেই ব্যক্তি নিজে বা সে অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে তার অভিভাবক সে ব্যাপারে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষা সম্মতি দিয়ে থাকেন।

২৯। (১) ভারতের রাজ্য ক্ষেত্রে বা অন্য কোনও অংশে নিবাসী নাগরিকদের, কোনও বর্গের, (যাঁদের) নিজস্ব ভাষা, লিপি ও সংস্কৃতি আছে, (তাঁদের) ঐগুলি বজায় রাখার অধিকার থাকবে।

(২) রাজ্য-কোষ দ্বারা পুষ্ট বা সরকারী সাহায্য

প্রাপ্ত কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা থেকে কোনও ব্যক্তিকে কেবল ধর্ম, মূলবংশ বা জাতি কুল ও ভাষার সব কটির বা যে কোনওটির ভিত্তিতে রক্ষিত করা চলবে না।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা ও প্রশাসনের অধিকার

৩০। (১) ধর্ম বা ভাষাগতভাবে যে কোনও সংখ্যালঘিষ্ঠ বর্গের নিজ পছন্দ মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও প্রশাসনের অধিকার থাকবে।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য দেবার ব্যাপারে, সরকার কোনও প্রতিষ্ঠান, ধর্ম বা ভাষাগত দিক থেকে কোনও সংখ্যালঘিষ্ঠ বর্গের দ্বারা পরিচালিত এই যুক্তির আধারে, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না।

প্রশাসনিক রক্ষাকবচ

সরকার সংখ্যালঘিষ্ঠদের, তা সে ধর্মগত হোক বা সংস্কৃতি বা ভাষাগত, প্রতি যে কোনও প্রকার, বৈষম্য প্রদর্শন প্রতিরোধ করতে প্রতিশ্রুত।

সংবিধানে প্রদত্ত রক্ষাকবচগুলি যথার্থভাবে কার্যকর করতে এবং সরকারী নীতিগুলি ও সংখ্যালঘিষ্ঠদের কল্যাণের জন্য প্রশাসনী প্রকল্পগুলি রূপায়িত করতে সরকার কৃতসংকল্প।

এই সংকল্প বাস্তবায়িত করতে এবং অতীতের ভুল ত্রুটি এড়াতে, সরকার এই উদ্দেশ্যে একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ কমিশন গঠন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সম্প্রতি উল্লেখ করেন যে এই রকম একটা পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রস্তাব বহুকাল থেকেই ছিল কিন্তু ত্রিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম সেটিকে কার্যকর করা হল। কমিশনের অধ্যক্ষ হলেন একজন বিশিষ্ট আইনবেত্তা অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীজাস্টিস মোহাম্মদ রফীউদ্দীন আহ্‌মেদ আনসারী যিনি সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী সব কটি রাজ্যের সরকারকে, কমিশনের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেউ কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বা কমিশনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে

এই প্রসঙ্গে এ কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, যে এ ব্যাপারে ক্বচিত কখনও অভিযোগ উঠলেও, এবং তার কিছু স্বরূপের পর্যায়ের হলেও সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শনের বিষয়টি সমগ্র জাতীয় জীবনের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

ভারত সব-ধর্ম-সহনশীল এক প্রজাতন্ত্র এবং এখানে সব ধর্ম, সব সংস্কৃতির মানুষ মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করছেন এ কথা স্বীকৃত। তাঁদের অধিকার ও স্বার্থ সম্বন্ধে আইন শুধু সমদর্শীই নয়, প্রকৃতপক্ষে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাঁরা (সংখ্যালঘিষ্ঠগণ) সক্রিয় ও লক্ষ্যণীয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও রফি আহমেদ কিদোয়াই যেমন অবিস্মরণীয় তেমনি ভারতীয় সংবিধানের মূল প্রণেতাদের অন্যতম ডঃ বি. আর. আম্বেদকরও স্মরণীয়। ঠিক এই ভাবে শিখ, খৃষ্টান ও বৌদ্ধরাও বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছেন।

দুজন মুসলীম ডঃ জাকির হুসেন ও শ্রী ফকরুদ্দীন আলী আহমেদ দেশের সর্বোচ্চ সম্মানের আসন অলঙ্কৃত করেছেন। আমাদের এই প্রজাতন্ত্রের ২৯ বছরের জীবনে ৬ জন রাষ্ট্রপতির মধ্যে ঐ দুজনের নামও উল্লেখ্য। তাছাড়া মুসলীম, শিখ ও খৃষ্টানরাও রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী এবং বহু রাজ্যে সরকারী প্রশাসনের সর্বোচ্চ আসনে বৃত হয়েছেন।

যে কোনও জাতির জীবনে প্রতিরক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং ভারতের সামরিক বাহিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই উপলব্ধি করা যাবে যে সংখ্যালঘুদের সর্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ এস. এইচ. এফ জে. মানেক্‌শ', আমাদের একমেবাদ্বিতীয়ম ফীল্ড মার্শাল হচ্ছেন পারসী; এয়ার চীফ মার্শাল ইদ্রিস হাসান লাতীফ হলেন মুসলীম এবং তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে এয়ার মার্শাল এ এম এঞ্জিনীয়ার (পারসী) ও এয়ার চীফ মার্শাল অর্জুন সিং-এর (শিখ) নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন অ্যাডমিরাল জাল কার্সেতজী যিনি হলেন একজন পারসী। এখন সেই পদে আছেন অ্যাডমিরাল আর এল পেরেইরা, একজন খৃষ্টান। শুধু এই কেন? সামরিক বাহিনীতে বীরত্ব ও সাহসিকতার পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে অন্যান্যের সঙ্গে বহু মুসলীম, শিখ ও খৃষ্টানের নামও অন্তর্ভুক্ত।

প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি বলেছিলেন যে উদারতা ও সহনশীলতার জন্য ভারতের খ্যাতি ঈর্ষনীয় বলে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। সম্ভবতঃ উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে, বৃটিশ তাদের ভেদাভেদ নীতির আধারে শাসন প্রবর্তনের ফলস্বরূপ বোধহয় প্রথম এদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটে। যদি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের ভাবগত ও বৈষয়িক সম্পদ সুসংহত করতে পারেন তাহলে প্রত্যেকে আন্তরিকতার সঙ্গে একটু পরিশ্রম করার ফলে শিশু নারী পুরুষ, প্রত্যেকে, সেই পরিশ্রমের সুফল সমানভাবে ভোগ করতে পারেন। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা থাকলে, তার জন্য আমাদের দেশের মান, ব্যক্তির মর্যাদা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে ঐশী স্ফুলিঙ্গ আছে তার সম্মান অক্ষুন্ন থাকবে। এ ছাড়াও স্বার্থের খাতিরে অন্ততঃ আমাদের বিশৃংখলা ও অসম্প্রীতির যে কোনও প্ররোচনা ব্যর্থ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে কারণ তা না হলে দৈনন্দিন জীবনের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ ক্ষুন্ন হবে ও সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রগতির পথে নানা প্রকার বিঘ্ন আসবে।

পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রয়োজন তর্কাতীত

সব দেশেই কিছু মনে, সঙ্কীর্ণতা বাসা বাঁধে। এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা অন্য ব্যক্তি, অন্য শ্রেণী, অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে স্বার্থসিদ্ধি করতে তৎপর। তারা ভুলে যায় সুলভে কেনা তিলমাত্র লাভ একদিন মুষল হয়ে তাদেরই আঘাত করবে।

কোনও মানুষ যদি ভাবে, সমাজে থেকেও বিযুক্ত হয়ে নিজেকে সে বাঁচাতে পারবে তো সে বাতুল মাত্র। মহামারী এলে ধনবান বা দরিদ্র কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে না। কোনও গোষ্ঠী, কোনও সম্প্রদায় আপন গণ্ডীতে বদ্ধ থেকে উন্নতি করতে পারে না। সম্পদ ও দারিদ্র্য অনির্দিষ্ট কাল স্থায়ী হতে পারে না। এই বৈষম্যই আজ সামাজিক অসহনীয়তার সর্বপ্রধান কারণ।

একদিন ছিল, যখন আমরা আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল অভিন্নতা বিস্মৃত হয়ে ধর্ম বা অঞ্চলের নামে বিভক্ত হয়ে গেছি। এই বিভেদই আমাদের বিদেশীদের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। আজ যখন আমরা মুক্তি পেয়েছি, স্বাধীন হয়েছি তখন অতীতের সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

ধর্ম হল পবিত্র : কেউ এর সুযোগ নিতে না পারে

মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর একটা সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল এই উপলব্ধি, যে, মহত্ব ও মনুষ্যত্ব কোনও একটিমাত্র ধর্মের একচেটিয়া নয়।

ব্যক্তির বিবেকবুদ্ধি ও অন্য সব মানুষের প্রতি তার মনোভাবকে কেন্দ্র করে ধর্মের অস্তিত্ব। এ হল মানুষের অন্তরের এমন এক ভাব যা অন্যের প্রতি আচরণে পরিস্ফুট হতে পারে। যে, প্রেম মমতা কামনা করবে তা অন্যকে দেওয়াই হল ধর্ম। ধর্ম কারও ব্যক্তিগত নয় যে তার মাধ্যমে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধ করা চলবে।

প্রত্যেক ধর্মের প্রবক্তা এই প্রেম ও মমতার মূর্ত প্রতীক। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন উদারতা ও মমতার অসংখ্য ঘটনায় সমৃদ্ধ এবং তাঁরা তাঁদের অনুগামীদের অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রাখারই শিক্ষা দিয়েছেন।

ঐসব মহান ব্যক্তির স্মৃতি কলুষিত করে নিরপরাধ শিশু নারী পুরুষকে আঘাত করতে যে আজও হাত তোলা হয় এর চেয়ে বেদনার বিষয় আর কী হতে পারে। খুন-খম, ধর্ষণ, লুটতরাজ, আগুন লাগানো কোন ধর্মে স্থান পেয়েছে?

কোনও সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের ধর্মে এই ধরনের গর্হিত আচরণের সমর্থন খুঁজবে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। অতএব, স্পষ্টতঃই এর পেছনে কোনও বিপথগামী মন কাজ করে আর নয় তো কোনও বিভ্রান্ত চিন্তার পরিণামে এ ধরনের ঘটনা ঘটে।

সাম্প্রদায়িক হিংসার কণ্ঠরোধ

সমাজে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদের চিহ্নিত করা দরকার। মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী তাঁদের মধ্যে থেকে তাঁদের স্বার্থের প্রচণ্ড ক্ষতি করছে, এ কথা সজ্জন নাগরিক-দের উপলব্ধি করা দরকার।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পাণ্ডাদের অগণিত ভদ্র ও সজ্জন নাগরিকরা বহুদিন বরদাস্ত করেছেন। আইন শৃংখলা ভাঙার প্রত্যেকটি ঘটনার মূল্য তাঁদেরই দিতে হয়েছে। দিনমজুর থেকে ব্যবসায়ী পর্যন্ত প্রত্যেকের জীবিকা বিপর্যস্ত হয়েছে, শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে ও অগণিত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাপন দুর্বহ হয়ে উঠেছে। আমাদের সকলের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে সাধারণের সম্পত্তি নষ্টভ্রষ্ট করা হয়েছে। এতে লাভ কার?

প্রতি ঘরে স্ত্রী-মা-ও কন্যা আছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় তাঁদের কোনও লাভ হয়েছে? না, সবচেয়ে বেশি যন্ত্রনা পেয়েছেন তাঁরাই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা কি ছাত্রছাত্রী, কিশোরকিশোরী বা শিশুদের উপকারে এসেছে? না। তাদের লেখাপড়া, খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ, এমন কি মুখের গ্রাসটুকুও বিপর্যস্ত হয়েছে। যখন আইন শৃংখলা-বিপন্ন হয়, যখনই এই ধরনের অপ-কর্মের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড লণ্ডভণ্ড হয় তখন তার প্রথম আঘাত পড়ে শ্রমজীবী, কারবারী ও ব্যবসায়ীদের ওপর।

হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান, শিখ বা যে কোনও ধর্মই হোক না কেন, যখন পথভ্রষ্ট সমাজবিরোধীরা প্রকাশ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে তখন ঐ ধরনের অপরাধের পরিণামে কি সেই ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, না তার অনুগামীদের সংখ্যা বাড়ে?

যে দোষী সে শাস্তি ভোগ করুক। আপনি কেন?

লুঠতরাজ যাদের উদ্দেশ্য সেই সব দুষ্কৃতকারীরা ধর্মের প্রবক্তা হতে পারে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশে-চ্ছুক ব্যক্তিদের ধর্মের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করার এ ধরনের আচরণে লিপ্ত হতে দেওয়া উচিত নয়। আমরা যদি শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে চাই তাহলে তার ওপর হামলাকারী সমাজ বিরোধী ব্যক্তি-দের রুখতে হবে।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ শান্তি রক্ষার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই নির্দেশ দিয়েছেন যে পুলিশ বাহিনীতে সব বর্গ ও সম্প্রদায়ের লোক থাকা চাই কারণ প্রাক্তন প্রশাসক বর্গের অদূরদর্শী নিয়োগনীতির ফলে ঐ বাহিনীর ক্ষতি হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা নিশ্চিহ্ন করার পন্থাপদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ঐক্যে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী সব সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয়দের এবং রাজ্যগুলির প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কথা বলতে গেলে, পৌনঃপুনিক সাম্প্র-দায়িক সংঘাতের আশঙ্কা রোধ করার জন্য কোনও উপায় খুঁজে বার করতেই হবে কারণ ঐ সংঘাতের ফলে দেশে প্রগতি ব্যহত হচ্ছে এবং জনজীবন বিষময় হয়ে উঠছে। বিষয়টি নিয়ে আমাদের সকলকে ঠাণ্ডা মাথায় এবং কোনও উত্তেজনার বশবর্তী না হয়ে চিন্তা করে দেখতে হবে এবং

এমন একটা অভিন্ন আচরণ বিধি উদ্ভাবন করতে হবে যা প্রত্যেকে মেনে চলবেন। জাতীয় জীবনে, দুষ্টক্ষত স্বরূপ, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা নির্মূল করতেই হবে।

(ভারত সরকার দ্বারা প্রচারিত)

অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৯শে বৈশাখ, ১৩৮৬ ইংরেজী ১৩ই মে ১৯৭৯ তারিখে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম বছরের (১৯০১-২) বারোজন ছাত্রের মধ্যে অন্যতম অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাতুলচরণের ৩নং আলিপুর অ্যাভিনিউ-এর বাসায় দেহ রেখেছেন। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাশি বছর, কিন্তু বয়সের ভারে দীর্ঘদেহের মেরুদণ্ড এতটুকু বাঁকেনি, নানা মর্মঘাতি শোকে তাপে সদাপ্রসন্ন মুখের হাসি এতটুকু ম্লান হয় নি। মৃত্যুর কুড়িদিন আগে স্নানের ঘরে প'ড়ে গিয়ে আহত হন, তারপর শেষ ক'দিন নার্সিংহোমে ও বাড়িতে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক আশ্রমের আর কোনো ছাত্র জীবিত আছেন ব'লে আমাদের জানা নেই।

মহর্ষিদেবের পরিবারের সঙ্গে তাঁর প্রমাতামহ মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘকালের। শৈশবে ভূদেববাবুর চুঁচড়োর বাগানে অবনীমোহনের মা সরূপা, মাসিমা অনুরূপা এবং দিনেন্দ্রনাথ একসঙ্গে খেলা করেছেন। পরে রক্ষণশীল পরিবারের বালিকাবধূ অপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনাম ছেড়ে স্বর্ণকুমারী দেবীর পরামর্শেই নিজের রাশিনাম 'ইন্দিরা' ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন সাহিত্যক্ষেত্রে। অবনীমোহনের বাবা ললিতমোহন ছিলেন হুগলীর সরকারি উকিল। দানবীর শশিভূষণের বড়ো ছেলে, পরে অ্যাণ্ড্রুইউল কোম্পানীর প্রধান হিসাব-পরিক্ষক হয়েছিলেন। তিনি গুরুদেবকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর অনুরোধে তাঁর নবস্থাপিত আশ্রমে তাঁর আদর্শানুযায়ী মানুষ হবে ব'লে তিনি নিজের বড়ো ছেলে আট বছরের বালক অবনীমোহন, সেজ ভাই দশ বছরের শৈলেন্দ্রমোহন এবং ভাগিনেয় এগারো বছরের বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় (ইনি পরে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন) দিয়ে যান। সে যুগের আশ্রমজীবনের একটি সুন্দর অবনীমোহন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যায় 'পুরোনো কথা' নামক প্রবন্ধে রেখে গেছেন। স্বয়ং গুরুদেবের অন্তরঙ্গ সাহচর্য ব্রহ্মবান্ধব, রেবাচাঁদ প্রভৃতি আদর্শবাদী অধ্যাপকদের শিক্ষায় মানসিক বিকাশ যথেষ্ট হ'লেও ধনীগৃহের আরাম লালিত বালকদের শরীরে আশ্রমজীবনের কঠোরতা সহ্য হ'ল না, সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া ধরল। আশ্রম ত্যাগের পর অবনীমোহনের বাবাকে তিন বছর তাঁর চিকিৎসার জন্য সপরিবারে ক'লকাতায় বাসা ভাড়া ক'রে থাকতে হয়, তাঁর বাড়ির অন্য ছেলে দু'টি অল্পদিনেই রোগমুক্ত হন। আচার্য ব্রহ্মবান্ধব শান্তিনিকেতন ছাড়বার পর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে একটি স্কুল খুলেছিলেন, অবনীমোহন সেখানে কিছুদিন পড়েছিলেন। তারপর হিন্দু স্কুলে, সেণ্ট জেভিয়ার্স, বঙ্গবাসী কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ওকালতি পাস করেন। বক্তৃতা করতে পারতেন না, আইনের কূট তর্কে আনন্দ পেতেন না, মিথ্যা কথা বলতে পারতেন না; তাই পসার হ'ল না, কয়েক বছর পরে আদালতে যাওয়া ছেড়ে দেন। ব্যবসাবুদ্ধি ছিল না, ব্যবসা করতে গিয়ে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন। ঘরের পরের রোগের সেবা, আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের বিপদে পাশে দাঁড়ানো এবং বুক দিয়ে পড়া, বাড়ির এবং বাইরের স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের (বিনা বেতনে) পড়ানো, শিশুদের আনন্দ দেওয়া এবং সর্বোপরি নীরবে ব্যাগার খাটাই ছিল তাঁর কাজ। মা তাঁর ছোটো ভাই প্রভাতমোহনকে বলেছিলেন, "শুনেছি মায়েরা তাদের ছোটো ছেলেদের বেশি ভালোবাসে, আমি কিন্তু আমার বড়ো ছেলেকে সবচেয়ে ভালোবাসি"। সেই মা গেলেন অবনীমোহনের ত্রিশ বছর বয়সে, বাবা গেলেন তার চার বছর পর, লক্ষ্মীপ্রতিমা পত্নী গেলেন তার এক বছর পরে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বাদুড়বাগান পাড়া বাঁচিয়ে সাংঘাতিকভাবে আহত হন ভগ্নীপতি একবছর শয্যাশায়ী থেকে মারা গেলেন, সেই এক বছর অবনীমোহন অপুত্রক ভগ্নীপতির সেবা করেছেন দিবা

মাসিমা অনুরূপাদেবী ভূমিকম্পে আহত হন, ভাই প্রভাতমোহনের সঙ্গে অবনীমোহন প্রায় মাসাল মজঃফরপুরে তাঁর সেবা করেছেন। প্রভাতমোহন গ্রহে যোগ দিয়ে বারবার জেলে যান। অবনীমোহন দিনে তাঁকে মোটর বাইকে করে মহিষবাতানে পৌঁছে আসেন, তার পর পিটুনি পুলিশের অত্যাচারের এবং রপাকড়ের মধ্যে বারবার তাঁকে দেখতে গেছেন সত্যাগ্রহ শিবিরে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আচার্য নন্দলাল এবং বনোদ মুখোপাধ্যায়, ইন্দুসুধা ঘোষ প্রভৃতি তাঁর ভ্রাতৃবন্ধুর জেলের মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে এনেছেন। প্রভাতের ক্ষপুর গ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ে তিনি যখন টাইফয়েডে য্যাগত হ'ন, তখন তাঁকে গোরুর গাড়িতে করে তুলে এনে লকাতায় ছোটো মাসিমা ইন্দুবালা দেবীর বাড়িতে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। শ্রীনিকেতনে তিনি হাঁপানিত শয্যাগত হ'লে তিন মাস এসে সেবা করেন। নিজে শর্ষদিকে কলকাতার হ্যারিসন রোডের বাড়ি ভাড়া দিয়ে সজ ভাই সুধাংশুমোহনের (মাইনিং এঞ্জিনীয়ার) কাছে পরিবারে পাটনায় গিয়ে থাকেন, তাঁর 'আশা স্টোর' নামক দোকান দেখাশোনা করেন প্রায় বিশ বছর।

—'বিশ্বভারতী নিউজ'

কেদারনাথ কুলভী (বাঁকুড়া ১৮৪৮-১৯১২)

বঙ্গাব্দ ১২৫৫, ১৬ই শ্রাবণ, জয়নগর মজিলপুর রগণার (২৪ পরগণা জেলা) নিকটবর্তী বহড়ু গ্রামে কেদারনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, গৃহদেবতার পূজায় তাঁহার বাল্যাবধি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। শৈশব হইতেই পূজা-অর্চনা করিতেন। মাতার একটী কথায় তাঁহার মনে আলোড়ন উপস্থিত হয়। মাতা বলিয়াছিলেন "বাবা, ভক্তিভরে বলে ঠাকুর তোমার ডাকে নিশ্চয় সাড়া দেবেন।" হার আরাম আমোদ, আহ্লাদ, তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ ল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স্ পাশ করেন। সর্বদাই তিনি ভগবৎ চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। যৌবনে তিনি নিকটবর্তী গ্রামের সমবয়সী বন্ধু শিবনাথ ভট্টাচার্য (পরে শাস্ত্রী) এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ উমেশচন্দ্র দত্ত, কালীনাথ দত্ত প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। এবং পরে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং উপবীত ত্যাগ করেন। ধর্মসাধনায় বিঘ্ন হইবে মনে করিয়া তিনি প্রচুর বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করেন এবং সমুদয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দান করেন। তিনি সরকারী দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদ গ্রহন না করিয়া সামান্য শিক্ষকের পদে ব্রতী হন। প্রথমে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে এবং পরে বাঁকুড়া জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন।

বাঁকুড়াই ছিল তাঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র। বাঁকুড়ায় থাকাকালীন তিনি বাঁকুড়া ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন ও তৎসলগ্ন প্রচারক-নিবাস স্থাপন করেন। স্থানীয় হিন্দুদের সহযোগিতায় এই মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা ও কীর্তন হইত। শ্রীমহেশচন্দ্র আতথী পরে বহুদিন এই প্রচারক নিবাসে বাস করিয়া সমাজের কার্য পরিচালনা করেন। শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বাঁকুড়া জেলা স্কুলে কেদারনাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কেদারনাথ কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর বাঁকুড়ার নিজবাড়ী রামানন্দবাবুকে বিক্রয় করেন। বহুদিন পরে রাঁচীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু সভাপতি হইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে কেদারনাথের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন : "কুলভি মহাশয় আমার শুধু শিক্ষাগুরুই ছিলেন না, আমার দীক্ষাগুরুও ছিলেন। তাঁর জীবন দেখেই আমি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করি।" পরে কেদারনাথ ৫৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও সাধন-আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হন। গ্রহণ করেন প্রচারক ও আচার্যের পদ। বাঁকুড়ায় থাকিতে তাঁহার সহজ ও সরল জীবন যাত্রা, ধর্মপরায়ণতা ও সত্যবাদিতা বাঁকুড়া শহরের নৈতিক আবহাওয়া যথেষ্ট উন্নত করে। কলিকাতায় তিনি প্রত্যহ ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া সাধনাশ্রমে ব্রহ্মোপাসনায় উপস্থিত থাকিতেন। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় স্থাপনের পর তিনি সেই বিদ্যালয়েও শিক্ষকতা করেন। মাঘোৎসবের প্রস্তুতি হিসাবে পৌষ মাসের ঊষাকীর্তনে

তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং নিজেও কীর্তন রচনা করিতেন। 'ঐ যে বরষ পরে আসিছে ঘরে ঘরে' তাঁহার রচিত একটি সুন্দর ব্রহ্মসংগীত। কেদারনাথের মাণিকতলার গৃহে মাঘোৎসবের পূর্বে উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হইত। তাঁহার সকল কার্যেই তাঁহার সহধর্মিণী হেমাঙ্গিণী দেবী বিশেষ সহায়তা করিতেন। ৬৪ বৎসর বয়সে বঙ্গাব্দ ১৩১৯, ১২ শ্রাবণ (২৮শে জুলাই, ১৯১২) কলিকাতা নগরীতে নিজ বাসগৃহে কেদারনাথ কুলভী পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার দীর্ঘদিনের বন্ধু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপস্থিত ছিলেন এবং শাস্ত্রী মহাশয়ই তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধে আচার্যের কার্য করেন। কুলভী মহাশয় অতিশয় তেজস্বী, স্পষ্টবাদী অথচ বালকস্বভাব ছিলেন।

("তত্ত্বকৌমুদী" হইতে উদ্ধৃত)

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা—

সন্তোষ কুমার অধিকারী "আভা" পত্রিকায় লিখিয়াছেন:

আধুনিক কবিতার রুচি ও প্রকৃতি অনুসরণ করলে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে কবিরা প্রচলিত বিষয়, ধরণ ও আঙ্গিক পুরোপুরি বর্জন করে চলতে চান। কাব্যের ঋতুবদল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু সাম্প্রতিক কালের কবিদের হাতে এই পরিবর্তন যেভাবে দেখা দিল, তাতে মনে হ'ল, অতীতকে অস্বীকার করে চলাকেই তাঁরা আধুনিকতা বলে মনে করেছেন।

তার ফলে কাব্যের বিষয়বস্তুতে এল বাস্তব জীবনের রূঢ় ও নগ্ন অনুভবের প্রকাশ। ছন্দ ও মিল যেমন বাদ পড়ল, তেমনি বদলে গেল প্রচলিত উপমার প্রয়োগ। শব্দকে তীক্ষ্ণ ও ব্যাঞ্জনাময় করার চেষ্টা হ'লেও দুরূহ শব্দ ও অপ্রচলিত অর্থে তাকে ব্যবহার করার চেষ্টায় কাব্যের মধ্যে দুর্বোধ্যতা দেখা দিল।

আধুনিক কবিতা এর জন্য সাধারণ মানুষের কাছে দুরূহ হয়ে উঠল। জীবনের বিপর্যয়, হতাশা ও ক্লান্তি একদিকে যেমন কাব্যশরীরকে আচ্ছন্ন করল, কবির আনরোমান্টিক মনোভাব এবং আঙ্গিকের কলাকৌশল তেমনি তাকে সহবোধ্যতা থেকে দূরে সরিয়ে দিল।

অথচ এই পরিবেশের মধ্যেও সাম্প্রতিক কালে কিছু যে ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে, তাকে শুভ লক্ষণ বলেই সাধারণ মানুষ গ্রহণ করবে।

আধুনিক কবিতার একটি সংকলন হাতে এল বলেই একথা বলতে পারছি। "অন্য দিনের কবিতায়" যাঁদের কবিতা সংকলিত, তাঁদের মধ্যে অন্নদা শঙ্কর, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের কবি শঙ্খ ঘোষ ও শান্তনু দাস পর্যন্ত আছেন। সংকলনটিতে যে সব কবিতা স্থান পেয়েছে তার মধ্যে সেই দুরূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা, কিম্বা ছন্দ সুর ও রস বর্জিত শব্দ প্রয়োগের বাহুল্য নেই। বরং সেই অনুভব আছে যা উপলব্ধির গভীরতা থেকেই এসেছে। যেমন, উল্লেখ করতে পারি ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর "জন্মভূমির দিকে", সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের "যত দূরেই যাই" অথবা জগন্নাথ চক্রবর্তীর "আমাদের বাংলাদেশ"। ভূমিকাতে সম্পাদকের কৈফিয়তও উল্লেখযোগ্য।

"কাব্যের ব্যঞ্জনার জন্যেও দরকার অনেক উপচার, তার ধ্বনি তার রস, তার চিত্রকল্প" সংকলনটিকে আধুনিক কালের ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছি কেন, তার পরিচয়ও সম্পাদকের জবানবন্দীর মধ্যেই নিহিত আছে "কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দ অপরিহার্য।"

মনে পড়েছে কবিতার সেই ক্লাসিক সংজ্ঞা—Poetry in the concrete and artistic expression of the human mind in emotional rhythmic language."

সম্পাদককে তাঁর সৎসাহসের জন্যে সাধু বাদ জানাই।

—